মাদারেজুন নবুওয়াত

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে
দেহলভী (রহ:)



মাদারেজুন্ নবুওয়াত
তৃতীয় খণ্ড

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়ার
মিলাদুন্নবী স. হিজরী ১৪২০ উদযাপন
উপলক্ষে প্রকাশিত

মাদারেজুন্ নবুওয়াত
শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র.
অনুবাদঃ মাওলানা মুমিনুল হক

প্রকাশকঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

প্রথম প্রকাশঃ জুন ১৯৯৯ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং

প্রচ্ছদঃ
আব্দুর রোউফ সরকার

মুদ্রকঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,
ঢাকা–১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময়ঃ দুইশত বিশ টাকা মাত্র।

MADAREZUN NABUWAT (Volume 3) : By Shaekh Abdul Haque Muhaddese Dehlabhi R. translated by Maolana Mominul Haque and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigar, Narayangonj, Bangladesh.

Exchange Taka 220/- US $ 15.00

ISBN 984-70240-0015-6

نَحمَد ہ ونَصّلّی علٰی رَسُولِہِ الکریمٌ

প্রতীক্ষার গবাক্ষে এবার তৃতীয় সূর্যসম্পাত – প্রকাশিত হলো মাদারেজুন্ নবুওয়াত তৃতীয় খণ্ড। রসুল প্রেমিকগণের বিরহতাপিত হৃদয় নিশ্চয় উৎফুল্ল হবে। প্রিয়তমজনের স্মৃতিচারণ ব্যতিরেকে কার অন্তর কখন প্রশান্ত হয়েছে? আমাদের আর কী আছে – প্রতীক্ষা ও পিপাসা ছাড়া। আজন্ম এতিম আমরা। জন্ম থেকেই শুনে আসছি আমাদের প্রিয়তম রসুল পৃথিবীর জীবনের পরিসমাপ্তি এঁকে দিয়েছেন বহু পূর্বে – প্রায় চৌদ্দশ' বছর আগে। এখন আমরা কী করি, কোথায় যাই। তাঁর চরিতামৃত চর্চাই যে এখন আমাদের প্রধান অবলম্বন। প্রথমে তো জানবো তিনি কে ছিলেন, কী ছিলেন, কেমন ছিলেন – তারপরেই তো ওঠে তাঁর অনুসরণের প্রশ্ন– যে অনুসরণ ব্যতিরেকে কিছুতেই লাভ হতে পারে না সত্য ও সফলতা। পৃথিবীর ও পরবর্তী পৃথিবীর। আল্লাহতায়ালা তাই এরশাদ করেছেন– 'হে রসুল আপনি সকলকে জানিয়ে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো।' অতএব আল্লাহতায়ালার প্রিয়ভাজন হতে গেলে রসুল পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ অত্যাবশ্যক। আর প্রকৃত প্রেম ছাড়া যথাযথ অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই রসুল প্রেমও অপরিহার্য। একথাই বিবৃত হয়েছে এক কবির ভাষায় এভাবে–

যে জন যাহার প্রেমে নিমজ্জিত হয়
সে জন তাহার বাধ্য হবে নিশ্চয়।

রসুল স. এর অনন্য জীবনালেখ্য রচিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। সাহিত্যে। এখনো হয়ে চলেছে। আরো হবে। কিন্তু মাদারেজুন্ নবুওয়াত ওই সকল গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক মহাজাগতিক দ্যোতনায় চিরভাস্বর। কারণ এর সম্মানার্হ রচয়িতা ছিলেন দীদারে রসুলের নেয়ামতে আসক্ত নিমজ্জিত। ছিলেন প্রথিতযশা আলেম। প্রেমিকশ্রেষ্ঠদের দলভুক্ত আল্লাহর পরিচয়ধন্য কামেল আধ্যাত্মিক পুরুষ। তাই তাঁর রচনায় সতত পরিদৃশ্যমান হয় প্রজ্ঞা ও প্রেমের নিরন্তর উর্মিমুখরতা। বিস্ময়কর ও চিত্তহারক এই কালোত্তর গ্রন্থটির জন্য তাই আমাদের প্রতীক্ষা ও পিপাসা স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও শোভন।

বেলা বয়ে যাচ্ছে। সংসারের সকল সড়কে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে স্বজনবিচ্ছেদের শোকগাঁথা। দিনান্তের দিকে ধাবমান মানবতা তবু কেমন উদাসীন। আমাদের জীবনে ও ধর্মাচরণে তবু কেনো স্থবিরতা, উদাসীনতা, ক্ষতাক্ত পার্থিবতা? যেতে যখন হবেই তখন কেনো আমরা প্রশ্রয় দেই দোদুল্যমানতাকে, সময়ক্ষেপণকে। সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তনের সময় কী এখনো হয়নি? ওইতো সম্মুখে রয়েছে জ্যোতির্ময় তওবার তোরণ। প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণে তবে আর বিলম্ব করি কেনো? কেনো এই ক্ষণে খুঁজে নিই না পরিত্রাণের পথ – রসুলপ্রেমের প্রদীপালোকে?

তৃতীয় খণ্ডটিও অনুবাদ করেছেন এই নগণ্য ফকিররের প্রিয় রূহানী ফরজন্দ মাওলানা মুমিনুল হক। এর সঙ্গে অন্যান্য ফকির দরবেশগণের সযত্ন ও সতর্ক তত্ত্বাবধান তো রয়েছেই। দোয়া করি অনুবাদক, প্রকাশক, সহযোগী, সমর্থক, পাঠক-পাঠিকা সবাইকে আল্লাহতায়ালা দান করুন পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। বিশুদ্ধ ধর্মপ্রচারের অনুষঙ্গ হিসেবে আমাদের প্রণোদনা ও প্রচেষ্টাকে দান করুন নিরাপত্তা ও সাফল্য। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

প্রারম্ভে ও অবশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাকে কাঁদাও ক্যানো, কাল
বারে বারে ঘুরে ঘুরে আনো রাত্রি, শোকের সকাল
নির্ঘুম নিশীথব্যাপী অশ্রুহীন প্রহত প্রপাত
আমাতে উত্থিত করো, হেনে যাও পুরোনো আঘাত
বাঙলার গুল্ম তরু ধানক্ষেত নদী বিল খাল
দুঃখের তরণী বুঝি আমি যার ছিন্নভিন্ন পাল
চিরবিরহীর দেশ বাংলাদেশ আমার মতোন
নীরব আঘাতে হয় চিরন্তন রোদন বেদন
বুকে ব্যথা চোখে শোক জ্বলি যার জন্য নিশিদিন
কোনোদিন শোধ দিতে পারিবো না সেই প্রেমঋণ
শরীরে ফেরে না প্রাণ মনে হয় ফিরিবে না আর
আত্মাকে নিয়েছে বেঁধে সেই শুদ্ধ সবুজ মাজার
হে কাল, ব্যথিত কাল তুমিও বিরহী বুঝি তাই
আমার বিরহে এসে হয়ে আছো শোকের সানাই ।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্‌সীরে মাযহারী (১−১২) মোট ১২ খণ্ড ।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী-১ম খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া ◆মাআ'রিফে লাদুন্নিয়া
মাব্‌দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্‌বন্দ ◆চেরাগে চিশ্‌তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নুরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহা প্লাবনের কাহিনী
◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

সপ্তম অধ্যায়ঃ

পবিত্র নামসমূহ/১১
সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম/১৬
আল্লাহপাকের গুণবাচক নামের আলোকে নবী পাকের নাম/২০
চারশত নামের বিবরণ/২৯

অষ্টম অধ্যায়ঃ

পরজগতের মর্যাদা/৩৬
ফেরেশতাদের তাওয়াফ/৩৮
প্রশংসার পতাকা/৪০
হাউজে কাওছার/৪২
শাফায়াত ও মাকামে মাহমুদ/৪৪
শাফায়াত/৪৬
শাফায়াতের পর্যায়/৫০
পুলসিরাত/৫১
মিজান/৫২
ওসিলা, ফযীলা এবং দরজায়ে রফীয়া/৫৭

নবম অধ্যায়ঃ

মহানবী স. এর প্রতি উম্মতের কর্তব্য/৬৪
ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি/৬৭
রসুলের আনুগত্য ও অনুসরণ/৬৮
বেদাতের বিবরণ/৭১
বেদাতের প্রকার/৭১
সুন্নত প্রতিপালন সম্পর্কিত একটি ঘটনা/৭২
নবী পাক স. এর দরবারে আদব/৭৩
তদানীন্তন খলিফার সঙ্গে ইমাম মালেকের বিতর্ক/৭৫
রসুলের প্রতি ভালোবাসা/৭৬
নৈকট্য ও ভালোবাসা/৮০
দীদার/৮৩
ভালোবাসার নিদর্শনঃ এক/৮৬
ভালোবাসার নিদর্শনঃ দুই/৮৮
ভালোবাসার নিদর্শনঃ তিন/৮৮
ভালোবাসার নিদর্শনঃ চার/৯০
ভালোবাসার নিদর্শনঃ পাঁচ/৯০
ভালোবাসার নিদর্শনঃ ছয়/৯১
ভালোবাসার নিদর্শনঃ সাত/৯১
ভালোবাসার নিদর্শনঃ আট/৯২
কল্যাণকামিতা/৯৫
সাহাবায়ে কেরামের মান্যতা/১০০
হাদিস শরীফ বর্ণনাকালে আদব প্রদর্শন/১০২
আহলে বাইত ও উম্মতজননীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন/১০৪
সাহাবী মান্যতা/১১১
রসুরের স্পর্শধণ্য স্থান ও বস্তুনিচয়ের মর্যাদা/১১৬
সালাত ও সালামের ফযীলত/১১৮
তাশাহ্হুদের সময় দরূদ শরীফ পাঠ/১২৩
দরূদ ও সালাম পাঠের স্থান/১২৪
দরূদ ও সালামের ফযীলত/১৩২
দরূদ শরীফ পাঠ না করার পরিণাম/১৩৯
নবী ও রসুল ছাড়া অন্যদের প্রতি দরূদ পাঠ/১৪১

দশম অধ্যায় ঃ

রসুল আকরম স. এর ইবাদত/১৪৫
পবিত্রতা/১৪৮
পানির পরিমাণ/১৫১
মাথা মসেহ/১৫৭
কান মাসেহ/১৫৯
পা ধৌত করা/১৬০
দাড়ি খেলাল করা/১৬০
হাত ও পায়ের আঙুল খেলাল করা/১৬০

অঙ্গুরীয় সঞ্চালন/১৬১
ঘাড় মসেহ/১৬১
ওজুর দোয়া/১৬২
মোজার উপর মসেহ্/১৬৪
মোজার উপর মসেহ্ করার সময়সীমা/১৬৫
তায়াম্মুম/১৬৭
গোসল/১৬৯
নামাজ/১৭১
আযান/১৭৬
তাকবীরে তাহরীমা/১৮০
সেজদার মধ্যে দোয়া পাঠ/১৯৩
তাশাহহুদের সময় বসা/১৯৫
আমলে কাছীর/২০৫
নামাজ শেষের জিকির ও দোয়া/২০৮
সেজদায়ে সহু/২১৬
সেজদায়ে তেলাওয়াত/২১৯
সেজদায়ে শোকর/২২৪
জুমআর নামাজ/২২৬
জুমআর দিনের বৈশিষ্ট্য/২২৭
আখেরাতে জুমআ দিবসের মর্যাদা/২৩১
খুতবা/২৩৫
তাহাজ্জুদের নামাজ/২৪০
ফজরের সুন্নত/২৪৫
শবে বরাতের নামাজ/২৪৬
চাশতের নামাজ/২৪৯
ঈদের নামাজ/২৫৪
ঈদের গোসল/২৫৬
এস্তেস্কার নামাজ/২৬০
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের নামাজ/২৬৬
ভীতিকালীন অবস্থার নামাজ/২৬৮
সফরকালীন ইবাদাত/২৭০
জানাযার নামাজ/২৭৫
সুন্নতে রাতেবান এবং মোয়াক্কাদা/২৮৪
জাকাত/২৮৯
সদকায়ে নাফেলী (দান খয়রাত)/২৯২

সপ্তম অধ্যায়

পবিত্র নামসমূহ

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামসমূহের মধ্যেও রয়েছে মর্যাদা, মহত্ব ও অনন্যসাধারণত্ব। নামসমূহের মূলে রয়েছে মহিমান্বিত চরিত্র, সৌন্দর্য ও আভিজাত্য। আল্লাহ্পাক তাঁর পাক কালামে মোহাম্মদ মুস্তফা স. এর পবিত্র নামের বিবরণ দিয়েছেন। অন্যান্য আসমানী কিতাবেও বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। নবী ও রসুলগণের মাধ্যমেও উচ্চারিত হয়েছে তাঁর নামের মহিমা। অধিকসংখ্যক নাম বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বৈদগ্ধকে প্রকাশ করে। প্রতিটি নামই কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যনির্দেশক কিংবা গুণবত্তাপ্রকাশক।

তাঁর প্রসিদ্ধতম ও প্রধানতম নাম হচ্ছে– মোহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ্ যেমন আল্লাহ্তায়ালার সত্তাবাচক নাম তেমনি মোহাম্মদ নামটি রসুল পাক স. এর সত্তার পরিচয়কে উন্মোচন করে। তাঁর পিতামহের নাম ছিলো আবদুল মোত্তালিব। তাঁকে বলা হতো শিবাতুল হামদ। ওই শিবাতুল হামদ থেকেই মোহাম্মদ নামের উৎপত্তি। নাম নির্বাচক মূলতঃ আল্লাহ্ই। পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের মাধ্যমে তিনি করেছিলেন এই নামকরণের আয়োজন। লোকেরা বলেছিলো, আপনি আপনার পৌত্রের নাম মোহাম্মদ রাখলেন কেনো? আপনার ঊর্ধ্বতন পুরুষদের মধ্যে আর কেউ তো এরকম ব্যতিক্রমী নামে বিভূষিত হননি। আবদুল মোত্তালিব জবাব দিয়েছিলেন, পৃথিবীবাসীরা যেনো তাঁর গুণকীর্তন করে, তাই এই নাম রেখেছি। বর্ণিত হয়েছে– আবদুল মোত্তালিব একবার স্বপ্নে দেখলেন তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে রৌপ্যনির্মিত একটি শিকল বের হয়ে দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেলো– একটি প্রান্ত গিয়ে ঠেকলো আকাশে, অন্য প্রান্তটি বিস্তৃত হয়ে রইলো পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। তারপর দেখলেন শিকলটি একটি বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। সে বৃক্ষের পত্র-পল্লবে বিকিরিত হচ্ছে অলৌকিক জ্যোতির ঝলক। আরো দেখলেন, পূর্বের ও পশ্চিমের সমস্ত মানুষ সেই মনোমুগ্ধকর জ্যোতিঃচ্ছটায় স্নাত। প্রখ্যাত স্বপ্নবিশারদগণ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন– আপনার বংশে এমন এক মহিমান্বিত শিশু জন্মগ্রহণ করবেন যাঁর অনুসরণ করে ধন্য হবে পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত মানুষ। আকাশের ফেরেশতা ও পৃথিবীর মানুষ সকলেই তাঁর প্রশস্তি বর্ণনা করবে। পুত্র আব্দুল্লাহর গৃহে যখন পবিত্র শিশুটি আর্বিভূত হলেন, তখন তিনি তাঁর নাম রাখলেন মোহাম্মদ স.। তাঁর

মহিয়সী পুত্রবধুকে তিনি এই স্বপ্নবৃত্তান্তটি জানিয়েছিলেন– বলেছিলেন, তুমিই সেই সৌভাগ্যশালিনী। তোমার পুত্রই হবে মানবতার মহানতম নেতা। তোমার পবিত্র পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে তুমি তাঁর নাম রেখো মোহাম্মদ। বিদ্বানগণ বলেছেন, নবী করীম স. এর এই অশ্রুতপূর্ব নামটিও তাঁর নবুয়তের একটি মহান নিদর্শন। আল্লাহ্তায়ালাই এই পবিত্র নামের অধিকারীকে তাঁর আপন তত্ত্বাবধান দান করেছিলেন। তাঁর আর্বিভাবের পূর্বে পৃথিবীবাসীরা এই অনন্য নামের সন্ধান খুঁজে পায়নি। গ্রন্থধারীরা যখন তাঁর আর্বিভাবের বিষয়টি অবগত হলো তখন তাদের কোনো কোনো গোত্রের কেউ কেউ তাদের সদ্যজাত শিশুর নাম মোহাম্মদ রাখতে শুরু করে দিলো। তারা আশা করতে লাগলো, তাদের মোহাম্মদ নামের সন্তানই যেনো হয় শেষ প্রতিশ্রুত পয়গম্বর।

হজরত জুবায়ের ইবনে মুতয়িম থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন– 'আমি মহিমান্বিত পাঁচটি নামের অধিকারী। আমি মোহাম্মদ, আহমদ এবং মাহী। আল্লাহ্তায়ালা আমার মাধ্যমে অবিশ্বাসকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন (পৃথিবীর কেন্দ্র আরব ভূখণ্ড থেকে কুফরী অপসারিত করে দিবেন)। বোখারী, মুসলিম।

নবী পাক স.কে এই মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো যে, পৃথিবীকে তাঁর উম্মতের কর্তৃত্বাধীন করা হবে। হাদিস শরীফে একথা বলা হয়েছে। তাঁর মাহী নামটির ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, এ নামটি এসেছে 'মাহব' থেকে। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন– ''সমস্ত বাতিল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মকে প্রবল ও বিজয়ী করতে.....।" তাঁর পূর্বের নবীগণ সমাজ জীবন থেকে অবিশ্বাসকে পুরোপুরি মিটিয়ে দিতে পারেননি। তিনি পেরেছিলেন। তাই তাঁর নাম 'মাহী'। অথচ তাঁর আর্বিভাবকাল ছিলো সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। অবিশ্বাসে সম্পূর্ণ নিমগ্ন ছিলো পৃথিবীবাসীরা। কেউ ছিলো বিগ্রহবন্দনাকারী। কেউ অগ্নি উপাসক– আবার কেউ তারকাপূজক। কেউ ইহুদী। কেউ নাসারা। কোনো কোনো নির্বোধ ছিলো সম্পূর্ণতঃই সৃষ্টিকর্তার ধারণারহিত। তথাকথিত দার্শনিকেরা হয় নবী রসুলের প্রসঙ্গটি জানতোই না অথবা পুরোপুরি অস্বীকার করতো। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মাধ্যমেই বিকৃত ধর্মবোধ ও ধর্মহীনতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। মিথ্যাচারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন সত্যের মহিমা। সত্য ধর্ম ইসলামের বাণী পৌঁছে গেলো পৃথিবীর উদয়স্থল ও অস্তস্থলের বিস্তৃত পরিসরে। তাঁর পৃথিবীর জীবনে অবশ্য আরব ভূখণ্ডের বাইরে আলো ছড়িয়ে পড়েনি, কিন্তু তাঁর সম্মানিত সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের অনুসারীগণের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে আলোর আওয়াজ। তাঁর আনুগত্যের অটুটতাই অবিশ্বাসের অন্ধকারকে অপসারিত করেছে। তাই তাঁর নাম 'মাহী'। কাযী আয়াযও এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। বলেছেন, তিনিই 'মাহী'– যার অনুসরণ মন্দকে মিটিয়ে দেয়।

রসুল পাক স. বলেছেন– আমার নাম 'হাশের'। কারণ আমার অধীনেই সকল মানুষকে হাশর প্রান্তরে একত্রিত করা হবে। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে– সেদিন সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে আমার সমাধি। তৎপর অন্যদের। হাশরের ময়দানে সকল মানুষ আমার আশ্রয় গ্রহণ করবে। আলেমগণ বলেছেন– একথার অর্থ মানুষ তখন থাকবে আমার ভাষা, আমার সময় এবং আমার রেসালাতের আওতায়। মর্মার্থ এই যে, নবী করীম স. এর পর আর কোনো নবী নেই। তাই হাশরের প্রান্তর যেনো তাঁর নবুয়তের সময়ভূত। খাতেমুন নাবীয়্যিন নামের যথার্থতা এখানেই। কাযী আয়ায এরকম বলেছেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে– সমাধিস্থ মানুষের মধ্যে তাঁর উত্থান হবে সর্বাগ্রে। তারপর মানুষেরা তাঁকে কেন্দ্র করে হাশরে সমবেত হবে। ঘটনাগুলো ঘটবে এভাবে– প্রথমে কবর থেকে উত্থান, তারপর বিচারাপেক্ষায় দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকা এবং শেষে তাঁকে কেন্দ্র করে সমাবেশ।

নবী পাক স. বলেছেন– আমার নাম 'আকেব'। 'আকেব' অর্থ সর্বশেষ আগমনকারী। কোনো কোনো সাধুপুরুষ অবশ্য 'হাশের' নামের সমার্থক হিসেবে খাতেমূল আম্বিয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'আকেব' নামটি খাতেমূল আম্বিয়ার সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, তাঁর নাম পাঁচটি। একথার অর্থ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এবং পূর্ববর্তী আলেমগণের নিকট তাঁর ওই পাঁচটি নামের পরিচিতি ছিলো। কেউ কেউ বলেছেন– পাঁচটি নামের কথা তিনি বলেননি। কথাটি হাদিস বর্ণনাকারীর। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উক্তিটি ছিলো তাঁর নিজেরই। নাম সম্পর্কে অবহিতিদানই ছিলো তাঁর এ মতো উক্তির উদ্দেশ্য। কোনো কোনো হাদিসে আবার ছয়টি নামের উল্লেখ করা হয়েছে এবং ষষ্ঠ নামটি হচ্ছে 'খাতেম'। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর নাম সাতটি –১. মোহাম্মদ ২. আহমদ ৩. ইয়াসীন ৪. ত্বোয়াহা ৫. আল মোদ্দাচ্ছের ৬. আল মোয্যাম্মেল– বর্ণনাকারী সপ্তম নামটি আর উল্লেখ করেননি। নামের ব্যাখ্যায় একথাও এসেছে যে, 'ত্বোয়া হা' অর্থ ইয়া তাহের (হে পবিত্র) অথবা ইয়া হাদী (হে পথপ্রদর্শক)। ইয়াসীন নামের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– ইয়াসীন অর্থ ইয়া সাইয়্যেদ (হে নেতৃশ্রেষ্ঠ)। এরকম বলেছেন আসলামী, ওয়াসেতী এবং জাফর ইবনে মোহাম্মদ। কোনো কোনো হাদিসে এসেছে– তাঁর পবিত্র নাম দশটি। পাঁচটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য পাঁচটি হচ্ছে ১. রহমতের রসুল ২. প্রশান্তির রসুল ৩. দৃঢ়তার রসুল ৪. অন্তিমে আগমনকারী রসুল ৫. পূর্ণতম রসুল। দৃঢ়তার রসুল শব্দটি 'মালাহিম' শব্দের বহুবচন। এই দৃঢ়তা অর্থ যুদ্ধকালীন দৃঢ়তা। এরকম দৃঢ়তার নিদর্শন তিনি ব্যতীত অন্য কেউ প্রদর্শন করতে পারেননি। তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক সমর-সংহত।

রসুল পাক স. বলেছেন,'আমি আলাল মাক্বফি'। মাক্বফি শব্দটি এসেছে 'কেফা' শব্দ থেকে। এই শব্দটির অর্থও শেষাগত। কেউ কেউ মাক্বফি শব্দটিকে বলেন 'মাক্বাফা'। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, শব্দটি এসেছে 'কাফাওয়াত' থেকে। যার অর্থ দয়া ও বিনয়। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় শব্দটির উচ্চারণ 'মুকত্বাফি'।

তাঁর আরেকটি পবিত্র নাম 'কাইয়্যিম'। তিনি বলেছেন– আনাল কাইয়্যিম (আমি পূর্ণ ও পরিণত)।

আশশিফা রচয়িতা বলেছেন– নামটির উচ্চারণ সম্ভবতঃ 'ক্বছাম'। এরকম বর্ণিত হয়েছে আল্লামা হরবী সূত্রে। তিনি স. স্বয়ং বলেছেন, একবার ফেরেশতা এসে আমাকে বললো আন্তা ক্বছাম (আপনি সমন্বয়ক)। আরবীতে শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'কুছুম' উচ্চারণে। যার অর্থ সমন্বয়। যিনি সামগ্রিকতাকে সমন্বয় করতে সক্ষম তিনিই কুছুম। আহলে বাইতগণ এ নাম জানতেন। কাইয়্যিম নামটিও তাঁর প্রতি প্রযোজ্য। এ নামটিও কুছুম নামের প্রায় সমার্থক।

বিভিন্ন আকাশী পুস্তিকায় (সহীফায়) লিপিবদ্ধ রয়েছে– হজরত দাউদ আ. প্রার্থনা করেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে সেই পয়গম্বরকে প্রেরণ করুন যিনি কাইয়্যিম-এ সুন্নত হবেন। কাইয়্যিমাতে সুন্নত অর্থ সুন্নত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পবিত্র নামের আরও অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন– নবীউল মালহামাহ, নবীউল মারহামাহ, নবীউর রাহাত, নবীউর রহমত ইত্যাদি। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, ‘‘ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিল আলামীন" (আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি মহাবিশ্বের রহমতরূপে)। আল্লাহ্পাক আরও এরশাদ করেছেন– ‘‘বিল মু'মিনিনা রউফুর রহিম" (নবীপাক বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ালু ও অনুকম্পা পরবশ)। অন্যত্র এরশাদ করেছেন– হে রসুল! আপনি আপনার উম্মতকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিন, আরও উপদেশ দিন সংবেদনশীলতার, তারা একে অপরের অনুরাগী যেনো হয়। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক তাঁর দয়ার্দ্রচিত্ত দাসদের ভালোবাসেন। আরও বর্ণিত হয়েছে, যারা অন্যকে দয়া করে আল্লাহ্তায়ালাও তাদেরকে দয়া করেন। সুতরাং তোমরা পৃথিবীবাসীদের সহমর্মী হও, যদি আল্লাহ্র দয়া লাভের প্রত্যাশা থাকে। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, রসুলে আকরম স. এবং তাঁর উম্মতের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে রহমত।

পবিত্র নামের তালিকায় আরেকটি সংযোজন হচ্ছে নবীউত্ত্বাওবা। তাঁর পবিত্র হস্ত ধারণ করে বহুসংখ্যক মানুষ তওবা করেছেন বলেই এই নাম। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বরকতে তাঁর উম্মতের তওবা কবুল করেছেন। এমনকি মানবজাতির পিতা হজরত আদমের তওবাও তাঁরই বরকতে কবুল করা হয়েছে। জ্ঞানবানগণ বলেছেন, হজরত আদম আ. আল্লাহ্পাকের নিকট থেকে তওবা কবুলের যে

বাণীগুলো শিখেছিলেন তাঁর মমার্থ হচ্ছে– হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! মোহাম্মদের মর্যাদার দিকে দৃষ্টিপাত করে আমার তওবা কবুল করো।

কোরআন মজীদে তাঁর অনেক নাম ও উপাধি লিপিবদ্ধ রয়েছে যেমন– নূর, সিরাজুম মুনীর, মুনজির, নাজির, মুবাশশির, বাশির, শাহেদ, শহীদ, আল হক্ক, আল মুবীন, খাতামুন নবীয়্যিন, আল উম্মিয়্যিন, আল আজীজ, আল হারিছ, আর রউফ, আর রহিম, কাদামা সিদ্‌ক, রহমাতুল্লিল আলামীন, আল উরওয়াতুল উসকা, ত্বোয়াহা, ইয়াসিন, আননাজমুছ ছাক্বিব, আল কারীম, আল নাবিয়্যিল উম্মী, আল বোরহান ইত্যাদি। পূর্ববর্তী কিতাব এবং ধর্মীয় পুস্তকেও তাঁর অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন– মোস্তফা, মুজতাবা, আবুল কাসেম, শাফি, মুত্তাকি, মুসলিহ, তাহের, মুহাইমিন, সাদেক, মাসদুক, হাদী, সাইয়্যেদে বুলদে আদম, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকিন, রসুলু রব্বিল আলামীন, কায়েদুল গুররিল মুহাজ্জিলিন, হাবিবুল্লাহ, খলিলুর রহমান, ছাহেবুল হাউযিল মাওরোদ, সাহেবুস শাফায়াত, সাহেবুল মাকামিল মাহমুদ, সাহেবুল অসিলাহ, সাহেবুল ফযীলাহ, সাহেবুদ্‌ দারাজাতির রফিয়াহ, সাহেবুত তাজ, সাহেবুল মেরাজ, সাহেবুল লেওয়া, সাহেবুল কযব, আর রাকিব, সাহেবুল বোরাক, সাহেবুন নাফাহ, আননাজিব, সাহেবুল হুজ্জাত, আস্‌সুলতান, আল খাতেম, আল অল্লামাহ, সাহেবুল হারাওয়াহ, সাহেবুন নালায়্যিন ইত্যাদি। আল মুতাওয়াককিল, আল মুখতার, মুকিমুস সুন্নাহ, আল কুদস, রুহুল কুদস– এই নামগুলোও লিপিবদ্ধ রয়েছে অনেক কিতাবে। আর রুহুল কুদস, আল কুদস এর সমার্থক হিসাবে ইঞ্জিল শরীফে তাঁর নাম বলা হয়েছে ফারকলিত। তিনিই ফারকলিত যিনি হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম। পূর্ববর্তী গ্রন্থে উল্লেখিত আরেকটি নাম 'বাওনাদ'– যা তাইয়্যেব শব্দটির সমার্থক। আরেকটি নাম 'হামারা' অর্থাৎ হামীউল হেরেম। সুরিয়ানী ভাষায় তাঁর নাম মুসফেহ্‌ ও আল মাহ্‌না। তওরাত শরীফের একটি নাম 'আখয়াজ' আরবীতে যার অর্থ সাহেবুল কযীব (যষ্টিধারী) ও সাহেবুস সাইফ (তলোয়ারধারী)। ইঞ্জিল শরীফের তাফসীরে আরেকটি নামের উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়, সে নামটি হচ্ছে– 'ইয়াজুবী'। আরেকটি নাম সাহেবে হারাওত। হারাওত শব্দের অর্থ লাঠি। তিনি হাতে লাঠি রাখতেন বলেই তাঁর এই নাম। সাহেবুল কযীব ও সাহেবুল হারাওত প্রায় সমার্থক। শিফা প্রণেতা বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালাই অধিক অবগত, তবে আমার মনে হয় উক্ত নামদ্বয়ে যে লাঠির কথা বলা হযেছে সেই লাঠিটির উল্লেখ রয়েছে হাদিসে হাউজের বর্ণনায়। রসুল পাক স. বলেছেন (হাউজে কাউসারের পাশে) আমি আমার লাঠি দ্বারা ইয়ামনবাসীদেরকে প্রতিহত করবো যাতে– তারা হাউজে কাওসারে আসতে না পারে। সাহেবুত তাজ অর্থ পাগড়ীধারী। তিনি বলেছেন, পাগড়ী হচ্ছে আরববাসীদের মুকুট। তিনি ছিলেন সেই মুকুটধারী। শিফা রচয়িতা কাযী আয়ায

আরো বলেছেন, তাঁর উপাধিসূচক ও স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অনেক নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে। সেখান থেকে উপরোক্ত নামগুলো উল্লেখ করা হলো।

আবুল কাসেম– তাঁর কুনিয়াতি নাম। কুনিয়াতি নামের মধ্যে এ নামটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর পুত্র ইব্রাহিম যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন হজরত জিব্‌রাইল তাঁকে বলেছিলেন 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসেম।' আবুল আরামিল, আবুল মানিন এবং আবুল ইয়ামাতাও কুনিয়াতি নামের মধ্যে গণ্য। হজরত আবু তালেবের একটি কবিতার মধ্যে রয়েছে "লিল ইয়াতামা ইসমাতুল আরামিল"।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা বলেছেন– তাঁর নাম ও গুণের উল্লেখ রয়েছে কোরআন মজীদের অনেক স্থানে। কেউ কেউ সেগুলোর তালিকা নির্ণয় করেছেন। কেউ কেউ সংখ্যাও নির্দিষ্ট করেছেন। কেউ আবার বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের গুণাবলী প্রকাশের নাম যেমন নিরানব্বইটি তেমনি তাঁরও গুণবাচক নামের সংখ্যা নিরানব্বইটি। মুস্তাওফী নামক কিতাবে এরকম বলা হয়েছে।

কোরআন মজীদ, হাদিস শরীফ এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব থেকে নাম তালাশ করলে প্রায় তিনশ'টি নাম পাওয়া যাবে তাঁর। আমি কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর আহকামুল কোরআন গ্রন্থে এ বিষয়টির বর্ণনা দেখেছি। গ্রন্থকার বলেছেন, কোনো কোনো সুফিয়ায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ্‌তায়ালার নামের সংখ্যা এক হাজার। তেমনি তাঁর হাবীবের নামও এক সহস্র। কোনো কোনো বিশেষণসূচক নাম কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবার কোনোগুলো যেমন অন্যের জন্য প্রযোজ্য তেমনি তাঁর জন্যও। তাঁর ওই সকল বিশেষণ বা গুণকে যদি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামসম্বলিত করা হয় তবে নামের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে এক হাজারে। বরং হাজার ছাড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব।

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা বলেছেন– রসুলপাক স. এর চারশতেরও অধিক নাম রয়েছে। তবে তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে আহমদ ও মোহাম্মদ। আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তানির্দেশক নাম যেমন আল্লাহ্ তেমনি তাঁর সত্তাসূচক নাম হচ্ছে আহমদ ও মোহাম্মদ। অন্য নামগুলো গুণবাচক। আহমদ ও মোহাম্মদ নাম দু'টিও আবার একটি মূল ধাতু থেকে উদগত। সেটি হচ্ছে হামদ। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বোত্তম প্রশংসা করেছেন এবং আখেরাতেও করবেন। তাই তিনি আহমদ। তিনি পৃথিবীতে সর্বোত্তম প্রশংসাভাজন হয়েছেন। পরবর্তী পৃথিবীতেও হবেন তেমনি। তিনি একদিকে আহমাদুল হামেদীন (সর্বাধিক প্রশংসাকারী) অন্যদিকে আহমাদুল মাহমুদিন (সর্বাধিক প্রশংসাভাজন)। প্রশংসিতজনদের মধ্যে

তাই তিনিই শ্রেষ্ঠ। কিয়ামতের দিন তিনিই হবেন প্রশংসার পতাকাবাহী। সেদিন হবে প্রশংসার পরিপূর্ণ প্রকাশ। প্রকাশিত হবে তাঁর প্রশংসাকারী ও প্রশংসিত নামের মহিমা। আল্লাহ্পাক তখন তাঁকে মাকামে মাহমুদ দান করবেন যার অঙ্গীকার তিনি করেছেন। অঙ্গীকারনামাটি এই– ‘‘আছা আঁই ইয়াব আছাকা রব্বুকা মাক্কামাম মাহমূদা (আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমুদে উন্নীত করবেন)।

হাশর প্রান্তরে তিনি শাফায়াতের তোরণ উন্মুক্ত করবেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই তাঁর গুণকীর্তন করতে থাকবে। আল্লাহ্তায়ালা তখন তাঁকে এমন স্তবস্তুতি-প্রকাশক বাক্য শিক্ষা দিবেন– যা ইতোপূর্বে কেউ জানতো না। আল্লাহ্পাক তাঁর উম্মতের নাম রেখেছেন হাম্মাদুন বা অত্যধিক প্রশংসাকারী। উম্মতের নাম যেহেতু হাম্মাদুন তাই তাঁদের নবীর নাম মোহাম্মদ হওয়াই সমীচীন।

উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আহমদ শব্দের অর্থে রয়েছে কর্তৃকারক পদের অর্থে। শব্দটির এই অর্থই অধিক প্রচলিত। আবার কর্মকারক পদের অর্থেও শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। এরকম হলে অর্থ হবে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশংসিত। সেক্ষেত্রে মাহমুদিয়াতের অর্থই প্রাধান্য লাভ করবে।

কেউ কেউ বলেছেন, পূর্ববর্তী সময়ের মানুষের মধ্যে তাঁর আহমদ নামটিই ছিলো প্রসিদ্ধ। হজরত মুসা আ. এই নামেই তাঁকে স্মরণ করতেন। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও এই নামটি অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। কোরআন মজীদে অবশ্য মোহাম্মদ নামটি উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃত কথা এই যে, অনেক আগে থেকেই তাঁর মোহাম্মদ ও আহমদ– দু’টি নামই উচ্চারিত হতো। তবে হজরত মুসা আ. অধিক সম্মানার্থে বলতেন– আহমদ। যেহেতু আরবী ব্যাকরণ অনুসারে আহমদ নামটিই অধিকতর গুরুত্ববহ ও মর্যাদানির্দেশক। হজরত হাসসান ইবনে ছাবেত রা. তাঁর গুণকীর্তন করেছেন এভাবে– আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আপন নামের সঙ্গে নবীপাকের নাম মিলিয়ে নিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজানের সময় মুয়াজ্জিন যখন আল্লাহ্ নামের সাক্ষ্য প্রদান করেন, তখন তাঁর নামের সাক্ষ্যও উচ্চারিত হয়। আল্লাহ্পাক তাঁর হাবীবের নাম তাঁর নিজের নাম থেকেই নির্গত করেছেন। আল্লাহ্র নাম মাহমুদ এবং তাঁর হাবীবের নাম মোহাম্মদ। দু’টি নামই এসেছে হামদ (প্রশংসা) থেকে।

তারিখে ছগীর গ্রন্থে আলী ইবনে যায়েদের সনদের মাধ্যমে বোখারী বলেছেন, উক্ত কবিতার শেষ অংশটি রচনা করেছেন হজরত আবু তালেব। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্পাক তাঁর নাম রেখেছেন আহমদ। হজরত কা’ব আহবার থেকে ইবনে আসাকের বলেছেন, হজরত আদম তাঁর পুত্র শীশকে বললেন, তুমি আমার পরবর্তী প্রতিনিধি। তুমি তাকওয়ার স্তম্ভ এবং ওরওয়া বুছকাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রেখো। আল্লাহ্র নাম স্মরণের সময়

মোহাম্মদ নামটিও স্মরণে রেখো। আমি এ নামটি আরশের স্তম্ভে লিখিত দেখেছি। সেখানে এ নামটি তখনো লিপিবদ্ধ ছিলো যখন আমার আবির্ভাবই ঘটেনি। আমি সৃষ্ট হয়ে সকল আকাশ বিচরণ করেছি। সেখানে এমন কোনো স্থান পাইনি যেখানে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ ছিলো না। আমার বেহেশতবাসের সময়েও দেখেছি সর্বত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে মোহাম্মদের নাম। আয়তআঁখিনী হুরদের কপালে, তুবা বৃক্ষের পত্র-পল্লবে, ছিদরাতুল মুনতাহার পাতায় পাতায়, বেহেশতের পর্দাসমূহে এবং ফেরেশতাদের চোখেও দেখেছি মোহাম্মদের নাম। সুতরাং হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি মোহাম্মদের নাম বেশী বেশী স্মরণ করো। হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আদম তাঁর বিপদের সময় প্রার্থনা করেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! মোহাম্মদের নামে আমাকে ক্ষমা করে দাও। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, প্রার্থনাকালে আল্লাহ্পাক বলেছিলেন, তুমি মোহাম্মদের নাম জেনেছো কীভাবে? হজরত আদম বলেছিলেন, আমি জান্নাতের প্রতিটি স্থানেই দেখতে পেয়েছি– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "মোহাম্মদ আবদি ওয়া রসুলিহ" (মোহাম্মদ আমার বান্দা এবং রসুল)। হজরত আদম আরও বলেছিলেন, তাঁর নাম পাঠ করে আমি বুঝেছি, তিনি আপনার নিকট অন্য সকল কিছু থেকে অধিকতর উত্তম। কেউ কেউ মনে করেন, বর্ণিত হাদিসটি ওই আয়াতের ব্যাখ্যা যেখানে বলা হয়েছে "আদম তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কতিপয় বাক্য শিখে নিয়েছিলেন।"

আশশিফা গ্রন্থে এর চেয়েও অধিক বিস্ময়কর বর্ণনা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীতেও রয়েছে তাঁর পবিত্র নামের প্রাচীন প্রমাণ। একটি সুপ্রাচীন পাথরে লিপিবদ্ধ ছিলো 'মোহাম্মাদুন তাকীউম মুছলিহুম আমীন'। আরও বর্ণিত হয়েছে– আরেকটি অতিপ্রাচীন প্রস্তরখণ্ডে ইবরানী ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিলো, বিইসমিকাল্লাহুম্মা জায়ালা হাক্কু মির রাব্বিকা বি লিসানি আরাবিইম মুবিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ কাতাবাহু মুসা ইবনু ইমরান।

উক্ত বর্ণনা মোয়াম্মার এবং জুহুরী থেকে এসেছে এবং লিপিবদ্ধ হয়েছে ইবনে জাফরের আল-ইয়াছির গ্রন্থে। খোরাসানের এক শহরে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো, তার পার্শ্বদেশে লিখা ছিলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।" ভারতের একটি ফুল গাছের পাতায় শাদা অক্ষরে লিখা ছিলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে সোহান থেকে আল্লামা ইবনে মারজুক বর্ণনা করেন– তিনি বলেছেন, আমরা একবার ভারত মহাসাগরে সফর করছিলাম। হঠাৎ তুফান শুরু হলো। সমুদ্র হয়ে উঠলো তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ। আমরা আমাদের নৌকা তীরে ভিড়ালাম। সেখানে দেখতে পেলাম একটি বিস্ময়কর গোলাপ ফুল। তার সুবাস অতি তীক্ষ্ণ। তার মধ্যে শুভ্র অক্ষরে লিখিত রয়েছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।" আরেকটি শাদা ফুলে

দেখলাম হলুদ বর্ণে লিপিবদ্ধ রয়েছে– "বারাআতুম্মিনার রহমানির রহীম ইলা জান্নাতিন নাঈম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

তারিখে ইবনুল আজীজ গ্রন্থে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ হাশেমী শারকী থেকে সংকলিত হয়েছে, ভারতের এক গ্রামে প্রখর সুরভিবিশিষ্ট একটি বৃহৎ আকৃতির ফুল পাওয়া গিয়েছিলো। ওই ফুলটির পাপড়িতে শাদা বর্ণে লিপিবদ্ধ ছিলো– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।" আরও লিপিবদ্ধ ছিলো আবু বকর আস সিদ্দিক এবং ওমর আল ফারুক। বর্ণনাকারী বলেছেন– আমি মনে করেছিলাম এটি হয়তো কোনো শিল্পীর শিল্পকর্ম। তখন দেখলাম আরেকটি ফুল। ফুলটি তখনো পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়নি। সেই ফুলটিতেও দেখলাম একই রকম লিখা। ওই জনপদটির মানুষ ছিলো প্রস্তরপূজক। আল্লাহ্-পরিচিতি সম্পর্কে তাদের কোনো দূরবর্তী ধারণাও ছিলো না। সেখানকার জিনিসপত্রও ছিলো খুব সস্তা।

আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন– ভ্রমণরত অবস্থায় আমি ভারতের একটি শহরে পৌঁছলাম। শহরটির নাম ছিল তামিলা। অথবা নামিলা। সে শহরে ছিল একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ। তার ফল ছিলো বাদামের মতো খোসাবিশিষ্ট। একটি ফলের খোসা ছড়িয়ে ফেলতেই দেখা গেলো তার মধ্যে রয়েছে একটি সবুজ পাতা। সে পাতায় লাল রঙ এ লিখা ছিলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।' সেখানকার লোকেরা ওই গাছের ফল দ্বারা বরকতলাভ করে থাকে। অনাবৃষ্টি দেখা দিলে তারা ওই ফলের মাধ্যমে বৃষ্টিপ্রার্থী হয়। আবুল বাকায়েন শাফেয়ী তাঁর মানসাক পুস্তকে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

রওজাতুর রাইয়াহিন গ্রন্থে কতিপয় আলেমের মাধ্যমে হজরত ইয়াফেয়ী বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট আবু ইয়াকুব সাঈয়াদ একটি ঘটনা বলেছেন। ঘটনাটি এই– আমি একবার ওবাল্লা নামক এক নদীতে মৎস্য শিকার করছিলাম। তখন পেয়েছিলাম একটি অদ্ভুত মাছ– যার এক পাশে লিখিত ছিলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং অপর পাশে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। আমি মাছটি পানিতে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কাসিদায়ে বোরদা শরীফের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ ইবনে মারজুক থেকে বর্ণনা করেছেন– একবার একটি বিস্ময়কর মাছ পাওয়া গিয়েছিলো যার ডান কানের চামড়ার উপর লেখা ছিলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং বাম কানের চামড়ার উপর লেখা ছিলো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। একদল লোক এরকম একটি বর্ণনা পেশ করেছেন যে, একবার একটি আশ্চর্যজনক খরবুজা পাওয়া গেলো। খরবুজার এক পাশে আরবীতে লেখা ছিলো 'আল্লাহ্' এবং অপর পাশে লেখা ছিলো 'আহমদ'। খুরবুজার রঙ ছিলো জরদ এবং লেখার রঙ শাদা। অতি স্পষ্ট সেই লেখা দর্শকেরা পড়তে পারতো সহজেই।

আটশ' নয় হিজরীতে একটি আজব আঙ্গুর পাওয়া গেলো। আঙ্গুরটিতে কালো রঙ এ লেখা ছিলো মোহাম্মদ। ইবনে জাফর ইবনে সাঈয়াফ রচিত বাতনে মাফহুম

গ্রন্থে এ বিবরণটি রয়েছে– তিনি একবার একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখলেন। তার পাতাগুলো ছিলো বৃহৎ আকৃতির। সুবাসযুক্ত সেই পাতাগুলোর মধ্যে শাদা ও লাল রঙ-এ তিন লাইনে লিখিত ছিলো সেই অলৌকিক লিপি। প্রথম লাইনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দ্বিতীয় লাইনে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ এবং তৃতীয় লাইনে ছিলো– ইন্নাদ্দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম।

আল্লাহ্পাকের গুণবাচক নামের আলোকে নবী পাকের নাম

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স. এর নাম রেখেছেন আসমা এ হুসনা (সুন্দরতম নামগুচ্ছ) এবং সিফাতে আলার (উন্নত গুণাবলীর) দ্বারা। কাযী আয়ায বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আসমায়ে হুসনার আলোকে অনেক নবীর নাম রেখেছেন। সে সমস্ত গুণাবলীর পরিচয় বিধৃত ছিলো তাঁদের জীবনে। হজরত ইসহাক, হজরত ইসমাঈলের নাম দিয়েছেন আলীম ও হালিম। হালিম বলেছেন হজরত ইব্রাহিমকেও। হজরত নূহকে বলেছেন শাকুর। হজরত ইসা, ইয়াহহিয়া ও মুসাকে বলেছেন– কালীম এবং কাবী। হজরত ইউসুফকে বলেছেন হাকিম ও আলীম। হজরত আইয়ুবকে ডেকেছেন ছাবের। হজরত ইসমাঈলের ছিলো আরেকটি নাম– সাদিকুল ওয়াদি। এ সকল নাম কোরআন মজীদের বিশেষ বিশেষ স্থানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোরআনে বর্ণিত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর নামের সংখ্যা প্রায় তিরিশটি। সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমেই এই সংখ্যা নির্ণীত হয়েছে। শরহে সুদুরের (বক্ষ সম্প্রসারণের) মাধ্যমে আরও অধিক নামের সন্ধান পাওয়া বিচিত্র নয়।

রসুল পাক স. ছিলেন আল্লাহ্পাকের সকল আসমা ও সিফাতের (নাম ও গুণাবলীর) পরিপূর্ণ সমন্বয় ও বিকাশ। তিনি ছিলেন আখলাকে ইলাহীর (আল্লাহ্র চরিত্রের) রঙ-এ রঞ্জিত ও ভূষিত। এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো আহলে আরেফ (আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তি) বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কাযী আয়াযের গ্রন্থে নামের যে সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে তা কোরআন মজীদ এবং সহীহ্ হাদিস থেকে চয়িত। আসমায়ে হুসনা থেকে চয়নকৃত একটি নাম হচ্ছে হামীদ। যার অর্থ মাহমুদ (প্রশংসিত)। বহুসংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অস্তিত্বের প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। মহাজীবনে ও মহাপৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে এর অজস্র প্রমাণ। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর প্রশংসায় মুখর। হামীদ শব্দের আরেকটি অর্থ হামেদ (প্রশংসাকারী) অর্থাৎ তিনি যেমন তাঁর সত্তার প্রশংসাকারী তেমনি তাঁর অনুগতদেরও প্রশংসাকারী। তাই তিনি হামেদ। আর সকল সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করে বলেই তিনি মাহমুদ (প্রশংসিত)।

তাঁর মোহাম্মদ নামটিও দু'রকম অর্থ প্রকাশক বলা যেতে পারে। মোহাম্মদ-ই আহমদ, হামেদ এবং মাহমুদ। এরকম উদ্ধৃতি রয়েছে হজরত দাউদের কিতাবে। আর রউফ ও আর রহীম আল্লাহ্তায়ালার নাম। তিনি তাঁর হাবীবকেও এই দুই

নামে বিভূষিত করেছেন। যেমন কালাম মজীদে বর্ণিত হয়েছে "বিল মু'মিনিনা রউফুর রহীম।" রউফ ও রহীম সমঅর্থপ্রকাশক। কেউ কেউ আবার শব্দ দুটির মধ্যে সামান্য পার্থক্য নির্দেশ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, সাধারণ রহমতের ক্ষেত্রে 'রহীম এবং বিশেষ বা সর্বোচ্চ রহমতের ক্ষেত্রে রউফ শব্দটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ অনুগতদের জন্য তিনি রউফ এবং পাপীদের জন্য রহীম।

আল্লাহ্তায়ালার এক নাম 'আলহক্কুল মুবিন'। তিনি যে প্রতিপালক হিসেবে হক্ক (সত্য) – এ কথায় সন্দেহ মাত্র নেই। আর আল মুবিন নামের তাৎপর্য এই যে, তিনি আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াতের (উপাস্য হওয়ার) নির্দেশ এবং হক্কানিয়াতের (সত্যনিষ্ঠতার) দলিল প্রমাণ প্রকাশ করে দিয়েছেন। মুবিন অর্থ দ্বীনের বিধান প্রকাশক। আবার দ্বীনের মাবদা ওয়া মা'আদ (সূচনা ও সমাপ্তি) প্রকাশক হিসেবেও তাঁকে মুবিন বলা যেতে পারে। আল্লাহ্পাক তাঁর হাবীবকেও আল হক্ক ও আল মুবিন নামে বিভূষিত করেছেন। এ মর্মে কালাম মজীদে উল্লেখিত হয়েছে– ১. হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট হক্ক আগমন করেছেন। ২. হক্ক যখন অবিশ্বাসীদের নিকট আগমন করলেন তখন তাঁরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো ৩. এমনকি হক্ক তোমাদের নিকট আবির্ভূত হলেন আর তিনি হচ্ছেন প্রকাশকারী (রসুলুম মুবিন)। রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন "আনান্নাজিরুল মুবিন" (আমি ভীতি প্রদর্শক ও প্রকাশকারী)। কেউ কেউ বলেছেন নাজির ও মুবিন অর্থ কোরআন মজীদ। উদ্ধৃত আয়াতে উল্লেখিত হক্ক শব্দটির অর্থ মিথ্যাবিরোধী। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নবীপাকের সত্যনিষ্ঠতা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর রেসালত সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য। মর্মগত দিক থেকে আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁর হাবীব উভয়েই মুবিন। কেননা আল্লাহ্তায়ালা সত্য প্রকাশার্থে তাঁর হাবীবের প্রতি কোরআন মজীদ অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি স. প্রকাশ্যে তার প্রচার করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাই এরশাদ করেছেন– অবতীর্ণ বিষয়াবলী আপনি প্রকাশ করে দিবেন– সেই উদ্দেশ্যেই আমি আপনার উপরে কোরআন মজীদ অবতীর্ণ করেছি।

কোরআন মজীদে উদ্ধৃত হযেছে "ওয়ামা খলাকনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব।" কেউ কেউ এই আয়াতের তাফসীর করেছেন এরকম– আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সকলকিছুই আল্লাহ্তায়ালা নবীপাক স. এর জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই তাফসীরটি হজরত জাবেরের বর্ণনার অনুকূলে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথমে আহমদ মোস্তফা স. এর রূহ সৃষ্টি করেছেন। সেই রূহ থেকে সৃষ্টি করেছেন আরশ, কুরসি, আকাশ, পৃথিবী এবং সমগ্র সৃষ্টি।

আল্লাহ্তায়ালার একটি নাম নূর। নূর শব্দটির রয়েছে বিভিন্নরকম অর্থ। যেমন– নূর বহনকারী, নূরের স্রষ্টা, আকাশ ও পৃথিবীকে নূরের মাধ্যমে আলোকিতকারী, আরেফগণের অন্তরে হেদায়েত ও রহস্যের আলো প্রজ্জ্বলনকারী

ইত্যাদি। আল্লাহ্পাক মোস্তফা স. কেও নূর নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন– "নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব।" অন্যত্র এরশাদ হয়েছে– "ওয়া সিরাজাম মুনিরা"– অর্থাৎ তিনি উজ্জ্বলকারী আলোকবর্তিকা। রসুল পাক স. যে নূর তার কারণ হচ্ছে তিনি আল্লাহ্তায়ালার আহ্বানকে প্রোজ্জ্বল করেছেন, জ্বালিয়েছেন নবুয়তের নূর এবং সত্য ধর্ম ইসলামের মাধ্যমে আরেফগণের হৃদয়কে করেছেন আলোকিত।

আল্লাহ্পাকের আরেক নাম 'আশ শহীদ'। কাযী আয়ায বলেছেন, শহীদ শব্দের অর্থ আলেম। অন্য এক মতানুসারে শহীদ অর্থ সাক্ষী। আল্লাহ্পাক তাঁর হাবীবের নামও রেখেছেন শাহেদ ও শহীদ। যেমন এরশাদ হয়েছে– আপনাকে আলেম হিসাবে প্রেরণ করেছি অর্থাৎ উম্মতের অবস্থা, সৎ-অসৎ আচরণ, তাদের ধ্বংস ও মুক্তি সকল কিছুকে চাক্ষুস পর্যবেক্ষণকারী হিসাবে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি। অন্য এক স্থানে এরশাদ হয়েছে এই রসুল তোমাদের বিষয়ে সাক্ষী হবেন।" কিয়ামতের দিন অন্য নবীর উম্মতেরা তাদের নবী সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে। বলবে, আমাদের নবী আমাদেরকে সত্য সংবাদ পৌঁছাননি– তখন উম্মতে মোহাম্মদী তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। আর তাদের সাক্ষ্য প্রত্যয়ন করবেন রসুলে আকরম স.। হাদিস শরীফে এরকমই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্র আরেকটি নাম 'কারীম'। কারীম অর্থ অধিক কল্যাণ, অধিক অনুগ্রহ এবং অধিক ক্ষমা। এরকম বলেছেন কাযী আয়ায। আকরম শব্দটিও কারীম শব্দের সমার্থক। রসুলুল্লাহ স. এর এই আকরম নাম হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোরআন মজীদে আল্লাহ্তায়ালার নাম যেমন কারীম তেমনি তাঁর হাবীবের নামও কারীম হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে– নিশ্চয়ই এই বাণী একজন কারীম রসুল কর্তৃক পঠিত বাণী। এখানে হজরত জিব্রাইলকে নয়– রসুলুল্লাহ স. কেই কারীম নামে অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতেও এই ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন– কোরআন কোনো কবির বাণী নয় যে, অল্পসংখ্যক মানুষ ইমান আনবে। আবার এটি কোনো গণকের কথাও নয় যে, নগণ্য সংখ্যক লোক তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। এখানে যিনি কবি বা গণক নন তিনিই রসুলুল্লাহ স.। কারণ, অবিশ্বাসীরা হজরত জিব্রাইলকে কখনো কবি বা গণক বলে অভিহিত করেনি। এরকম অপবাদ তারা দিয়েছিলো রসুলুল্লাহ স.কে। বর্ণিত আয়াতটি সুরা আল হাক্কা-এর অন্তর্গত। সুরা আততাকবীরের এই সম্পর্কিত আয়াতটিতে অবশ্য হজরত জিব্রাইল এর কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, সেখানেও রসুলুল্লাহ স. এর কথাই বিবৃত হয়েছে। কেননা, এই নামটি কেবল তাঁর জন্যই শোভনীয়। অন্য কারো জন্য নয়। তিনি স্বয়ং বলেছেন, আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মোকাররম (সম্মানিত)। আকরম বা

মোকাররম এর গুণ কেবল তাঁর স. মধ্যেই বিদ্যমান ছিলো। কেননা করম শব্দটি দ্বারা কাউকে বিশেষিত করা হলে তার সকল গুণের প্রশংসার ভাবটি ফুটে উঠে। তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল দিক এবং সত্তা ও গুণের সকল অবস্থা ছিলো করম এর বৈভবে বিভূষিত।

আল্লাহ্‌তায়ালার অন্যতম নাম আল আজীম। আজীম অর্থ অতি মহান। এই নাম দ্বারা যিনি বিভূষিত হন তার মর্যাদা সকলের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্‌পাক তাঁর হাবীবকেও এই নাম দিয়েছেন। এই মর্মে এরশাদ করা হয়েছে– 'ইন্নাক্বা লা আলা খুলুক্বিন আজীম' (নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রাধিষ্ঠিত)। তওরাত শরীফে হজরত ইসমাইল সম্পর্কেও আজীম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে– "অচিরেই তাঁর মহিয়সী মাতা এক মহান সন্তানের জন্ম দান করবেন।" রসুলে করীম স. এর গুণাবলী যেমন আজীম তেমনি তাঁর সত্তাও আজীম। গুণ আজীম হলে সত্তাতো আজীম হবেই।

আল্লাহ্‌তায়ালার নামসমূহের মধ্যে আরেকটি নাম আল জব্বার। জব্বার শব্দের অর্থ অনেক রকম। যেমন– সংশোধনকারী, নির্মম ক্ষমতা প্রয়োগকারী, সর্বাপেক্ষা বড়, মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত ইত্যাদি। যবুর শরীফের চল্লিশতম অধ্যায়ে রসুল পাক স. কেও এই নামে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে– হে জব্বার! আপনি আপনার তলোয়ার অঙ্গে জড়িয়ে নিন। কেননা, আপনার রেসালাত, শরিয়ত আপনার আত্মমর্যাদার (হায়বতের) সঙ্গে সম্মিলিত। রসুল পাক স. এর নাম জব্বার হওয়াই সঙ্গত। কেননা তিনি পথ প্রদর্শন ও শিক্ষার মাধ্যমে উম্মতকে সংশোধিত করেছেন। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মের শত্রুদেরকে পরাভূত করেছেন। তাঁর মহান মর্যাদা সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবুও কোরআন মজীদে অহংকারকে তাঁর জন্য অসমীচীনরূপে দেখানো হয়েছে। কেননা অহংকার বা দম্ভ তাঁর অনন্যসাধারণ অবস্থা ও স্তরের জন্য শোভনীয় নয়। তাই বলা হয়েছে– আপনি তাদের প্রতি নির্মমও নন, বল প্রয়োগকারীও নন।

'আল খাবির' আল্লাহ্‌র আরেকটি নাম। যিনি বস্তুসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত তিনিই 'খাবির'। শব্দটি আলীম (জ্ঞানী) শব্দের সমঅর্থসম্পন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, খাবির অর্থ মুখবির (সংবাদ দানকারী)। রসুলে আকরম স. বর্ণিত দু'টি অর্থের দিক থেকেই খাবির। কেননা, আল্লাহ্‌পাক তাঁকে মারেফতের মহাজ্ঞান দান করেছেন, বস্তুসমূহের হকিকতও জানিয়েছেন। তাই তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী।

আল্লাহ্‌তায়ালার আরেকটি নাম 'আল ফাত্তাহ্'। ফাত্তাহ্ অর্থ বান্দাদের হাকীম– রিজিক ও রহমতের দরোজা উন্মোচনকারী, সৃষ্টির সকল কার্যাবলী সচলকারী, আধ্যাত্মিকতার রহস্য উন্মোচনকারী ইত্যাদি। আল ফাত্তাহ্ অর্থ সাহায্যকারীও হয়। যেমন কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে "তোমরা যদি সাহায্য প্রার্থনা করে থাকো তবে জেনো তোমাদের কাছে সাহায্য এসে গেছে।" রসুল পাক স. এর

নামসমূহের মধ্যে অন্যতম নাম হচ্ছে ‘ফাতেহ্’ ও ‘ খাতেম’। যেমন শবে মেরাজ সম্পর্কিত হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে– আল্লাহ্তায়ালা বলেন, “হে রসুল! আপনাকে আমি ফাতেহ্ ও খাতেম বানিয়েছি।” হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবুল আলীয়া এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে। রসুল পাক স. আল্লাহ্প্রদত্ত অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আমার আলোচনা সমুন্নত করেছেন এবং আমাকে করেছেন ফাতেহ ও খাতেম। তাই তিনি স. তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহ্র রহমতের দরোজা উন্মোচনকারী। ইমান ও মারেফাত লাভের জন্য তিনি উম্মতের অন্তর উন্মোচনকারী ও তাদেরকে দিব্যদৃষ্টি দানকারী।

আশ শাকুর আল্লাহ্তায়ালার আরেকটি নাম। এর অর্থ অল্প আমলে অধিক বিনিময় দানকারী, পূর্ণ প্রতিদানকারী। কেউ কেউ বলেছেন– যারা অনুগত তাদের প্রশংসাকারী। রসুল পাক স.ও নিজেকে আশশাকুর বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন, “আফালা আকুনু আবদান শাকূর (আমি কি শুকরিয়া আদায়কারী বান্দা হবো না?)। উদ্ধৃত হাদিসের তাৎপর্য এই যে, রসুল পাক স. আল্লাহ্পাকের নেয়ামতের স্বীকৃতি দানকারী এবং তার যথার্থ মূল্যায়নকারী। তার উপর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

আল্লাহ্তায়ালার নামসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে– আল আলীম, আল্লাম, আলীমূল গয়িবী ওয়াশ শাহাদাৎ। আল্লাহ্ তাঁর হাবীব স. এর শানে এলেম ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। জ্ঞান দান করে জ্ঞানী হবার মর্যাদা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন– হে নবী ! যে বিষয়ে আপনার জানা ছিলো না আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সেই জ্ঞান দান করেছেন। আর এটা আপনাকে প্রদত্ত আল্লাহ্তায়ালার মহান মর্যাদা। আরও বলেছেন– আপনার যা জানা ছিলো না সে সকল বিষয়ে আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

আল্লাহ্তায়ালার নামসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে – ‘আল আউয়াল,’ ‘আল আখের।’ আউয়াল শব্দের অর্থ প্রথম। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিজগৎ অপেক্ষা অগ্রগামী এবং সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি থাকবেন। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্তায়ালার জন্য কোনো আউয়ালও নেই আখের (শেষ)ও নেই। তবে রসুল পাক স.কে ওই দুই নামে ভূষিত করা যেতে পারে। আর তা এই হিসেবে যে, সৃষ্টি হিসেবে তিনি সকল নবীগণের প্রথমে এবং আর্বিভাবের দিক থেকে সকলের শেষে। কোরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত রয়েছে এরকম– ‘হে রসুল ! আপনি স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা যখন আমি সমস্ত নবীগণ থেকে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং আপনার নিকট থেকেও। আর নূহ এবং ইব্রাহিমের নিকট থেকেও। এখানে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে হজরত নূহ এবং হজরত ইব্রাহিমের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমিই প্রথম এবং অগ্রগামী। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আউয়াল বা প্রথম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– তিনি বলেছেন, হাশরের

দিন আমিই প্রথম সমাধি বিদীর্ণ করে উত্থিত হবো। জান্নাতে প্রথমে প্রবেশ করবো আমি। আরও বলেছেন, আমিই প্রথম শাফায়াৎকারী এবং আমার শাফায়াৎ প্রথম কবুল করা হবে।

আল কাবি এবং যুল ক্বওয়াতিল মাতিন– এই দু'টি নামও আল্লাহ্‌র। নাম দু'টোর অর্থ সক্ষম বা ক্ষমতাধর। আল্লাহ্‌তায়ালা তার হাবীবকেও নাম দু'টি দ্বারা বিশেষিত করেছেন। এই মর্মে এরশাদ করেছেন– নবী করীম স. ক্ষমতাধর আরশের অধিকারীর নিকট অবস্থান গ্রহণকারী। তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এ আয়াতে আবদ বলে বুঝানো হয়েছে রসুল পাক স.কে। কেউ বলেছেন, হজরত জিব্‌রাইলকে।

আল্লাহ্‌তায়ালার একটি নাম সাদেক। হাদিস শরীফেও রসুলপাক স.কে সাদেক, মাসদুক ইত্যাদি গুণবাচক নামে ভূষিত করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌তায়ালার নামসমূহের মধ্যে আরও দু'টি নাম হচ্ছে 'ওলী' এবং 'মাওলা'। এরশাদ হয়েছে– তোমাদের ওলী হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। তিনি স. বলেছেন, আমি মুমিনদের ওলী। আরও বলেছেন, আমি সকল বিশ্বাসীদের মাওলা। ওলী অর্থ অভিভাবক। মাওলা অর্থ অনেকটা সে রকম। মাওলা অর্থ প্রিয়জন এবং সাহায্যকারীও হয়।

আফঅ– আল্লাহ্ পাকের আরেকটি নাম। যার অর্থ ক্ষমাকারী। অর্থাৎ পাপ বিচ্যুতি মার্জনাকারী। আল্লাহ্‌পাক তাঁর হাবীব স. কে ক্ষমা (আফঅ) করার হুকুম দিয়েছেন। কোরআন মজীদে এবং তওরাত শরীফে এরকম রয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে– আপনি ক্ষমাপরায়ণতাকে গ্রহণ করুন এবং নেক কাজের আদেশ দিন। আরও এরশাদ হয়েছে– আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমার মনোভাব গ্রহণ করুন। তওরাত ও ইঞ্জিল শরীফে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে– তিনি কর্কশভাষী এবং রুক্ষ স্বভাবের নন। বরং তিনি মানুষের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার আরেকটি নাম 'আল হাদী'। এর অর্থ যাঞ্চাকারীকে সামর্থ্য দানকারী– এ সামর্থ্যের মাধ্যমে বান্দাকে পথ-প্রদর্শনকারী। এই মর্মে এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ্‌তায়ালা শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের সন্ধান দান করেন। সরল পথের সন্ধান দান করা অর্থ হেদায়েত দান করা। আল্লাহ্‌পাক তাঁর হাবীব সম্পর্কে এরশাদ করেছেন– আপনি মানুষকে সরল পথের সন্ধান দিচ্ছেন। তিনি আরও এরশাদ করেছেন– 'তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আহ্বানকারী (পথের সন্ধান দানকারী)। হাদী শব্দের প্রথমে বর্ণিত অর্থটি আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য বিশিষ্ট আর পরে বর্ণিত অর্থটি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

আল মুমিন ও আল মুহাইমিন– এ নাম দু'টিও আল্লাহ্‌র। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দ দু'টি সম অর্থবোধক। আল্লাহ্‌তায়ালা মুমিন। অর্থাৎ তিনি বান্দাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন, সেই অঙ্গীকার পূরণে এবং তাঁর বক্তব্য প্রত্যয়নে সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন। তাছাড়া তিনি যে সকল রসুল প্রেরণ করেছেন তাঁদেরও সত্যায়নকারী। কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণিত শব্দ দু'টির অর্থ হচ্ছে– তিনি তাঁর সত্তার এককত্ব ও উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত। কেউ আবার বলেছেন, মুমিন শব্দের অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস্ত আর মুহাইমিন শব্দের অর্থ বিশ্বাসভাজন সাক্ষ্যদাতা, বিশ্বস্ত রক্ষক। এরকম অর্থও হতে পারে যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভয়ভীতি থেকে রক্ষাকারী। তাঁর হাবীব পাক স. এর নামও আমিন, মুহাইমিন ও মুমিন। কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে– 'মুতাঈন ছাম্মা আমীন।' তাছাড়া তিনি নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে আল-আমিন নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর চাচা হজরত আব্বাস স্বরচিত কবিতায় তাঁকে মুহাইমিন বলে চিহ্নিত করেছেন। নবী পাক স. স্বয়ং এরশাদ করেছেন– 'আনা আমানাতানলি আসসাহাবী (আমি আমার সহচরদের নিরাপদ আশ্রয়)। একথাটি মুহাইমিন শব্দেরই প্রতিধ্বনি। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, "ইন্না আনযালনা ইলাইকাল কিতাবা বিল হাক্কি মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল কিতাবি ওয়া মুহাইমিনান আলাইহি।" প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদের মতে এখানে মুহাইমিন বলতে রসুলপাক স.কে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্‌তায়ালার আরেকটি নাম 'আল মুকাদ্দাস'– এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত ক্ষতি, ত্রুটি এবং নতুনত্ব থেকে তিনি পবিত্র। আম্বিয়া কেরামের কিতাবসমূহে রসুল পাক স. এর নাম হিসাবেও উক্ত নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ নামটি রসুল পাক স. এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে– সকল প্রকার ক্ষতি ও ত্রুটি থেকে তিনি পবিত্র। আর তিনি তো সকল অসুন্দর অবস্থা থেকে পবিত্রই ছিলেন। কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে– আল্লাহ্‌তায়ালা রসুল পাক স. এর পূর্বাপর সকল বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়ার জন্য তাঁকে ফাতহে মুবিন দান করেছেন। রসুলপাক স. কে মুকাদ্দাস বলা হলে তার অর্থ এরকমও হতে পারে যে, তিনি সকল নিন্দনীয় অভ্যাস এবং অসুন্দর স্বভাব থেকে পবিত্র। তাঁর যথা অনুসরণের মাধ্যমে অন্য অনেকেও এই পবিত্রতা অর্জন করেছেন। একারণেই কোরআন মজীদে ইউজাক্কিহিম (পবিত্র করেন) শব্দটি তাঁর শানে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্‌তায়ালার আরেকটি নাম 'আল আযীয'। এর অর্থ পরাক্রমশালী বা প্রতাপশালী। পরাক্রমশালীতায় যাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না তিনিই আল আযীয। আরেকটি অর্থ অতুলনীয়। অন্য আরেকটি অর্থ যথাযোগ্য মর্যাদা দানকারী। কাযী আয়ায শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর পক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন ওই আয়াতটি যেখানে বলা হয়েছে "ওয়ালিল্লাহিল ইযযাতু

ওয়া লিরসুলিহি’ (আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর রসুল স. এর জন্যই ইজ্জত)। এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ্‌ আযীয ও মুয়াযযায এবং রসুল স. ও আযীয ও মুয়াযযায। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচবয়িতা বলেছেন– উক্ত আয়াতটির মাধ্যমে বিশ্বাসীদের জন্যও ইজ্জত (মর্যাদা) সাব্যস্ত হয়েছে। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে ওয়ালিল মু’মিনীন (বিশ্বাসীদের জন্যও)। সুতরাং দেখা যায় আযীয নামটি কেবল রসুল পাক স. এর জন্য বিশিষ্ট নয়, সাধারণ মুমিনরাও ওই নামে অভিহিত হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আমি (গ্রন্থকার) আল্লাহ্‌পাকের সহায়তাকে আশ্রয় করে বলতে চাই, মুমিনদের জন্য আযীয শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে বটে কিন্তু মনে রাখতে হবে রসুল পাক স. এর আর্বিভাবের কারণে এরকমটি হয়েছে। তাঁর মাধ্যম ব্যতিরেকে মুমিনদের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্বই নেই। লাক্বদ জা আ’কুম রসুলুম মিন আনফুসিকুম আযীয– একটি উচ্চারণের (ক্বেরাতের) রীতি অনুযায়ী এ আয়াতটির এখানেই যতিপাত হওয়া সম্ভব। যদি তাই হয় তবে রসুল পাক স.ও আযীয নামের অধিকারী হতে পারেন।

‘বাশারাত ও নাযারাত’– এই গুণবাচক শব্দ দু’টি আল্লাহ্‌পাক তাঁর মর্যাদা প্রকাশার্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন এরশাদ করেছেন– আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে বাশারত (সুসংবাদ) দান করেছেন। আরও এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে কলেমাসমূহের মাধ্যমে বাশারাত প্রদান করেছেন। এদিক থেকে তাঁর হাবীবকেও তিনি মুবাশশির, বাশির ও নাযির আখ্যা দিয়েছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন তোয়াহা, ইয়াসিন– এগুলোও আল্লাহ্‌পাকের নামের অন্তর্ভূত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওই নামগুলো রসুলুল্লাহ স. এর। শেষোক্ত মতটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

সতর্কীকরণঃ আল্লাহ্‌তায়ালা এবং রসুল পাক স. এর নামের মধ্যে শাব্দিক সাদৃশ্য রয়েছে। বিষয়টি সূক্ষ্ম মর্মবোধক। কাযী আয়ায বিষয়টি সম্পর্কে এমর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, জানা প্রয়োজন– নামের সাদৃশ্যের মধ্যে ফযীলত ও বরকতের দিকে লক্ষ্য করে আমি এ অধ্যায়টি রচনা করেছি। দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিরা যেনো এ বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত না হয় তাই বলছি, প্রকৃত বিশ্বাস এই যে, মহত্ব ও উচ্চতার ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টি কখনোই আল্লাহ্‌তায়ালার সমতুল নন। তাঁর নাম ও গুণাবলী অতুলনীয়। তাঁর মহিমা ও মাহাত্ম্য অভাবনীয়। প্রকাশ্যতঃ নামের মিল থাকলেও সৃষ্টি ও স্রষ্টা কখনো এক নয়। কখনোই নয়। তিনি চিরন্তন, চিরঞ্জীব ও আদি অন্তহীন। কিন্তু সৃষ্টির গুণাবলী হাদেস বা নতুনত্বের কলংকে কলংকিত। সৃষ্টির গুণাবলী আনুষঙ্গিক বা প্রতিবিম্বজাত। আর আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিবিম্বের মূল এবং নতুনত্বের কালিমা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ্‌তায়ালার ওই অমোঘ বাণী সকল জটিলতা ও সন্দেহকে বিশ্বাসের যথাযোগ্য ভিত্তিতে অনড় করে দিয়েছে যেখানে বলা হয়েছে– লাইসা কা মিছলিহি শাইয়ুন” (কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ

নয়)। ওই সকল আল্লাহ্ পরিচিতির অধিকারী বিদ্বানগণকে আল্লাহ্পাক উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন, যারা বলেছেন, সত্তা, নাম, গুণাবলী, কার্যাবলী কোনো বিষয়েই কেউ তাঁর অংশী নন, সমতুল্যও নন– প্রকাশ্যতঃ তাঁর নাম গুণাবলীর সঙ্গে যতোই আনুরূপ্য পরিদৃষ্ট হোক না কেনো। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অক্ষয় বিশ্বাস (আকিদা)।

ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরি বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বলেছেন, এ আকিদাটি সকল তৌহিদি আলোচনার মূল। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র সত্তা নতুনত্বের কালিমালিপ্ত সৃষ্টির সাদৃশ্য হতে পারে কিভাবে? তিনি যে অমুখাপেক্ষী। জাত, সিফাত, আফয়াল– সকল বিষয়েই তিনি অপরাশ্রয় থেকে পবিত্র। সকল বিষয়েই তিনি পূর্ণ, পরিণত ও ক্রটি বিচ্যুতিবিহীন। কিন্তু সৃষ্টি তাঁর অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব, নাম গুণাবলী সকল ক্ষেত্রেই তাঁর (আল্লাহ্র) মুখাপেক্ষী। তাঁকে স্পর্শ করা যায় না। সৃষ্টি তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। তিনিও কোনো কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট নন। কিন্তু সৃষ্টিকে স্পর্শ করা যায় এবং তার মধ্যে প্রবিষ্টও হওয়া যায়। সম্মানিত মাশায়েখবৃন্দ বলেছেন– হক তায়ালা সম্পর্কে তোমরা যা ধারণা করো তাও নতুনত্বের কলংকে কলংকিত। কারণ, তিনি ধারণাতীত। তিনি কখনোই বুদ্ধিবদ্ধ নন। বুদ্ধিও নতুন সৃষ্টি। আর তিনি অনাদি। সুতরাং বুদ্ধি তাঁকে বেষ্টন করবে কীভাবে? ইমাম আবুল মাআলী জুয়েনি বলেছেন, সেই ধারণাতীত ধারণাকে আশ্রয় করে বিশ্বাসীরা যে শান্তি লাভ করে সেটাই তাদের জন্য পরম পাওয়া। আরও উচ্চ স্তরের বিশ্বাসীরা ওই ধারণাকেও অপসারণ করতে পছন্দ করেন। তাঁর সম্পর্কে আরও অধিক উচ্চতর বিশ্বাসের দিকে তাঁরা তাঁদের ধারণাকে পরিচালিত করতে চান। প্রথমোক্ত ধারণাকারীরা মুশাব্বেহ। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্বাসীরা ‘মুয়াত্তেল’। আর যে ব্যক্তি সকল ধারণা থেকে মুক্ত এবং তাঁর হকিকত (প্রকৃত তত্ত্ব) বুঝতে অক্ষম বলে স্বীকৃতি দান করেন সে-ই মুয়াহহেদ বা একত্ত্ববাদী।

হজরত জুন্নুন মিসরি কী সুন্দর বলেছেন, তৌহিদের হকিকত এই– বান্দা তাঁর অপার ক্ষমতাকে এরকম জানবে যে, তিনি কোনোপ্রকার অবলম্বন ব্যতিরেকেই সব দিক থেকে সৃষ্টি অপেক্ষা সমুন্নত। তিনি কোনো যন্ত্র বা উপকরণ ব্যতিরেকেই সমগ্র সৃষ্টিকে পরিমাপ করতে সক্ষম। আল্লাহ্পাকের সৃজনশীলতাই সৃষ্টির অস্তিত্বকে প্রকাশযোগ্য হওয়ার যোগ্য করে দিয়েছেন। কিন্তু তার সৃজনশীলতা কারণ বা মাধ্যমরহিত। তোমাদের সকল ধারণাই তাঁকে ধারণ করার অনুপযোগী। কারণ তোমাদের ধারণা তোমাদের মতোই আকার ও প্রকার দুষ্ট। আর তিনি আকারাতীত। তাই এরশাদ হয়েছে– “লাইসাকা মিছলিহি শাইয়ুন।” আরও এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ্তায়ালা যা করেন সে ব্যাপারে প্রশ্ন করার কেউ নেই। তিনি আরও বলেছেন, কোনো বস্তু সম্পর্কে আমার কথা এই, আমি যখন কোনোকিছু সৃষ্টির অভিপ্রায় পোষণ করি, তখন কেবল বলি, হও। আর অমনি তা হয়ে যায়।

আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এবং আমাদের সকলকে এককত্ব ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। পথভ্রষ্টতা, অধর্ম, অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্বাস থেকে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখুন। চিরনিরাপত্তা দান করুন। আমীন।

চারশত নামের বিবরণ

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা কোরআন, হাদিস ও অন্যান্য আসমানী কিতাব থেকে রসুল পাক স. এর চারশ'র বেশী নাম সংগ্রহ করেছেন। নামগুলো তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে। বরকত লাভের বাসনায় আমরা এখন ওই নামগুলোর উল্লেখ করবো। প্রলম্বন ও পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও বিবরণটি অবশ্যই আস্বাদনযোগ্য (প্রিয় জনের সকল প্রসঙ্গই সুন্দর)।

আলিফঃ আল আমিরুবিল্লাহ্, আল আবতাহি, আতকান্নাছ, আল আজ ওয়াদ, আজওয়াদুন্নাস, আল আহাদ, আল আহসান, আহসানুন্নাস, আহমদ, আহীদ, আল আখেযুবিল হাজারাত, আখেযুস সাদাকাত, আল আখের, আল আখশালিল্লাহ, ইবনু খায়ের, আরজাহুন্নাসে আকলান, আরহামুন্নাসে বিল আয়াল, আল আযহার, আল আসলাম, আসলামুন্নাস, আশজাউন্নাস, আল আসদাকু ফিল্লাহ, আত ইয়াবুন্নাসে রিহান, আল আগাররুবিল্লাহ, আকছারুন্নাসে তাবআন, আল আকরম, আকরামুন্নাস, আকরামুবুলদে আদাম, আলিফ লাম মীম ছোয়াদ, ইমামুল খায়ের, ইমামুন্নাস, ইমামুল মুত্তাক্বিন, ইমামুন্নাবিয়্যিন, আল ইমাম, আল আমের, আল আমীন, আল আমেন, আমানাতু আসহাবিহী, আল উম্মী, আনউমুল্লাহ, আউয়ালু শাফেয়ীন, আওয়ালু মুসলিমীন, আওয়ালুল মুশাফ্ফা, আওলা লিলমুসলিমীন, আওয়ালু মা ইযানশাক্কুল আরদ।

'বা' দ্বারা নামসমূহঃ আল বারু, আল বাসেতু, আল বাতেনু, আল বিররু, আল বুরহানু, বাশারুন, বুশরা, আল বাসীরু, আল বালিগু, আলেগুল বয়ান, আল বাইয়্যিনাহ।

'তা' দ্বারা নামসমূহঃ আত্তালী, আত্তাযকেরাহ্, আত্তাকিয়্যু, আত্তানযীলু, আত্তাহানী।

'ছা' দ্বারা নামসমূহঃ এছনাইন।

'জীম' দ্বারা নামসমূহঃ আল জব্বারু, আলজাদ্দু, আলজুদু, আল জামেউ, জাওয়ামেউল কালেম।

'হা' দ্বারা নামসমূহঃ হাতেম, হেযবুল্লাহ, আল হাশের, আল হাফেজ, আল হাকেমু বিমা আরাহুল্লাহ, আল হামেদ, হামেলুল লওয়ায়িল হামাদ, আল হামেদু লিউম্মাতিহী আনিন্নার, আল হাবীব, হেযবুল্লাহিল হাক্কী, আল হাফিযু, আল হাক্কু, আল হাকীম, আল হালীমু, হাম্মাদু, হামতায়া, হামীয়াতা, হা মীম আইন সীন ক্বফ, আল হামীদ, আল হানিফ।

'খ' দ্বারা নামসমূহঃ খাতেমুন্নাবিয়্যিন, খাতেমুল মুরসালিন, আল খাতেমু, খাযেনু কামালিল্লাহ, আল খাশেউ, আল খাযেউ, আল খালেসু, খতিবুল আম্বিয়া ওয়াল উমাম, খতীবুল ওয়াফেদীন আলাল্লাহ, আল খলীলু, খলিলুর রহমান, আল খলিফা, খাইরুল আম্বিয়া, খাইরুল বারিয়্যাহ, খইরু খালকিল্লাহ, খইরুল মালামীন, খাইরুন্নাস, খইরু হাবিহিল উম্মাহ।

'দাল' দ্বারা নামসমূহঃ দারুল হিকমাহ, আদ্দাই ইলাল্লাহ, দাওয়াতু ইব্রাহিম, দাওয়াতুন্নাবিয়্যিন, দলীলু খায়রাত।

'যাল' দ্বারা নামসমূহঃ যখীরাতুল্লাহ, আযযাকেরু, আযযিকরু, যিকরুল্লাহ, যুল হাউযিল মাউরুদ, যুল খুলুকিল আজীম, যুসসিরাতিল মুস্তাকীম, যুল কুওয়াত, যুল ফাদলিন, যুল মুজিযাত, যুল মাকামিল মাহমুদ, যুল ওসিলাহ।

'র' দ্বারা নামসমূহঃ আররদেউ, আররদী, আররফেউ, রকেবুল বুরাক, আররহেবু রকেবুল বাঈর, রকেবুল জামাল, রকেবুন্নাকাহত, রকেবুন্নাজিব, আররহমাহ, রমাতুল উম্মাহ, রহমাতুল্লিল আলামীন, রহমাতু মাহদাত, আররহীম, আররসুলু, আর রহাতু, রসুলুর রহমাতে, রসুলুল্লাহ, রসুলুল মালাহেম, আররশীদু, আররফীউ, রফেউল মারাতেব, রফী উদ্দারাজাত, আররকীবু, রুহুল হক, রহুলকুদুস, আর রউফু, রুকনুল মুতা-ওয়াযেয়ীন।

'যা' দ্বারা নামসমূহঃ আযযাহেদু যাঈমুল আম্বিয়া, আযাকিয়্যু, যাইনুল ইবাদ, আযযামযামী, যাইনুম্মি ওয়াফিয়্যিল কিয়ামাহ।

'সিন' দ্বারা নামসমূহঃ আসসাবেকু, আস সাবেকুবিল খাইরাত, সাবেকুল আরাব, আস সাজেদু, সাবীলুল্লাহ, আস সিরাজুম মুনীর, আস সাঈদু, সা'দুল্লাহ, সা'দুল খালায়েক, আস সামীউ, আস সালামু, আস সায়্যিদ, সাইয়েদু বুলদে আদাম, সাইয়েদুল মুরসালীন, সাইয়্যেদুন্নাস, সাইয়্যেদুল কাওনাইন, সাইয়্যেদুছ ছাকালাইন, সাইফুল্লাহিল মাসলুল, সাইয়্যেদুল ফারীকাইন।

'শীন' দ্বারা নামসমূহঃ আশশারেউ, আশশাফেউ, আশশাফীউ, আশশাকেরু, আশ শাহেদু, আশ শাক্কারু, আশ শাকুরু, আশ শামছু, আশ শাহীদু।

'সোয়াদ' দ্বারা নামসমূহঃ আস্সাবেরু, আসসাহেবু, সাহেবুল আয়াতে, সাহেবুল মুজিযাত, সাহেবুল বুরহান, সাহেবুল বয়ান, সাহেবুত তাজ, সাহেবুল জেহাদ, সাহেবুল হুজ্জাত, সাহেবুল হাতীম, সাহেবুল হাউযিল মাওরুদ, সাহেবুল খাতাম, সাহেবুল খায়র, সাহেবুদ্দারাজাতির রাফীআহ, সাহেবুর রেদা, সাহেবুল আযওয়াজিত্তাহিরাত, সাহেবুসুজুদে লিরব্বিল মাহমুদ, সাহেবুল বারায়া, সাহেবুস সুলতান, সাহেবুস সাইফ, সাহেবুশশরা, সাহেবুশ শাফায়াতিল কুবরা, সাহেবুল আতায়া, সাহেবুল আলামাতিল বাহেরাত, সাহেবুল উলুব্বিয়াদ্দারাজাত, সাহেবুল ফাদীলাহ, সাহেবুল ফারহে, সাহেবুন্নাকীব, সাহেবুল কাযীবিল আসগার, সাহেবু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সাহেবুল কাদাম, সাহেবুল কাউছার, সাহেবুল লেওয়া, সাহেবুল

মাহশার, সাহেবুল মাকামিল মাহমুদ, সাহেবুল মিম্বর, সাহেবুল মেহরাব, সাহেবুননালাইন, সাহেবুল হারাওয়াহ, সাহেবুল ওসিলাহ, সাহেবুল মদীনা, সাহেবুল মাযহারিল মাশহুর, সাহেবুল মেরাজ, সাহেবুল মাগফার, সাহেবুন্নাঈম, আসসাদেউবিমা আমার, আসসাদেকু, আসসাবুরু, আসসিদকু, সিরাতুল্লাহ, সিরাতুল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, আসসিরাতুল মুস্তাকিম, আসসফুহু আনিযযাল্লাতিস সাফওয়াহ আসসাফীয়্যু, আসসায়েহু।

'দোয়াদ' দ্বারা নামসমূহঃ আযযারেবু বিলজামেল মালছুম, আযযেহাকু, আযযহুকু।

'তোয়া' দ্বারা নামসমূহঃ আত্তালেবু, আত্তাহেরু, আত্তাইয়্যেবু, তোয়া সিন, তোয়া সিন মীম, তোয়াহা।

'যোয়া' দ্বারা নামসমূহঃ আযযফুরু, আযযাহেরু।

'আইন' দ্বারা নামসমূহঃ আল আবেদু, আল আয়েদু, আল আদেলু, আল আযীমু, আল আফী, আল আকেবু, আল আলেমু, এলমুল ঈমান, এলমুল ইয়াকীন, আল আলেমুবিল হাক, আল আমেলু, আব্দুল্লাহ, আল আবদুল কারীমু, আব্দুল জাব্বার, আব্দুল হামীদ, আব্দুল মাজীদ, আব্দুল ওহ্‌হাব, আব্দুল গাফফার, আব্দুল গিয়াছ, আব্দুল খালেক, আব্দুর রহীম, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুস সালাম, আব্দুল কাদের, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল কাহহার, আব্দুল মুহাইমেন, আল আদলু, আল আরাবী, আল ওরওয়াতুল উছকা, আল আযীয, আল আতুফ, আল আফবু, আল আলীমু, আল আলী, আইনুল ফারাগ।

'গাইন' দ্বারা নামসমূহঃ আল গালেবু, আল গাফুরু, আল গানিয়্যু, আল গানিয়্যু বিল্লাহ, আল গাইছু, আল গাউছ, আল গিয়াছু।

'ফা' দ্বারা নামসমূহঃ আল ফাতেহু, আল ফানেহু, আল ফারকলিত, আল ফারুকু, আল ফাত্তাহু, আল ফাখরু, আল ফুরতু, আল ফাসীহু, ফাদলুল্লাহি, ফাতেহুন্নুর।

'ক্বাফ' দ্বারা নামসমূহঃ আল কাসেমু, আল কাযী, আল কানেতু, কায়েদুল খায়র, কাবেদুল গুররিল মুহাজ্জালীন, আল কায়ীলু, আল কায়ীমু, আল কিতালু, আল কাতুলু, কাছমুন, আল কাছুমু, কাদামুসসিদক, আল কুরাশী, আল কারীবু, আল কামারু, আল কাসীম।

'কাফ' দ্বারা নামসমূহঃ কাফ্‌ফাতুন্নাস, আল কাফীলু, আল কামেলু ফী জামীয়ে উমরিহী, আল কারীমু, কাফ হা ইয়া আইন ছোয়দ।

'লাম' দ্বারা নামসমূহঃ আললিছানু।

'মীম' দ্বারা নামসমূহঃ আল মাজেদু, মাযুনুন, আল মাহী, আল মাহুলু, আল মাসানিহু, আল মুবারাকু, আল মুবতাহিলু, আল মুবিররু, আল মুবাশশিরু, মুবাশশিরুল ইয়ায়েসীন, আল মাবউছুবিল হাক, আল মুবাল্লিগু, আল মুবীনু, আল

মাতীনু, আল মাইলুল মারীযে, আল মাখসুসু, আল মুতারাহহিমু , আল মুতাদাররিউ, আল মুত্তাকী, আল মাতলু আলাইহি, আল মুজতাহিদু, আল মুতাওয়াককিলু, আল মুতাছাব্বিতু, মুস্তাজাবুন, মুজীবুন, আল মুজতাবা, আল মুজীরু, আল মুহরিসু, আল মুহাররিমু, আল মাহফুজু, আল মুহাল্লিলু, মুহাম্মাদুন, আল মাহমুদ, আর মুখাইয়্যারু, আল মুখতারু, আল মাখসুসু বিশ শারাফ, আল মাখসুসু বিল ইযযে, আল মাখসুসু বিল মাজদে, আল মুখলিসু, আল মুদ্দাছছিরু, আল মাদানী, মদীনাতুল এলমে, আল মুযাককিরু, আল মাযুকুরু, আল মুর্তাজা, আল মুযযাম্মিলু, আল মুর্তাহী, আল মারসুমু, আল মুতারাফ ফিউদ্দারাজাত, আল মুররু, আল মুরওয়াতু, আল মুযাককী, আল মাসিহু, আল মসউদু, আল মুসতাকবিরু, আল মুসতাগনি, আল মুস্তাকীম, আল-মুসলিম, আল মুসাল্লামু, আল মুতাবাদিরু, আল মুশাফফা, আল মাশফুউ, আল মুসফিহু, আল মাশহুরু, আল মাসীরু, আল মেসবাহু, আল মুসারিউ, আল মুসাফিহু, মুসাহহিহুল হাসানাত, আল মাসদুকু, আল মুস্তাফা, আল মুসলিহু, আল মাসলা আলাইহিল মাসা, আল মুতাহহিরু, আল মুত্তালিউ, আল মুতীউ, আল মুযাফফারু, আল মুআযযাযু, আল মাসুমু, আল মু’তী, আল মুকসিতু, আল মাকসুসু আলাইহি, আলমাকয়ী, মুফাযযিলুল আশীরাত, মুকীমুস সুন্নাহ, আল মুকাররামু, আল মুকতাফী, আল মাকফী, আল মাকীনু, আল মাক্কী, আল মালাহেমী, মুলকাল কোরআন, আল মানুহু, আল মুনাদী, আল মানসারু, আল মুঞ্জী, আল মুনযিরু, আল মুনযযালু আলাইহি, আল মানহা, আল মুত্তাসিফু, আল মুতাসাব্বিরু, আল মুনীবু, আল মাম্বারু, আল মু’মিনু, আল মাওলা, আলমুহা ইলাইহি, মাওদুদ, আল মুসেলু, আল মুওয়াককিরু, আল মুওয়াল্লী, আল মুওয়ায়্যেদু, আল মুমিন, আল মুওয়াসসিরু, আল মুহাজিরু, আল মুহতাদী, আল মাহদী, আল মুহাইমিন, আল মুবাশশিরু।

‘নুন’ দ্বারা নামসমূহঃ আন্নাবেযু, আন্নাজেযু আন্নাসু, আন্নাসেখু, আন্নাশেরু, আন্নাসেহু, আন্নাতেকু, আন্নাহী, নবীউল আহমার, নবীউল আসওয়াদ, নবীউওবা, নবীউল হারামাইন, নবীউর রাহাত, নবীউর রহমত, আন্নাবিউসসালেহু, নবীউল্লাহ, নবীউল মারহামা, নবীউল মুলতাহামা, নবীউল মালাহেম, আন্নাবীয়্যু, আন্নজমু, আন্নাজমুছ ছাকিবু, নাজিউল্লাহ, আন্নাজীরু, আন্নাসীবু, নুসহুন, নাসেহুন, আন্নেমাহ, নেমাতুল্লাহ, আন্নাকীবু, আন্নাকীয়্যু, আন্ নূর, আন্ নূরুল্লাযী লাইয়াতফাউ।

‘হা’ দ্বারা নামসমূহঃ আল হাদী, হুদা, হাদিয়াতুল্লাহ, আল হাশেমী।

‘ওয়াউ’ দ্বারা নামসমূহঃ আল ওয়াজীহু, আল ওয়াসেতু, আল ওয়াসেলু, আল ওয়াযেহু, আল ওয়ায়েদু, আল ওয়ায়েযু, আল ওয়ারা, আল ওসিলাহ, আল ওয়াফী, আল ওয়াফিয়্যু, আল ওলীয়্যু, ওলীয়্যুল ফজল।

‘ইয়া’ দ্বারা নামসমূহ ঃ ইয়াছবেরী, ইয়াসিন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আতবাইহী আজমাঈন।

হজরত কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত হয়েছে— বেহেশতবাসীদের নিকট রসুল পাক স. এর নাম আব্দুল করিম। দোযখবাসীদের নিকট আব্দুল জব্বার। আরশের অধিবাসীদের নিকট আব্দুল হামীদ। ফেরেশতাদের নিকট আব্দুল মজীদ, শয়তানের নিকট আব্দুল কাহহার, নবীগণের নিকট আব্দুল ওয়াহ্হাব, আল্লাহ্তায়ালার নিকট আব্দুর রহীম, পর্বতসমূহের নিকট আব্দুল খালেক, জলভাগের নিকট আব্দুল মুহাইমেন, স্থলভাগের নিকট আব্দুল কাদের, মৎস্যকুলের নিকট আব্দুল কুদ্দুস, কীট পতঙ্গের নিকট আব্দুল গিয়াছ, প্রাণীকূলের নিকট আবদুর রাজ্জাক, হিংস্র পশুকূলের নিকট আব্দুস সালাম, চতুষ্পদ জন্তুদের নিকট আব্দুল মুমিন এবং বিহঙ্গকুলের নিকট আব্দুল গাফ্ফার।

তওরাত শরীফে তাঁর নাম মুযমুয, ইঞ্জীল শরীফে তাবতাব, সহীফাসমূহে আকেব, যবুর শরীফে ফারুক, আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাঁর নাম ত্বোয়াহা, ইয়াসিন, আর মুসলমানদের নিকট তাঁর নাম মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কা'ব আহবার আরও বলেছেন, রসুল পাক স. এর কুনিয়াত হচ্ছে আবুল কাসেম। হাশরের সময় তিনি জান্নাতীদের মধ্যে জান্নাত বণ্টন করবেন।

সুকুল উরুস ওয়া উনসুন্নুফুস গ্রন্থে হোসাইন বিন মোহাম্মদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. সৃষ্টিকুলের মধ্য সর্বাধিক সুন্দর। মনুষ্যকুলে সবচেয়ে সম্মানিত, আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠতম নেতা এবং রসুল শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনোই অবকাশ নেই।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকে দু'টি অংশে বিভক্ত করে আমাকে রেখেছেন উৎকৃষ্টতর অংশে। আল্লাহ্তায়ালা ওই দু'টি অংশকে 'আসহাবুল ইয়ামীন' ও 'আসহাবুশ শিমাল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমাকে করেছেন আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। আসহাবুল ইয়ামীনদেরকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে— আসহাবুল মায়মানা, আসুহাবুল মাসআমা এবং সাবেকুন। আমি সাবেকুনদের দলে। এরপর আল্লাহ্তায়ালা বর্ণিত ভাগগুলোকে বিভিন্ন গোত্রে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। আর আমাকে রেখেছেন সর্বোত্তম গোত্রে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র এরশাদ রয়েছে, আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার। নবী করীম স. বলেছেন, আমি সর্বাধিক পরহেজগার। আল্লাহ্তায়ালার নিকট আমি 'আকরম' (সর্বোচ্চ সম্মানিত)। অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা গোত্রগুলোকে বিভক্ত করেছেন বিভিন্ন উপগোত্রে (খান্দানে)। আর আমি সর্বোত্তম খান্দানভূত। অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— নবী করীম স. বলেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহিমের বংশধরদের মধ্যে হজরত ইসমাঈলকে মনোনীত করেছেন। ইসমাঈলের বংশ থেকে বনু কেনানাকে। বনু কেনানার মধ্য

থেকে কুরায়েশকে, কুরায়েশদের মধ্য থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে– নবীপাক স. বলেছেন, আমি আওলাদে আদমের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। এ কথা গৌরব প্রকাশার্থে নয়। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে– রসুল পাক স. বলেন, আমি পূর্বাপর সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুকাররম– একথা দর্প প্রকাশার্থে নয়। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে– রসুল পাক স. বলেছেন, একবার হজরত জিব্‌রাইল উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত অনুসন্ধান করেও মোহাম্মদ মুস্তফা স. এর চাইতে অধিক মর্যাদমণ্ডিত কাউকে পাইনি। এমন কোনো পিতার সন্তানকে পাইনি যিনি হাশেমী বংশের এই নবীর চাইতে অধিক পূর্ণ ও পরিণত। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, হজরত আদমের সৃষ্টির সময় এবং তাঁর পৃথিবীতে অবতরণের সময়ও আমি তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছিলাম। এরপর আমি ছিলাম অলৌকিক কিশতির অধিকারী হজরত নুহ এর পৃষ্ঠদেশে, এরপর আমি অধিষ্ঠিত হই হজরত ইব্রাহিমের পৃষ্ঠে। এভাবে আমি সবসময় সম্মানিত পৃষ্ঠদেশ এবং পবিত্র গর্ভে স্থানান্তরিত হতে হতে এসেছি। অবশেষে ভূমিষ্ঠ হয়েছি এই পৃথিবীতে। আমার পিতৃপুরুষেরা ছিলেন ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। রসুল পাক স. এর পিতৃব্য তাঁর রচিত কাসিদায় এই দিকটি কী সুন্দারভাবেই না প্রষ্ফুটিত করেছেন। বর্ণিত হয়েছে– একদিন হজরত আব্বাস অবিশ্বাসীদের প্রতি রোষান্বিত হয়ে রসুল পাক স. এর নিকটে এলেন। অবিশ্বাসীদের নিন্দাবাদ শুনে রুষ্ট হয়েছিলেন তিনি। রসুল পাক স. বললেন, চাচাজান আপনি রুষ্ট হয়েছেন কেনো? হজরত আব্বাস তাঁর রাগের কারণ বর্ণনা করলেন। রসুল পাক স. তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। উপবেশন করলেন মিম্বরে। উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কে? সকলেই সমস্বরে জাবাব দিলেন, আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। তিনি বললেন, আমি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে রেখেছেন সৃষ্টির উত্তম অংশে। আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে আরব ও আজম এই দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আমাকে রেখেছেন আরবদের মধ্যে। এই দু'টি শ্রেণীকে আল্লাহ্‌পাক অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দিয়েছেন। আমাকে করেছেন শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত। সম্প্রদায়গুলো আবার বিভক্ত করা হয়েছে অনেক খান্দানে এবং গৃহে। আমার জন্য নির্বাচিত হয়েছে সর্বোচ্চ খান্দান ও সবোত্তম গৃহ। সুতরাং আমি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। আমার বংশ পরম্পরাও সর্বোত্তম।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে– আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। পছন্দ করলেন মোহাম্মদ মুস্তফা স. এর অন্তরকে এবং তাঁকেই শ্রেষ্ঠ রসুলের সম্মানদানে ধন্য করলেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে– আল্লাহ্‌তায়ালা রসুলপাক স. কে সকল

পৃথিবীবাসী এবং আকাশবাসীর উপর মর্যাদা দান করলেন। প্রশ্ন করা হলো, আকাশবাসীর উপর সম্মান দান করার বিষয়টি কী রকম? রসুল পাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আকাশবাসীদেরকে বলেছিলেন, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য আছে– এরকম কথা তোমরা যদি কেউ বলো, তবে আমি তাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করাবো। আর আমাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক বলেছেন, আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি– পূর্বাপর সকল বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছি। বর্ণিত হাদিসের আলোকে একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আকাশবাসীরাও আল্লাহ্র ভয়ে ভীতবিহবল। তাদেরকেও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের হুমকি দেয়া হয়েছে। অপরপক্ষে রসুল পাক স. ক্ষমাকৃত, নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। প্রশ্নকারীরা পুনরায় বললেন, নবীদের উপরে সম্মানদানের বিষয়টি আবার কী রকম? রসুল পাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল নবী রসুল সম্পর্কে বলেছেন, আমি প্রত্যেক রসুলকে তাদের আপনাপন সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরণ করেছি। আর আমার সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি আপনাকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য প্রেরণ করেছি।

নবী করীম স. এর পূর্ণত্ব ও অলৌকিকত্বের কিছু প্রকাশিত হয়েছে পৃথিবীতে। অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হবে কিয়ামতের দিন। তখন তিনি মাহবুবে এলাহি (আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ) এবং সরোয়ারে কায়েনাত হিসাবে পূর্ণ বিকশিত হবেন। হবেন আল্লাহ্তায়ালার অন্তহীন করুণাবর্ষণের প্রকাশস্থল। সেদিন তিনি হবেন মহাবিশ্বের প্রভুপ্রতিপালকের বিশেষ প্রতিনিধি। বিচার দিবসের মালিকের একান্তজন। সেদিন সে মর্যাদা কেবল তিনিই লাভ করবেন অন্য কেউই নয়। আল্লাহ্পাকের নির্দেশে সেই দিবস হবে তাঁরই দিবস। আল্লাহ্তায়ালার পক্ষে তাঁর হুকুমই সেদিন কার্যকর হবে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আপনার পারলৌকিক জীবন ইহলৌকিক জীবনাপেক্ষা শ্রেয়। আর অচিরেই আপনার প্রভু আপনাকে এতো বেশী দান করবেন যাতে আপনি প্রসন্ন না হয়ে পারবেন না।

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে রসুল পাক স. এর পার্থিব সম্মান ও অনন্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন শুরু হবে তাঁর আখেরাতের ফযীলত ও কামালাতের বিবরণ। ওয়াবিল্লাহিত্তাওফিক।

অষ্টম অধ্যায়

পরজগতের মর্যাদা

তিনি আল্লাহ্পাকের প্রথম সৃষ্টি, সৃষ্টির উৎস ও উদ্দেশ্য। রূহের জগতে সমস্ত রূহকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো 'আলাস্তু বি রব্বিকুম' (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) বালা (হ্যাঁ)– এ কথা বলে সেই প্রশ্নের জবাব তিনিই প্রথমে দিয়েছিলেন। এভাবে সৃষ্টির প্রথমেই রসুলপাক স. কে দেয়া হয়েছিলো অনন্যসাধারণ সম্মান। সবশেষে পরজগতেও তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্ব সর্বোচ্চ হবে। যখন মৃত্তিকা বিদীর্ণ হবে তখন তিনিই প্রথমে তাঁর জ্যোতির্ময় সমাধি থেকে উত্থিত হবেন। কিয়ামতের ভয়াবহ সময়ে তিনিই হবেন শাফায়াতকারী এবং তাঁর শাফায়াত গৃহীতও হবে। তিনিই সর্বপ্রথম প্রভুপ্রতিপালকের সন্দর্শন লাভ করবেন। তখনো সমস্ত সৃষ্টি থাকবে যবনিকাচ্ছাদিত। তাঁর উম্মতের প্রতি সর্বপ্রথমে বলবৎ হবে পুলসিরাত অতিক্রমণের নির্দেশ। তিনি তাঁর উম্মতগণকে সঙ্গে নিয়ে তখন পুলসিরাত অতিক্রম করবেন। বেহেশতে প্রবেশ করবেন প্রথমে তিনিই এবং তাঁর উম্মতেরাও প্রবেশ করবে অন্য নবীগণের উম্মতের আগে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকেই দান করবেন অসংখ্য সুন্দর উপহার সামগ্রী।

হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, যখন সকলকে কবর থেকে উঠানো হবে তখন আমিই উত্থিত হবো প্রথমে। সেদিন সম্মিলিত জনতার মুখপাত্র হবো আমি। সবাই যখন নিরাশ হয়ে যাবে তখন আমিই শোনাবো আশার বাণী। আল্লাহ্তায়ালার প্রসংশার পতাকাবাহী সেদিন আমাকেই করা হবে। আদম সন্তানদের মধ্যে তখন আমিই হবো সর্বাধিক সম্মানিত। একথাগুলো অহংকারপ্রসূত নয়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে– কিয়ামতের সময় মানুষ যখন হন্যে হয়ে ফিরতে থাকবে, তখন আমিই হবো তাদের নেতা। সবাই নির্বাক হয়ে গেলে আমিই হবো সকলের একমাত্র মুখপাত্র। যখন নৈরাশ্য মানুষকে ঘিরে ফেলবে তখন আমিই হবো সকলের সুপারিশকারী। আমার হাতে থাকবে আল্লাহ্পাকের প্রশস্তির নিশান। মণি-মুক্তা অলংকৃত কুমারীদের মতো অসংখ্য পরিচারক তখন আমার চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে অবস্থান করবে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আমাকে বেহেশতী পরিচ্ছদে ভূষিত করা হবে। বেহেশতের দক্ষিণ দিকে এমন একটি অবস্থানে আমি দণ্ডায়মান হবো যেখানে যাবার সাধ্য আর কারো নেই। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন– নবী করীম স. বলেন কিয়ামত দিবসে আমিই হবো সর্বোত্তম আদম সন্তান। আমার হাতে থাকবে তখন প্রশংসার পতাকা। আর এটা কোনো দম্ভপ্রকাশক বাক্য নয়।

সেদিন সকল আদম সন্তান ওই প্রশংসার পতাকার নিচে অবস্থান করবে। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে– নবীপাক স. বলেছেন, সেদিন আমার মাধ্যমেই উত্তোলিত হবে প্রশংসার ঝাণ্ডা। সর্বপ্রথম আমিই বেহেশতের দরোজার শিকল আন্দোলিত করবো। প্রথমে আমার জন্যই খুলে দেয়া হবে বেহেশতের প্রবেশ দ্বার। তখন আমি আমার বিশ্বাসী ফকির-দরবেশ অনুসারী সমভিব্যাহারে বেহেশতে প্রবেশ করবে। অগ্র-পশ্চাতের সকল মানুষ অপেক্ষা সেদিন আমিই হবো সর্বাধিক সম্মানিত। দর্প প্রকাশ এ ঘোষণার উদ্দেশ্য নয়। তিনি আরও এরশাদ করেছেন– কিয়ামতের দিন আমিই হবো সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান। আগের ও পরের সকল মানুষকে সেদিন একত্রিত করা হবে। সকলেই তখন শাফায়াতকারী হিসেবে আমাকে দেখতে পাবে। এরপর তিনি শাফায়াত সংক্রান্ত বিবরণসমূহ পেশ করেছেন– পরবর্তীতে সেই বিবরণগুলো উপস্থাপন করা হবে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে– তিনি স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হবো মহাপুরস্কারের অধিকারী। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে– তিনি এরশাদ করেছেন, তোমরা কি একথা জেনে আনন্দিত নও যে, সেদিন তোমাদের মধ্যে অবস্থান করবেন হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত ঈসা। তাঁরা তখন আমার উম্মতের অন্তর্ভূত হবেন। হজরত ইব্রাহিম বলবেন, হে মোহাম্মদ স.! আপনি আমার প্রার্থনার প্রতিফল। আপনিই আমার সন্তানদের অন্যতম। এখন আপনি আমাকে আপনার উম্মতের অন্তর্ভূত করে নিন। হজরত ঈসা বললেন, সমস্ত নবীগণ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। তাদের পিতা এক। মাতা ভিন্ন ভিন্ন। হে মোহাম্মদ! আপনি আমার ভাই। আপনার এবং আমার মধ্যবর্তীতে আর কোনো রসুল নেই। সুতরাং আমি আপনার অধিকতর ঘনিষ্ঠ জন। রসুলপাক স. আরও বলেছেন, হাশরের ময়দানে আমিই হবো বনী আদমের সর্দার। একথা নিশ্চিত যে, তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেরই সর্দার। তবুও এখানে কেবল আখেরাতের কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সেদিন তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বের প্রকাশ হবে প্রকটতর। আর একটি কারণ হচ্ছে আখেরাতে সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে তিনিই পালন করবেন একক ভূমিকা। সকলে সেদিন তাঁর নিকটে সমবেত হবে এবং তাঁর আশ্রয় থাকবে। সুতরাং তিনিই হবেন সেদিন একচ্ছত্র সর্দার। জনতা তাদের সর্দারের নিকট প্রয়োজন পূরণার্থে সমবেত হয়। সর্দার তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন। কিয়ামতের দিন তাঁর শাফায়াতের প্রয়োজন পড়বে সকলের। আর তিনিই সেদিনের একক শাফায়াতকারী।

আখেরাতের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন– "আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, আজ রাজত্ব কার? তিনিই জবাবে বলবেন, প্রবল পরাক্রান্ত একক আল্লাহ্র।" অথচ প্রকৃত কথা এই যে, দুনিয়া-আখেরাত উভয়

জগতই তাঁর আয়ত্বভূত। তবুও আখেরাতের একক রাজত্বের মহিমা বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হযেছে একারণে যে, দুনিয়াতে মানুষেরাও রাজত্বের দাবী উত্থাপন করে থাকে। কিন্তু আখেরাতে এরকম দাবী করার সাহস ও অধিকার কারো থাকবে না। ঠিক তেমনি রসুলপাক স. এর সুপারিশ পৃথিবীবাসীদেরও কাম্য। কিন্তু আখেরাতে কারো কামনা ও প্রার্থনা ব্যতিরেকেই তিনি শাফায়াতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। একাজে তাঁর সহযোগী কেউ থাকবেন না। সেই একচ্ছত্র নেতৃত্বের কথাই হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আশশিফা রচয়িতা এরকম বলেছেন।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে আমার জন্য মৃত্তিকা উন্মুক্ত হবে। তারপর উন্মুক্ত হবে আবু বকরের জন্য, তারপর ওমরের জন্য। তারপর আমি জান্নাতুল বাকীর কবরবাসীদের কাছে আসবো– তারা সকলে তখন কবর থেকে উত্থিত হবে। এরপর আমি মক্কাবাসীদের প্রতীক্ষায় থাকবো। তখন দুই হেরেমের মধ্যবর্তী সকল কবরবাসী কবর থেকে উঠে এসে একত্রিত হবে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাকীমে তিরমিজির নাওয়ারেদুলউসুল গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর থেকে আবু হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলপাক স. তাঁর পবিত্র প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর ডান পাশে ছিলেন হজরত আবু বকর এবং বামপাশে ছিলেন হজরত ওমর। তিনি এরশাদ করলেন, এভাবেই আমি কিযামতের ময়দানে উপস্থিত হবো। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে– নবীপাক স. বলেছেন, তিনি বুরাকের পিঠে চড়ে হাশর প্রান্তরে উপস্থিত হবেন। অন্য নবীগণ উপস্থিত হবেন বিভিন্ন জন্তুর পিঠে চড়ে। হজরত ছালেহ উপস্থিত হবেন তাঁর উটনীতে সমারূঢ় হয়ে। তিনি স. আরও বলেছেন, আমার আসবা ও আসওয়া নামের উষ্ট্রীদ্বয়ে আরোহণ করে হাশরের ময়দানে উঠবে প্রিয়তম কন্যা হজরত ফাতেমা এবং তার প্রিয় তনয় ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন। আর হজরত বেলাল সেখানে উপস্থিত হবেন বেহেশতের উটনীতে চড়ে।

ফেরেশতাদের তাওয়াফ

হজরত কা'ব আহবার কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, প্রতি সূর্যোদয়ের পূর্বে সত্তর হাজার ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে রসুলপাক স. এর রওজা শরীফ তাওয়াফ করতে থাকেন। তাঁরা বাহু আন্দোলিত করে তাঁর প্রতি পেশ করতে থাকেন দরূদ ও সালাম। সাঁঝ বেলায় তারা ফিরে যান আকাশে। আর ঠিক তখনই আকাশ থেকে নেমে আসে সত্তর হাজার নতুন ফেরেশতার দল। এই নিয়মেই চলতে থাকে তাওয়াফের নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান। রসুলপাক স. বলেন, অবশেষে একদিন মৃত্তিকা বিদীর্ণ হবে– তখন আমি বেরিয়ে আসবো কবর থেকে।

তাওয়াফকারী ফেরেশতারা তখন আমাকে ঘিরে রাখবে। এভাবে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের দরবারে। বরযাত্রীরা যেমন করে যায়।

জামেউল উসুল গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে উত্থিত হবো আমি। আমাকে তখন হুল্লা নামক বেহেশতী পোশাকে সজ্জিত করা হবে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে– সর্বপ্রথম হুল্লা পরানো হবে হজরত ইব্রাহিমকে। বায়হাকী শরীফে বলা হয়েছে– সর্বপ্রথম যাকে হুল্লা পরিধান করানো হবে তিনি হজরত ইব্রাহিম। এরপর পবিত্র কুরসী এসে আরশের ডান পাশে সংস্থাপন করা হবে। এরপর আমাকে বেহেশতী হুল্লায় আবৃত করানো হবে। এরপর হুল্লা বণ্টন করা হবে অন্য বেহেশতীদের জন্য। এরপর আমাকে বসানো হবে কুরসীতে।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, হজরত ইব্রাহিমকে প্রথমে হুল্লা পরানো হলেও তিনি কিন্তু রসুলপাক স. অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নন। সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হবেন তিনি। তখন নিজস্ব পোশাক থাকবে তাঁর পবিত্র শরীরে। সেই পোশাক সরিয়ে তাঁকে হুল্লা পরানো হবে। পরে হজরত ইব্রাহিম কবর থেকে উত্থিত হলে তাঁকে পরিধান করানো হবে হুল্লা। এই পরিধানের কাজটি হবে অন্য সকলের অগ্রে। পরিচ্ছদবিহীনতা দূর করার জন্যই থাকবে এই ব্যবস্থা। কিন্তু রসুলপাক স. পরিচ্ছদহীন অবস্থায় হুল্লা পরিধান করবেন না, তিনি পোশক বদল করবেন মাত্র। হালিমী বলেছেন, প্রকাশ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, হুল্লা প্রথমে হজরত ইব্রাহিমকে এবং পরে রসুলপাক স.কে পরানো হবে। এরকম করা হলেও বুঝে নিতে হবে নবী পাক স. এর হুল্লা হবে উন্নতর, পবিত্রতর এবং উজ্জ্বলতর। হাদিস শরীফে এ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। কিন্তু হাকিমীর যুক্তি গ্রহণ করলে নবীপাক স. এর প্রথমে হুল্লা প্রাপ্তির বিষযটি প্রমাণিত হয় না। আমার (গ্রন্থকারের) অভিমত হচ্ছে– পিতৃত্বের মর্যাদার কারণে হজরত ইব্রাহিমই প্রথমে হুল্লা পরিধান করবেন। এ ধরনের অধিকারে পিতা পুত্রাপেক্ষা অগ্রগণ্য হয়ে থাকেন। এটা হচ্ছে আংশিক অগ্রগণ্যতা। সামগ্রিক অগ্রগণ্যতা ও মর্যাদা রসুলপাক স. এর জন্যই নির্ধারিত। তাই পরক্ষণেই বর্ণিত হয়েছে– পবিত্র কুরসীতে উপবেশন করানো হবে রসুলপাক স.কে। হজরত ইব্রাহিমকে নয়। কেউ কেউ বলেছেন, নমরূদ হজরত ইব্রাহিমকে বস্ত্রহীন অবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো তাই কিয়ামতের দিন তাঁকে সর্বাগ্রে হুল্লা পরিধান করানো হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তবে এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মতটি এ রকম– হাশরের ময়দানে উত্থিত মানুষেরা থাকবে খালি মাথায়, খালি পায়ে এবং বস্ত্রহীন শরীরে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী শরীফে এ রকম বর্ণনা রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা এরকম "কামা বাদা'না আওয়ালা খলকিল ন্যুইদ" (আমি তাদেরকে প্রথমবার যেরূপে সৃষ্টি করেছিলাম সেরূপেই পুনরায় ফিরিয়ে আনবো)। তবে আবু দাউদ ও

ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী মৃত্যুর সময় নতুন কাপড় আনিয়ে পরিধান করলেন এবং বললেন, আমি রসুলপাক স.কে বলতে শুনেছি মৃত ব্যক্তিকে সেই বস্ত্রসহকারে কবর থেকে উঠানো হবে, যে বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া প্রণেতা ইবনে আবী উসামা এবং আহমদ মুনাইযয্যা থেকে বর্ণনা করেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার কাফনের কাপড় পরিহিত অবস্থায় কবর থেকে ওঠানো হবে। ওই সময় তাদের একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে। বোখারী ও অন্যানোর দ্বারা বর্ণিত উপরোল্লেখিত হাদিসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলা হয়েছে– কেউ কেউ উলঙ্গ হয়ে কবর থেকে উঠবে এবং কেউ কেউ উঠবে কাফনাচ্ছাদিত অবস্থায়। আবার কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, পাপীরা উঠবে উলঙ্গ অবস্থায় এবং পুণ্যবানেরা উঠবে বস্ত্রাবৃত হয়ে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী অবশ্য হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন– মর্মার্থের দিকে লক্ষ্য করেননি। সাহাবায়ে কেরামদের অনেকেই সরল ও সুন্দর ছিলেন বলেই সোজাসুজি অর্থ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী ছিলেন তাঁদের শ্রেণীভুক্ত।

প্রশংসার পতাকা

আত্তায়্যেবী বলেছেন, লেওয়ায়ে হামদ বা প্রশংসার পতাকার অর্থ আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা এবং মাকামে মাহমুদ লাভের ক্ষেত্রে রসুলপাক স.এর একক অর্জন ও খ্যাতিমানতা। শাফায়াত সংক্রান্ত হাদিসের মর্মার্থ দ্বারা এ রকমই প্রতীয়মান হয়। উল্লেখযোগ্য স্থান নির্দেশ করতে আরববাসীরা এ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। বিষয়টি বাহ্যিক অর্থে ও গ্রহণীয় হতে পারে। হাশর প্রান্তরে নবীপাক স. এর পবিত্র হস্তে একটি ঝাণ্ডা থাকবে। ওই ঝাণ্ডাটির নাম "লেওয়ায়ে হামদ।"

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা ইমাম তিবরানীর বরাত দিয়ে "রিয়াজুন নাদরা" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন– একদিন রসুলপাক স. হজরত আলীকে বললেন, হে আলী! তুমি কি জানো না কিয়ামতের দিন আমিই হবো প্রথম ভাষণদানকারী। সেদিন আমি থাকবো আরশের ছায়ার দক্ষিণ অংশে। আমার শরীরে তখন থাকবে জান্নাতী হুল্লা। জেনে রেখো, সে সময় প্রথমেই হিসাব নেয়া হবে আমার উম্মতের। আরও একটি সুসংবাদ শ্রবণ করো। সেদিন তোমাকে ডেকে এনে তোমাকে একটি ঝাণ্ডা প্রদান করা হবে– যার নাম হবে "লেওয়ায়ে হামদ।" সেদিন হজরত আদমসহ সকলেই ছায়া অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকবে। আর সেখানে আমার ঝাণ্ডার ছায়াই হবে একমাত্র ছায়া। আমার সেই ঝাণ্ডার পরিসর হবে ছয়'শ বছরের পথের সমান। ওই ঝাণ্ডার ফলা হবে লোহিত ইয়াকুত নির্মিত। হাতল হবে শুভ্র রৌপ্যের। আর

নিশানটি হবে সবুজ মুক্তা খচিত। নিশানটিতে থাকবে নূরের তৈরী তিনটি ঝালর। একটি ঝালর থাকবে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে। আরেকটি পশ্চিম প্রান্তে এবং অন্য আরেকটি পৃথিবীর মধ্যস্থলে। তিনটি ঝালরে লিপিবদ্ধ থাকবে তিনটি ছত্র। একটি ছত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম', একটিতে আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন এবং তৃতীয়টিতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। প্রতিটি ছত্রের দৈর্ঘ্য হবে এক হাজার বছরেরপথের সমান। প্রস্থও হবে অনুরূপ। হে আলী! ওই পতাকাটি তখন আমি তোমার হস্তে অর্পণ করবো। সে সময় তোমার দক্ষিণ পাশে দণ্ডায়মান থাকবে ইমাম হাসান এবং বাম প্রান্তে ইমাম হোসেন। তুমি থাকবে আমার এবং হজরত ইব্রাহিমের মধ্যস্থলে– আরশের ছায়ায়। তোমাকে পরিধান করানো হবে বেহেশতী পোশাক। ইবনে সাবা তাঁর খাসায়েস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রসুলকরীম স. এর নিকট 'লেওয়ায়ে হামদের' বিবরণ জানতে চেয়েছিলেন। তিনি স. তখন বলেছিলেন– তার বিস্তার হবে এক হাজার ছয়শ বছরের পথের সমদূরত্বে সম্পন্ন।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া প্রণেতা বলেছেন, হাফেজ কুতুবউদ্দীন হেলাকী মুহিব ইবনুল বাহায়েমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, লেওয়ায়ে হামদ সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদিসটি মাওজু (জাল)। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত। বান্দা মিসকিন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলছেন, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া প্রণেতার বর্ণনা সঠিক। অবশ্য আল্লাহ্তায়ালাই এ সম্পর্কে অধিক অবগত। এরপরও হাদিসে উল্লিখিত শব্দাবলীর ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে এমন কতিপয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে– যা লওহো ও কলমের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। বর্ণিত হয়েছে, লওহো এবং কলম যবরজদ ও ইয়াকুত পাথরের তৈরী। আরশবাহী ফেরেশতাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তাদের এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতির দূরত্ব দুশ' বছরের দূরত্বের সমান। এক বর্ণনায় এসেছে, সাতশত বছরের দূরত্বের সমান। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। আমরা সকল বর্ণনাই বিশ্বাস করি। আমরা ওই সকল বর্ণনাও বিশ্বাস করি যেগুলো বিশ্বস্ত তার স্তরে উপনীত হয়েছে। মহামর্যাদামণ্ডিত শরিয়ত প্রবর্তকের মাধ্যমে বর্ণনাগুলো এসেছে। তাই সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যাবলির উপরেও আমাদের আস্থা রয়েছে। আমরা যেনো আমাদের বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত না হই। বুদ্ধির বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়ার কারণে সেগুলিকে যেনো অসম্ভব ও সুদূরপরাহত বলে মনে না করি। আর এ জাতীয় বর্ণনাগুলোর হকিকত ন্যস্ত করি আল্লাহ্তায়ালার উপরে। তবে বর্ণিত হাদিসসমূহের সনদ সম্পর্কে মোহাদ্দেছগণের বিশ্লেষণ माननीय। ওই সকল বিশ্লেষণের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা বলেছেন, আরবীয় ঐতিহ্যে পতাকার মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পতাকা সংরক্ষণ করে। যুদ্ধের সময় পতাকা থাকে প্রধান সেনাপতির হাতে। তার অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য কেউও পতাকাবাহী হতে পারে। পতাকা উত্তোলিত হলে সেনাদল সমবেত হয়। পতাকা যেদিকে ঝুঁকে পড়ে যোদ্ধারাও সেদিকে নৃত্যউন্মাদ ছন্দে আক্রমণাত্মক হয়। খয়বর বিজয়ের আগের দিন রসুলপাক স. বলেছেন, আমি আগামীকল এমন এক ব্যক্তিকে যুদ্ধের পতাকা প্রদান করবো, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও রসুল তাকে ভালবাসেন। এই বিবরণটি রয়েছে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে। মুতার যুদ্ধে পতাকা উত্তোলনকারী ছিলেন হজরত জাফর বিন আবী তালেব। যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ পতাকা তুলে ধরলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। এক সময়ে তিনিও শহীদ হলেন। তখন সর্বশেষ সেনাপতিরূপে পতাকা তুলে ধরলেন হজরত খাদিল বিন ওলিদ। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে এলো কাঙ্খিত বিজয়। বর্ণিত ঘটনাগুলোর দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, পতাকা বহনের অধিকার প্রধান সেনাপতির। আল্লাহু আ'লাম।

হাউজে কাওছার

আল্লাহ্পাক তাঁর হাবীবকে হাউজে কাওছার দানে সম্মানিত করেছেন। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে– রসুল আকরম স. বলেছেন, আমার হাউজের বিস্তৃতি হবে এক মাসের পথের সমদূরত্বসম্পন্ন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই রকম। মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং দুধের চেয়েও শুভ্র হবে তার পানি। পানি প্রবাহিত হতে থাকবে মোতি ও ইয়াকুত পাথরের উপর দিয়ে। এক বর্ণনায় রয়েছে– হাউজের পানি হবে রূপার চেয়েও অধিক শুভ্র। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে– বরফের চেয়েও শাদা। মেশক জাফরানের চেয়েও বেশী সুবাসিত হবে হাউজের পানি। পান পাত্রগুলো হবে আকাশের নক্ষত্র সদৃশ। হাউজে কাওছারের পাশে থাকবে মোতির গম্বুজমালা। হাউজের বিশালতা সম্পর্কে এ রকম অনেক বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের জ্ঞান অনুপাতে হাউজের আয়তন সম্পর্কে বিবরণ দান করেছেন। তাই বিবরণগুলোতে আকারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বিবরণগুলোর মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই– এরকম বলেছেন হাদিস ব্যাখ্যাকারক আল্লামা কেরমানী। কেউ কেউ বলেছেন– প্রথম দিকে রসুলপাক স. হাউজের আয়তন সম্পর্কে অল্প দূরত্বের কথা বলেছেন। পরে বলেছেন অধিক দূরত্বের কথা। আল্লাহ্পাকই হয়তো তাঁকে হাউজে কাওছারের বিশালতা সম্পর্কে স্তরে স্তরে জ্ঞানদান করেছেন (এভাবে বিবরণপূর্ণ হয়েছে)।

হাউজে কাওছারের দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান এবং গভীরতা সত্তর হাজার বছরের দূরত্বসম্পন্ন। হাদিস শরীফে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, হাউজে কাওছারের পানি যে পান করবে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। কেউ কেউ বলেছেন– একথার অর্থ হাউজের পানি হবে অপরিমেয়। পানি পানকারী কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না– এ কথাতেই প্রতীয়মান হয় যে, তাকে কখনই দোজখের আযাব দেয়া হবে না। কেননা দোজখবাসীরা হবে যন্ত্রণাদগ্ধ ও পিপাসার্ত। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, হাউজের পানি যে পান করবে তাকে শাস্তি দেয়া হলেও লঘু শাস্তি দেয়া হবে, যাতে করে সে পিপাসিত না হয়। কেউ কেউ বলেছেন– দু'টি হাউজ দেয়া হবে রসুলপাক স. কে। একটি দেয়া হবে হাশরের ময়দানে। অপরটি জান্নাতে। ওই দুই হাউজের সম্মিলিত নাম কাওছার। কেউ কেউ এরকমও বলেছেন, সকল নবী তাঁদের মর্যাদা অনুসারে একটি করে হাউজ লাভ করবেন। যদি একথা ঠিক হয় তবে এ ব্যাপারটিও মেনে নিতে হবে যে, রসুলপাক স. এর হাউজ হবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর হাউজ থেকেই অন্য নবীর হাউজসমূহে পানি সরবরাহ করা হবে। হাউজ সম্পর্কে কোরআন মজীদে এসেছে, ইন্না আ'ত্বইনা কাল কাওছার (নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি)। ইমাম কুরতুবী থেকে সংকলিত হয়েছে, হাউজে কাওছার সম্পর্কে জানা এবং বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্র কালামে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তদুপরি এর সমর্থনে রয়েছে অনেক বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদিস। সুতরাং বিষয়টি অকাট্য। ত্রিশেরও অধিক সাহাবী কর্তৃক কাওছার সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে বিশজন সাহাবীর বিবরণ। অবশিষ্টদের বিবরণ রয়েছে অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে। সমসংখ্যক তাবেয়ী ও তাবে তাবেঈনও হাদিসগুলোর বর্ণনাকারী। এ বিষয়ে রয়েছে পরবর্তী সাধুসজ্জনদের (সলফে সালেহীনের) ঐকমত্য। মুসলিম কর্তৃক মারফু পদ্ধতিতে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেন, আমার উম্মতেরা আমার হাউজের কাছেই সমবেত হবে। যারা উম্মত নয় তাদেরকে আমি তখন বাধা প্রদান করবো। এই বাধা প্রদান সম্পর্কে আলেমগণ মন্তব্য করেছেন– অন্যান্য নবীদেরও যেহেতু একটি করে হাউজ থাকবে তাই তিনি স. অন্য নবীর উম্মতগণকে আপন আপন নবীর হাউজের নিকট যেতে বলবেন। এভাবে তাদেরকে বাধা দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন মুসলিম ভ্রাতৃত্বের যথা অধিকার। কৃপণতার কারণে তিনি এমনটি করবেন না। কারণ তাঁর অবস্থানস্থলটি হবে ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার কেন্দ্র। আর তিনি হচ্ছেন সুমহান, ন্যায়নিষ্ঠ। এরকমও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, তখন রাসুল পাক স. তাদেরকেই বাধা প্রদান করবেন, যারা হাউজে কাওছারের পানি পান করার যোগ্যতা রাখে না।

হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুলপাক স. বলেছেন, আমার হাউজ হবে চার কোণ বিশিষ্ট। একটি কোণ থাকবে হজরত আবু বকর সিদ্দিকের

অধিকারে। দ্বিতীয়টি থাকবে হজরত ওমর ফারুকের অধিকারাধীন। তৃতীয়টি থাকবে হজরত ওসমানের এবং চতুর্থটি থাকবে হজরত আলীর আওতায় । যে ব্যক্তি হজরত আবু বকরের অনুরাগী এবং ওমর বিদ্বেষী, তাকে হজরত ওমর পানি পান করতে দিবেন না। আর যে ব্যক্তি হজরত আলীকে ভালবাসবে আর হজরত ওসমান বা অন্য সাহাবীগণের প্রতি বৈরীবাব পোষণ করবে, সেও পানি পান করতে পারবে না। আবু সাঈদ তার শরফুন নবুয়াত গ্রন্থে এই বিবরণটি দিয়েছেন। গায়লামীও এ রকম বলেছেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে এই হাদিসটির উদ্ধৃতি রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ বিবরণটি এই– হজরত আলী হবেন সাকিয়ে কাওছার (কাওছারের পানি সরবরাহকারী)। হজরত আলী বলেছেন, যে ব্যক্তি হজরত আবু বকরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন আমি তাকে কখনও পানি পান করাবো না।

শাফায়াত ও মাকামে মাহমুদ

শাফায়াতের অধিকার এবং মাকামে মাহমুদ লাভ একটি অনন্যসাধারণ মর্যাদা। এ মর্মে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন– অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমুদে উন্নীত করবেন। (আছা আইঁ ইয়্যাব আছাকা রব্বুকা মাকামাম মাহমুদা)। এই আয়াতে 'আসা' শব্দটি রসুল স. এর ঔৎসুক্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এভাবে উৎসুক করে তোলার পর কাউকে বঞ্চিত করা একটি ত্রুটিমূলক ও লজ্জাজনক ব্যাপার। আল্লাহ্তায়ারা পরম দয়ালু। সুতরাং তিনি যে আশা দিয়ে বঞ্চিত করবেন, এটা অকল্পনীয়।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে– মাকামে মাহমুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে নবীপাক স. বলেছিলেন, মাকামে মাহমুদ হচ্ছে শাফায়াতের অধিকার লাভ। মাকামে মাহমুদের অবস্থান আরশের দক্ষিণ প্রান্তে। তিনি সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে শাফায়াত করবেন। ওই স্থানে গমনের অধিকার আর কারো নেই। তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ তাঁর এ অসাধারণ মর্যাদা দেখে সশ্রদ্ধ ঈর্ষা (গেবতা) পোষণ করতে থাকবেন। হজরত কা'ব আহবার ও হাসান বসরী থেকে এরকম বর্ণিত হয়েছে। অন্য হাদিসে এসেছে– রসুলপাক স. বলেছেন, মাকামে মাহমুদ ওই স্থান– যেখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত করবো। তিনি আরও বলেছেন, আমাকে তখন এই অধিকার দেয়া হবে যে, আমি আমার অর্ধেক উম্মতকে বিনা হিসাবে এবং শাফায়াতের মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করাবো। তখন আমি শাফায়াত করতেই পছন্দ করবো। কেননা এতে রয়েছে প্রাচুর্য ও নৈকট্য (বরকতের প্রাচুর্য এবং আল্লাহ্পাকের অধিকতর

নৈকট্য)। তিনি আরও বলেছেন– তোমরা কি মনে করো শাফায়াত কেবল মোত্তাকীদের জন্য? না, এরকম নয়। বরং শাফায়াত হবে পাপীদের জন্য। শাফায়াত হবে উম্মতকে আযাব থেকে মুক্ত করার জন্য। আর মোত্তাকীদের জন্য শাফায়াত হবে অধিকতর মর্যাদা লাভের কারণ।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া প্রণেতা আল্লামা ওয়াহেদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, মাকামে মাহমুদ হচ্ছে মাকামে শাফায়াত। তাই রসুলপাক স. বলেছেন, মাকামে মাহমুদ ওই সম্মানিত স্থান– যেখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত করবো। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী থেকে ইবনুল খতীব বলেছেন, মাহমুদ শব্দটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তাৎপর্যের ইঙ্গিতবহ। তিনিই মাহমুদ (প্রশংসিত)– সকলে যার প্রশংসা করে। যারা প্রশংসিত জন নয় তাদের প্রশংসা কেউই করে না। আর যার মাধ্যমে প্রাপ্তিযোগ না ঘটে, সে-ও প্রশংসার্হ নয়। শাফায়াতের মাকামটি এমন একটি মাকাম যেখানে পৌঁছলে রসুলে আকরম স. এর মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি বর্ষিত হবে অসংখ্য নেয়ামত। তখন সমগ্র সৃষ্টি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। পৃথিবীতে তিনি শরিয়তের বিধিবিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে প্রশংসাধন্য হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও মাকামে মাহমুদ লাভের পর তিনি হবেন আরও অধিক ও পরিপূর্ণ প্রশংসামণ্ডিত। কারণ তখন আযাব-গজব থেকে মুক্তি, পুরস্কার প্রদান, পুণ্যবৃদ্ধি ইত্যাদি হবে তুলনামূলকভাবে অধিক মাত্রায়। উম্মতেরা তখন ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পাবে। তাদের অভাব-অভিযোগ অপনোদন হবে এবং পূরণ হবে তাদের যথা-প্রয়োজন।

'হামদ্' শব্দটির অর্থ ওই প্রশংসা যা প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি– সকল অবস্থায় করা হয়। প্রাপ্তিতে যে প্রশংসা করা হয় তার নাম 'শোকর' (কৃতজ্ঞতা)। একথাটি সুস্পষ্ট যে, প্রাপ্তির পরিমাণ ও প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করে নেয়ামতদানকারীর সম্মান ও প্রশংসা। এমতো ব্যাখ্যানুসারে শোকর হচ্ছে 'হামদ'-এর একটি অংশ। ইমাম রাজীর মতে- এখানে হামদ্ অর্থ ওই হামদ্ যা মূলতঃ শোকর। সৃষ্টি নেয়ামত প্রাপ্তির কারণে এই হামদ্ বা প্রশংসা করতে থাকবে। আর প্রশংসাই হবে তখন উচ্চর্য বিষয়। তাই হামদ্ (প্রশংসা) এবং শোকর (কৃতজ্ঞতা) এখানে সমার্থক।

কিয়ামতের দিনটি হবে বিশেষভাবে তাঁর জন্যই। সকলেই তখন তাঁর পূর্ণত্ব, পরিণত্ব, মর্যাদা ও মহত্বের প্রশস্তি গাইতে থাকবে। তিনি নিজেই বলেছেন, আল্লাহ্পাক সেদিন আমাকে আরশের ডান দিকে দাঁড় করাবেন। অন্যত্র বলেছেন, আরশে আজীমে দাঁড় করবেন। অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, কুরসিতে দণ্ডায়মান করাবেন। তারপর তাঁকে দিবেন বেহেশতের চাবি। হাতে তুলে দিবেন প্রশংসার পতাকা। সেদিনের শাফায়াত হবে তাঁর কামালতেরই অংশ বিশেষ, যার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টি উপকৃত হবে। মাকামে মাহমুদ বলতে যদি কিয়ামতের দিন রসুল পাক স. এর দণ্ডায়মান হওয়া, উচ্চ মর্যাদা লাভ হওয়া, সৃষ্টির উপকার করা ইত্যাদি একত্রে বুঝানো হয়, তবে তাতে করেও শাফায়াতের তাৎপর্য অনুভব্য হবে।

এরকম অর্থ গ্রহণ শুদ্ধ। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে– কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালা আরশে বসবেন এবং তাঁর ডান পাশে বসাবেন রসুলুল্লাহ স.কে। তাঁর মতে ওই অবস্থাটিই মাকামে মাহমুদ। আল্লামা ওয়াহেদী বলেছেন, এ বর্ণনাটি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই অগ্রাহ্য। শব্দগতভাবে অগ্রাহ্য এ কারণে যে, হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে 'বাআছ' শব্দটি– যার অর্থ উন্নীত করা বা প্রেরণ করা। সুতরাং বসা বা উপবেশনের কথা সেখানে আসতেই পারে না। উন্নীত হওয়া এবং উপবেশন করা নিশ্চয়ই এক কথা নয়। সুতরাং বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে– "মাকামাম মাহমুদা" "মাকআদাম মাহমুদা" বলা হয়নি। রসুলপাক স. এর উপবেশন স্থান দিক ও আয়তনবিশিষ্ট। তিনি আল্লাহ্তায়ালার পাশে বসবেন– এ রকম কথা বলা হলে আল্লাহ্তায়ালাও স্থান, দিক ও আয়তনভূত হয়ে পড়বেন– যা অসম্ভব। এ রকম ধারণা আল্লাহ্পাকের অবিভাজ্যতাকে ক্ষুণ্ন করে। শিরিকের ধারণাকে করে প্রকটতর। তাই বর্ণনাটি অবশ্য পরিত্যাজ্য। সুতরাং অর্থগত দিকদিয়েও বর্ণনাটি অচল।

বান্দা মিসকিন (গ্রন্থকার) বলছেন, বর্ণিত হাদিসটি বিশুদ্ধ হয়ে থাকলে হাদিসটিকে মোতাশাবেহাত আয়াতের মতো মনে করতে হবে। কোরআনে এ রকম আয়াত রয়েছে অনেক। যেমন– 'সুম্মাস্তাওয়া আ'লাল আরশ' (অতপরঃ আল্লাহ্ আরশে অধিষ্ঠিত হলেন)– এ ধরনের রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতসমূহের মতো বর্ণিত হাদিসটিকেও রহস্যাচ্ছন্ন অর্থসম্পন্ন হাদিস মনে করতে হবে। এগুলোর সরাসরি শাব্দিক অর্থ গ্রহণীয় নয়, ভাবার্থ গ্রহণীয়। কোরআন মজীদের এক স্থানে বলা হয়েছে, "ইন্দা মালায়িকা ইন্দা রব্বিকা' এখানে 'ইন্দা' অর্থ নিকটে। তাফসীরকারগণ বলেছেন, 'ইন্দা' শব্দটির অর্থ স্তর ও মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্থান বা দূরত্বের সঙ্গে নয়। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার পাশে রসুলপাক স. এর উপবেশন সম্পর্কিত হাদিসটিও স্থান বা দূরত্বের দিক দিয়ে পাশাপাশি– এ রকম মনে করা যাবে না। এ সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, বর্ণনাটি দর্শনগত ও স্তরগত অবস্থারও বাইরে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে– আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামতের দিন রসুলপাক স. কে পবিত্র কুরসিতে উপবেশন করাবেন। তখন তিনি বসবেন আল্লাহ্তায়ালার মুখোমুখি। এ বর্ণনাটিকেও মোতাশাবেহাত শ্রেণীভুক্ত মনে করতে হবে। অর্থাৎ শব্দগত অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। গ্রহণ করতে হবে ভাবার্থ। মোটকথা, হুকুম কেবল এককভাবে আল্লাহ্রই। কিন্তু কিয়ামতের দিন রসুলপাক স. হবেন তাঁর একক প্রতিনিধি। ওই বিশেষ প্রতিনিধিত্বই তাঁকে সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত করবে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ"– আল্লাহ্ ব্যতিরেকে উপাস্য মাত্রই নেই, আর মোহাম্মদ আল্লাহ্রই রসুল।

শাফায়ত

শাফায়াতের হাদিসসমূহ বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস, হজরত আবু হোরায়রা ও অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে। বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থে এগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। রসুল আকরম স. এরশাদ করছেন– আমি কিয়ামতের দিন সকল মানুষের অধিকর্তা হবো তোমরা তখন বুঝতে পারবে আমার সেই কর্তৃত্ব কী ধরনের হবে। আল্লাহ্তায়ালা আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে সেদিন একত্রিত করবেন। তাদের সেদিনের দুঃশ্চিন্তা ও কষ্ট হবে অসহনীয়। তারা পরস্পরে বলাবলি করতে থাকবে, এ অসহনীয় দুঃখযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ হবে কীভাবে? এখন এমন একজনকে প্রয়োজন– যিনি আমাদের জন্য আল্লাহ্তায়ালার সমীপে সুপারিশ করতে পারেন। কেউ কেউ বলবে, হজরত আদমতো আমাদের সকলেরই জনক, তাই তাঁকেই সুপারিশকারী হিসেবে মেনে নেয়া কর্তব্য। এ প্রস্তাবে সকলে একমত হবে এবং হজরত আদমের নিকট গিয়ে বলবে– আপনি আমাদের সকলের পিতা। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে তাঁর পবিত্র হস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন 'রূহ'। সকল ফেরেশতারা সেজদার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন আপনাকে। বেহেশত ছিলো আপনার বসবাসের স্থান। আল্লাহ্তায়ালা সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন আপনাকে। অতএব আপনিই এখন আমাদের ত্রাতা। দেখুন! কী কঠিন অবস্থা আমাদের। এ বিপদ থেকে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ্পাকের নিকট সুপারিশ করুন।

হজরত আদম বলবেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক এখন রোষতপ্ত। আগে কখনো তিনি এ রকম হননি। পরেও হবেন না। আল্লাহ্পাক আমাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে নির্দেশের যথাপ্রতিপালন আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে কথা মনে করে আমি এখন আমার পরিণতির চিন্তায় নিমগ্ন। নাফসি নাফসি (হায় আমার কী হবে! আমার কী হবে)– এই এখন আমার অবস্থা। তোমরা বরং হজরত নূহ এর কাছে যাও এবং তাঁকেই সুপারিশকারী হবার আবেদন জানাও। একথা শুনে সকল মানুষ তখন হজরত নূহ্ এর কাছে যাবে এবং বলবে– আপনি পৃথিবীতে প্রেরিত প্রথম রসুল। আল্লাহ্পাক আপনার নাম রেখেছেন 'আবদে শাকুর'। আমাদের দিকে দৃকপাত করুন। দেখুন! কি করুণ অবস্থা আজ আমাদের। এ দুরবস্থা দেখেও কি আপনি আমাদের সুপারিশকারী হতে সম্মত হবেন না?

হজরত নূহ্ বলবেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক এখন প্রচণ্ড 'কহর' ও 'গজব' প্রকাশ করছেন। এ রকম অবস্থা আগে কখনো হয়নি। পরেও হবে না। আমার অবস্থা এখন নাফসি নাফসি। আমি এখন আপন পরিণতির চিন্তায় পেরেশান। হজরত নূহ তাঁর অবিশ্বাসী পুত্র কেনানের মুক্তির আবদেন জানিয়েছিলেন। পুত্র বাৎসল্যের কারণে অবিশ্বাসীর জন্য সুপারিশ প্রার্থী হয়েছিলেন। সেই অসতর্কতার চিন্তা করে তখন পেরেশানী বেড়ে যাবে হজরত নূহ্ এর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে– ওই অপপ্রার্থনাটির কথা মনে করে তিনি তখন পেরেশান হয়ে পড়বেন– যাতে

তিনি করেছিলেন অবিশ্বাসীদের ধ্বংসের আবেদন। সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে হজরত নূহ্ তখন বলবেন, তোমরা বরং হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লার কাছে যাও। ব্যতিব্যস্ত জনতা তখন ছুটে যাবে হজরত ইব্রাহিমের কাছে। বলবে, আপনি আল্লাহ্র খলিল (বন্ধু)। অনুগ্রহ করে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করুন। হজরত ইব্রাহিম বলবেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক আজ প্রচণ্ড রুষ্ট। এমন তিনি অতীতে কখনো হননি। ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। পৃথিবীতে তিনটি ভুল করেছিলাম আমি। সে কথা স্মরণ করে আমার অবস্থা এখন নাফসি নাফসি। তোমরা বরং অন্য সুপারিশকারী অনুসন্ধান করো। হজরত মুসার কাছে যাওয়াই ভালো। কেননা তিনি 'কলিমুল্লাহ'– আল্লাহ্র সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলেছেন। উদ্ভ্রান্ত জনতা তখন হজরত মুসার নিকটে গিয়ে বলবে, হে রসুল মুসা! আপনি আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে ধন্য হয়েছেন। দেখুন আজ আমাদের কী ভয়ংকর দুরবস্থা। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট শাফায়াত করুন। হজরত মুসা বলবেন, আল্লাহ্পাক এখন রোষান্বিত। এ রকম তপ্ত অবস্থা তাঁর আগে কখনো হয়নি, পরেও হবে না। আর শাফায়াতের যোগ্যতা আমার নেই। হত্যার উদ্দেশ্য না থাকলেও আমার আঘাতে একজনের মৃত্যু হয়েছিলো। সে কথা স্মরণ করে আজ আমি সন্ত্রস্ত। নাফসি নাফসি অবস্থা আমার। তোমরা বরঞ্চ হজরত ঈসার কাছে চলে যাও। কেননা তিনি কলেমাতুল্লাহ্ ও রূহুল্লাহ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষেরা তখন হজরত ঈসার কাছে গিয়ে বলবে– হে সম্মানিত রসুল! আপনি কলেমাতুল্লাহ্ ও রূহুল্লাহ্। আপনার পবিত্রা জননীর মাধ্যমে পবিত্র রূহের অধিকারী হয়েছেন আপনি। সদ্যজাত শিশু হয়েও দোলনায় শায়িত অবস্থায় আপনি কথা বলেছেন। আমাদের বিপদগ্রস্ততা এখন চরমে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ঈসা কোনো ভুলের কথা উল্লেখ করেননি। তবে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রয়েছে– তখন হজরত ঈসা বলবেন, আমাকে মানুষেরা আল্লাহ্র পুত্র বলেছে। এভাবে তারা আমাকে আল্লাহ্র অংশ সাব্যস্ত করেছে। ওই বিশ্বাসবিকৃতির কারণে আমাকে আজ যদি জবাবদিহি করতে হয়– সেই চিন্তাতেই আমি এখন অস্থির। আমার হাল এখন নাফসি নাফনি। সুতরাং আমি শাফায়াত করবো কীভাবে? তোমরা চলে যাও শেষ নবী মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা স. এর দরবারে। পূর্বের ও পরের কোনো ত্রুটি তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। সুতরাং তিনি এখন একমাত্র সুপারিশকারী। বিশাল জনস্রোত তখন ছুটবে রহমতের নবীর দরবারের দিকে। বলবে, হে আমাদের অনুকম্পাপরবশ রসুল! আমাদের করুণ অবস্থার দিকে অনুগ্রহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। রব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। রসুলে আকরম স. বলবেন, আমি আজ শাফায়াতের অধিকর্তা। শাফায়াত করে আমি আজ তোমাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যাবো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুলে আকরম স. বলবেন, আমি আরশের নিচে উপস্থিত হয়ে রব্বুল আলামীনের

উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হবো। আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় আমি উচ্চারণ করবো এমন প্রশংসামুখর বাণী– যে কথা কখনোই কারো মুখে উচ্চারিত হয়নি। আমাকে বলা হবে, হে মোহাম্মদ! মস্তক উত্তোলন করুন। প্রার্থনা করুন। আপনি যা চাইবেন, তাই দেয়া হবে। শাফায়াত করুন। আপনার শাফায়াত কবুল করা হবে।

আমি সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে নিবেদন করবো– হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালক! আমার উম্মত! আমার উম্মত! আল্লাহ্পাক বলবেন, যাদের কোনো হিসাব কিতাব নেই আপনার সেসকল উম্মতকে আপনি সোজা বেহেশতে পাঠিয়ে দিন। অন্যরা প্রবেশ করবে পরে। অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে, নবীপাক স. বলেছেন, আমাকে তখন বলা হবে, আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের অন্তঃকরণে গমের বীজের পরিমাণ ইমানও রয়েছে, তাদেরকে পৃথক করে জান্নাতে নিয়ে যান। আমি তখন নির্দেশিত ব্যক্তিদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবো। পুনরায় আগের মতো আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসায় মগ্ন হবো। আল্লাহ্পাক বলবেন, ঠিক আছে সরিষার পরিমাণ ইমান বিশিষ্টদেরকেও বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আমি নির্দেশ পালন করবো। পুনরায় প্রশংসামুখর হবো আগের মতো। আল্লাহ্পাক বলবেন, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ইমানের অস্তিত্ব রয়েছে– তাদেরকেও বেশেতের দিকে পরিচালিত করুন। আমি তদ্রূপই করবো। আবার শুরু করবো স্তবঃস্তুতি। তারপর বলবো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের জন্য পরিত্রাণ প্রার্থনা করছি, যারা জীবনে মাত্র একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। আল্লাহ্ বলবেন, এ বিষয়টি আপনার দায়িত্বভূত নয়। আমি বিশ্বসমূহের অপ্রতিদ্বন্দী প্রতিপালক! তাদের পরিত্রাণদাতা স্বয়ং আমি। আমার কসম, আমার ইজ্জত, জালাল, আজমত ও কিবরিয়ার কসম, আমি ওই লোকদেরকেও নরকাগ্নি থেকে নিষ্কৃতি দিবো, যারা জীবনে মাত্র একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। এ সিদ্ধান্তটি কার্যকর হওয়ার পর দোজখে পড়ে থাকবে কেবল তারাই, যাদের চিরস্থায়ী অগ্নিবাসের কথা বর্ণিত হয়েছে কোরআন মজীদে।

বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শাফায়াত সংক্রান্ত হাদিসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হাদিসগুলোর প্রকাশভঙ্গীতে রয়েছে ভিন্নতা। আর সেগুলোর কোনো কোনোটি দীর্ঘ বিবরণবিশিষ্ট, কোনোটি সংক্ষিপ্ত। এ সম্পর্কিত হাদিসের সংখ্যা অনেক। সেগুলোর সারৎসার হচ্ছে এই– রসুল পাক স. এর শাফায়াত শুরু হবে হাশরের ময়দানে। বেহেশত-দোজখের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে শাফায়াত জারী থাকবে। তিনি পুনঃপুনঃ শাস্তি থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা জানাতে থাকবেন– যারা বেহেশতী হবে তাদেরকে অধিকতর মর্যাদাদানের ব্যাপারেও তিনি শাফায়াত করতে থাকবেন।

দ্রষ্টব্যঃ কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন, হাদিসে বলা হয়েছে, হজরত নূহ্ পৃথিবীবাসীদের জন্য সর্বপ্রথম রসুল– এ রকম বলার কারণ কী? তাঁর পূর্বে হজরত

আদম এবং হজরত শীশও তো আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। উত্তরে বলা যেতে পারে– হজরত আদম এবং হজরত শীশ রসুল ছিলেন না, ছিলেন নবী। আরও বলা যেতে পারে হজরত নূহ্ ছিলেন সকল পৃথিবীবাসীর জন্য রসুল। আর হজরত আদম নবী ছিলেন তাঁর আপন পরিবারের জন্য। পরিবার পরিজনকে একত্ববাদীতার প্রতি প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং আল্লাহ্পাকের বিধান শিক্ষা দেয়াই ছিলো তাঁর কাজ। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিশ্বাসী। অবিশ্বাসী কেউই ছিলেন না। হজরত শীশ এবং হজরত ইদ্রিসের কর্মকাণ্ডও ছিলো বিশ্বাসীদের বলয়ভূত। কিন্তু হজরত নূহ্ রসুল ছিলেন কাফেরদের জন্য। অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান জানানোই ছিলো তাঁর কাজ।

শাফায়াতের পর্যায়

শাফায়াত করা হবে পাঁচটি পর্যায়ে। প্রথমে হাশরের প্রান্তরে, যখন পর্যুদস্ত মানুষেরা নিদারুণ সময় অতিবাহিত করবে। রসুল পাক স. তাদেরকে দুরবস্থা থেকে রক্ষা করবেন। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে স্বেদসমুদ্রে নিমজ্জিত মানুষ যখন হিসাব কিতাবের অপেক্ষায় দুর্বিসহ যাতনা ভোগ করতে থাকবে, তখন তিনি নিয়ে আসবেন সুবাসিত শাফায়াত। হিসাব ছাড়াই তিনি তাঁর একদল উম্মতকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

শাফায়াতের দ্বিতীয় পর্যায়টি হবে প্রশ্নোত্তর পর্ব ও হিসাবের সময়ে। ওই সময়েও তিনি শাফায়াতের শান্তিপ্রবাহের মাধ্যমে অনেক উম্মতকে ক্ষমাপ্রাপ্ত করে দিয়ে বেহেশত বাস নিশ্চিত করবেন।

তৃতীয় পর্যায়ে তিনি শাফায়াত করবেন ওই লোকদের জন্য, যারা আযাবের উপযোগী বলে ঘোষিত হয়েছে। রসুলপাক স. তাদের শাস্তি মাফ করিয়ে দিবেন।

চতুর্থ পর্যায়ের শাফায়াত হবে দোযখবাসীদের জন্য। তাঁর শাফায়াতের মাধ্যমে একদল দোজখবাসী নিষ্কৃতি লাভ করবে।

পঞ্চম পর্যায়ের শাফায়াত হবে বেহেশতবাসীদের জন্য। এই শেষ পর্যায়ের শাফায়াতের মাধ্যমে বেহেশতবাসীরা লাভ করবেন উন্নততর মর্যাদা। বিভিন্ন হাদিসে শাফায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিবরণ এসেছে। আল্লাহু আ'লাম।

কেউ কেউ বলেছেন, শাফায়াতের আরও একটি মাকাম রয়েছে– ষষ্ঠ পর্যায়ের এই সুপারিশটি হবে তাঁর চাচা হজরত আবু তালিবের জন্য। এই সুপারিশে লঘু শাস্তির আবেদন জানানো হবে। কেউ কেউ আবার সপ্তম পর্যায়ের একটি শাফায়াতের কথাও বলেছেন। এ শাফায়াতটি হবে মদীনাবাসীদের জন্য। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করবে কিয়ামতের দিন আমি তার ধৈর্য্য ধারণের সাক্ষ্যদাতা হবো এবং তার জন্য শাফায়াত করবো। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন– এই পর্যায়ের

শাফায়াত পূর্বোক্ত পাঁচটি শ্রেণীর শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত। তারা স্বতন্ত্র কোনো শ্রেণী নয়। যদি তাদেরকে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা হয়, তবে শাফায়াতের পর্যায় ও শ্রেণী সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। এ ধরনের অনেক শাফায়াতের কথা রসুল পাক স. থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন রসুলপাক স. এর রওজা শরীফ জিয়ারতকারীদের জন্য শাফায়াত, মোয়াজ্জিনের আযানের জওয়াবদানকারী এবং তাঁর নামে দরূদ পাঠকারীর শাফায়াত, অলী আল্লাহ্গণের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমার জন্য শাফায়াত, হাশরের ময়দানে যে ব্যক্তির পাপ-পুণ্য সমান হবে– তার জন্য শাফায়াত। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা কিছু লোককে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ রহমত প্রাপ্ত সাতশত লোক জান্নাতবাসী হবে। পাপীরা এবং আরাফবাসীরা তাঁর শাফায়াতের মাধ্যমে জান্নাতের অধিকার লাভ করবেন। আরাফবাসী হবে ওই সকল লোক, হাশরের ময়দানে যাদের পাপ-পুণ্য হবে সমান। আরাফবাসীদের সম্পর্কে এটাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য অভিমত। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার আমি রসুলপাক স. কে নিবেদন করলাম হে আল্লাহ্র রসুল! কিয়ামতের দিন আপনি কি আমার জন্য শাফায়াত করবেন? তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ্ করবো। আমি পুনরায় বললাম, আপনাকে সেদিন কোথায় পাবো? তিনি বললেন, পুলসিরাতের কাছে। আমি বললাম, যদি সেখানে খুঁজে না পাই? তিনি বললেন, তবে মিজানের কাছে খুঁজে নিও। আমি বললাম, সেখানেও যদি না দেখি? তিনি বললেন, তবে হাউজের কাছে দেখতে পাবে। এই তিন জায়গা ছাড়া আমি আর কোথাও যাবো না। এ বর্ণনাটির মাধ্যমে এ কথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, আখেরাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন। তাঁদের সাহায্য করবেন এবং তাঁদের জন্য সুপারিশ করবেন। আর তাঁর জন্যই উম্মতেরা সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে।

পুলসিরাত

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল করীম স. বলেছেন, পুলসিরাত সংস্থাপিত হবে জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশে। পুলসিরাত অতিক্রমকালে আমার উম্মত থাকবে সর্বাগ্রে। অন্য উম্মতেরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করবে তখন তাদের নবীরা দোয়া পাঠ করতে থাকবেন। বলবেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে নিরাপদ রাখো, নিরাপদ রাখো। অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুলপাক স. বলেছেন, তোমাদের নবী তখন পুলসিরাতের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন– রাব্বি সাল্লিম, সাল্লিম (হে প্রভুপ্রতিপালক! আপনি আমার উম্মতকে নিরাপদ রাখুন, নিরপদ রাখুন)। এভাবে সকল নবীই তাদের উম্মতের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবেন। এ রকমও হওয়া সম্ভব যে, সেদিন আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত সকলেই তাঁর অমুখাপেক্ষিতা ও পরাক্রম সন্দর্শনে সন্ত্রস্ত হয়ে এ রকম দোয়া পাঠ করতে থাকবেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে– ফেরেশতারা ও পুলসিরাতের দুই প্রান্ত দেশে দাঁড়িয়ে রব্বি সাল্লিম সাল্লিম বলে দোয়া করতে থাকবে। ফেরেশতারা অবশ্য বিশ্বাসীদের পাপস্খলনের নিমিত্তে সব সময়েই আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দোয়া করে থাকেন। এ কাজটি তাঁদের স্বভাবজাত। পুলসিরাতের প্রান্তেও তাঁরা স্বাভাবিক তাগিদেই দোয়া পাঠে রত থাকবেন।

ফুজাইল ইবনে আয়াজ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে এসেছে– পুলসিরাতের পরিধি হবে পনের হাজার বৎসরের দূরত্বের সমান। উপরের দিকে উঠতে পাঁচ হাজার বছর, নিচের দিকে নামতে পাঁচ হাজার বছর এবং মাঝখানে সোজাসুজি পাঁচ হাজার বছর। পুলসিরাত পাড়ি দেয়ার সময় আল্লাহ্‌র ভয়ে সকলেই প্রকম্পিত হতে থাকবে। প্রসিদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– পুলসিরাত তরবারীর চেয়ে অধিক ধারালো এবং তীরের চেয়েও অধিক চিকন। এক হাদিসে এসেছে, পুলসিরাত কোনো কোনো লোকের জন্য হবে তলোয়ারের চেয়ে ধারালো এবং তীরের চেয়ে সরু। আর কারো কারো জন্য হবে প্রশস্ত সমভূমির মতো। সেখানকার অবস্থা হবে হাশরের ময়দানের অবস্থার মতোই। হাশর প্রান্তরে অবস্থানের সময় কারো কারো কাছে মনে হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, আবার কারো কারো কাছে মনে হবে দু' রাকাত নামাজ পাঠের সময়ের মতো সংক্ষিপ্ত। এই তারতম্য ঘটবে ইমানের নূর এবং আমলের তারতম্যানুসারে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুলপাক স. বলেছেন– আমার উম্মতেরা পুলসিরাত অতিক্রমকালে যখন কাঁপতে থাকবে তখন বলতে থাকবে 'ইয়া মোহাম্মদ ইয়া রসুলাল্লাহ্ সাহায্য করুন।' তিনি তখন স্নেহসিক্ত কণ্ঠে তাদের ডাকে সাড়া দিবেন। বলবেন, রব্বি উম্মাতি উম্মাতি (হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে বাঁচান আমার উম্মতকে বাঁচান)। আজ আমি আপনার দরবারে আমার জন্য অথবা আমার প্রিয়তমা কন্যার জন্য কিছুই চাই না। এ হাদিস দ্বারা উম্মতের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা কতো এবং হজরত ফাতেমা তাঁর কতো প্রিয় তা অনুমান করা যায়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অধিক দান করতে অভ্যস্ত, সে সহজে পুলসিরাত পাড়ি দিতে পারবে। আর এক হাদিসে এসেছে, যার ঘরে অধিক নামাজ পঠিত হবে তার সংরক্ষক হবেন আল্লাহ্ স্বয়ং। বিশেষ রহমত ও করম দ্বারা আল্লাহ্ তাকে পুলসিরাত পার করে নিয়ে যাবেন।

মিজান

হাশর প্রান্তরে সওয়াল ও হিসাব হবে মিজানের ভিত্তিতে। হাদিস শরীফে এসেছে, জান্নাতকে আরশের ডানদিকে এবং জাহান্নামকে বাম দিকে রাখা হবে। তারপর আনা হবে মিজান। পুণ্যের পাল্লা জান্নাতের দিকে এবং পাপের পাল্লা

জাহান্নামের দিকে ধাকবে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন– রসুল পাক স. এরশাদ করেন, বিচারের সময় আল্লাহ্ ডাক দিয়ে বলবেন, মোহাম্মদ এবং তাঁর উম্মতেরা কোথায়? আরেক বর্ণনায় রয়েছে– তখন বলা হবে, উম্মতে উম্মিয়া এবং তাদের নবী কোথায়? রসুলে পাক স. বলেন, ওই সময় আমি উঠে দাঁড়াবো, আর উম্মতেরা আমার অনুসরণ করবে। তাদের ওজুর অঙ্গগুলো ঝকমক করতে থাকবে। তারা যখন মিজানের দিকে রওনা হবে তখন অন্য উম্মতেরাও দাঁড়িয়ে যাবে। তাদেরকে সরিয়ে আমার উম্মতের জন্য পথ করে দেয়া হবে। আমার উম্মতের মর্যাদা অবলোকন করে অন্য উম্মতেরা বিস্মিত হয়ে বলাবলি করতে থাকবে, শেষ উম্মতেরাতো সকালেই প্রায় নবীদের মতো মর্যাদাশালী।

বিশুদ্ধ সূত্রে বলা হয়েছে যে, সেদিন মিজানে তোলা হবে হত্যা সংক্রান্ত মোকাদ্দমা। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। এ বিষয়টিও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সেদিন সর্বপ্রথম নামাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদিস দু'টোকে এভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে যে, ইবাদত সংক্রান্ত ব্যাপারে নামাজ এবং সামাজিক জীবন সংক্রান্ত ব্যাপারে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে। নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে নামাজ সম্পর্কে এবং সর্বশেষ সিদ্বান্ত দেয়া হবে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে। নামাজের সম্পর্ক ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে এবং রক্তপাতের সম্পর্ক সামাজিকতার সঙ্গে। নামাজের বিষয়টিও সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ, কিন্তু এ বিষযটি বান্দার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের সংশ্লিষ্টতা পারস্পরিক অধিকারের সঙ্গে।

অন্য এক হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের দিন চারটি প্রশ্নের আশংকায় মানুষ ভীতবিহবল হয়ে পড়বে। ভয়ে কাঁপতে থাকবে তারা। প্রথম প্রশ্নটি হবে আয়ুষ্কাল সম্পর্কে। কোন কাজে পৃথিবীর জীবন অতিবাহিত হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। জ্ঞান সম্পর্কে তোলা হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন। বলা হবে অর্জিত এলেম অনুযায়ী কতটুকু আমল করা হয়েছে। সম্পদ সম্পর্কে করা হবে তৃতীয় প্রশ্ন। জানতে চাওয়া হবে, উপার্জন ও ব্যয় কীভাবে করা হয়েছে। শরীর সম্পর্কে ওঠানো হবে চতুর্থ প্রশ্ন। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা কী কী পাপ করা হয়েছিলো তার হিসাব নেয়া হবে। তিরমিজিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ।

অন্য এক হাদিসে এসেছে– কিয়ামতের দিন বান্দার সামনে উপস্থাপন করা হবে তিনটি দপ্তর। একটি দপ্তরে লিখা থাকবে পুণ্যকর্মের বিবরণ। দ্বিতীয়টিতে থাকবে পাপের হিসাব। তৃতীয়টিতে থাকবে ওই সকল নেয়ামতের কথা যা সে পৃথিবীতে ভোগ করেছিলো।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন, পুলসিরাতের সাতটি পর্যায়ে সাত প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কেউ পাড়ি দিতে পারবে না। প্রথম স্থানে প্রশ্ন করা হবে 'লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' কলেমা সম্পর্কে। বিশুদ্ধচিত্তে সে এই কলেমাকে গ্রহণ করেছিলো কিনা তা যাচাই করে দেখা হবে এখানে। বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরাই কেবল এ বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারবে। দ্বিতীয় অবস্থানে প্রশ্ন তোলা হবে নামাজ সম্পর্কে। দেখা হবে, সে সুচারুরূপে নামাজের যথা সম্পাদন নিশ্চিত করেছে কিনা। যদি করে থাকে তবে পার হয়ে যেতে পারবে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা।

তৃতীয় অবস্থানে রোজা, চতুর্থ অবস্থানে জাকাত এবং পঞ্চম অবস্থানে যাচাই করা হবে তার হজ। অজু গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে ষষ্ঠ অবস্থানে। সপ্তম এবং শেষ পর্যায়ে খতিয়ে দেখা হবে হক্কুল ইবাদের (মানুষের অধিকারের) বিষয়টি। বর্ণিত সাতটি বাধা অতিক্রম করা সেদিন কঠিন ব্যাপারই হবে। আলেমগণ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির অধিকারে সত্তরজন নবীর সমতুল্য পুণ্য থেকেও থাকে আর অর্ধদানা পরিমাণ হক্কুল ইবাদ যদি নষ্ট করা হয়, তবে সে হক আদায় না করা পর্যন্ত অর্থাৎ যার হক নষ্ট করা হয়েছে, তাকে প্রসন্ন না করা পর্যন্ত পুলসিরাত পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না। আলেমগণ আরও বলেছেন, একটি শস্যদানাতুল্য হক বিনষ্টির কারণে হকদারকে দিয়ে দিতে হবে সত্তরটি কবুল হওয়া নামাজ। কিয়ামতের দিন হক্কুল ইবাদের বিষয়টি সবাইকে সবচেয়ে বেশী ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। ওই কঠিন দুরবস্থা অতিক্রম করতে প্রয়োজন হবে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ রহমতের। ওই বিশেষ রহমত পেয়ে হকদাররা সন্তুষ্ট হবে এবং হক বিনষ্টকারীরা উদ্ধার পাবে।

সর্বাপেক্ষা বড় পুণ্য কর্ম হচ্ছে– পৃথিবী থেকে বিদায়কালে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ উচ্চারণ করা। হজরত মুআজ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কলেমা তৈয়ব যার জীবনের শেষ উচ্চারণ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ প্রসঙ্গে হজরত বুতাকা রা. কর্তৃক বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিসগুলোও বিদ্যমান। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে– রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার প্রয়োজন পূর্ণ করে, আমি তার সাহায্যার্থে তার হিসাব গ্রহণের সময় মিজানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো। আর পুণ্যের পাল্লা ভারী হলে তো ভালোই, যদি তা না হয় তবে আমি তার জন্য শাফায়াত করবো। মাশায়েখে এজাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখতে পেয়ে এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো আল্লাহ্পাক তোমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছেন? সে বলেছিলো, আমার পুণ্য কর্মগুলো পাপের সঙ্গে ওজন করতে যেয়ে দেখা গেলো পাপের পাল্লাটি ভারী। হঠাৎ দেখলাম একটি পুটলী এসে পুণ্যের পাল্লায় পড়লো। সাথে সাথে সে পাল্লাটি ভারী হয়ে গেলো। ওই পুটলিটি খুলে দেখলাম– তার মধ্যে রয়েছে এক মুষ্ঠি মাটি– দাফনের সময় যে মাটিটুকু আমি আমার এক মুসলমান ভাইয়ের কবরে স্থাপন করেছিলাম।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে এ রকম অনেক বিস্ময়কর বর্ণনা রয়েছে। পাপ-পুণ্য ওজন করার সময় যখন দেখা যাবে উভয় পাল্লাই সমান ভারী তখন তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাত কিংবা জাহান্নাম কোনোটিরই উপযোগী নও। এরপর এক ফেরেশতা একটি কাগজের টুকরা এনে গোনাহের পাল্লায় রাখবে। পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়ার ফলে তাঁরা 'উহু' শব্দ করেছিলেন– কাগজের টুকরাতে লেখা থাকবে সেই কথাটি। আর ওই কাগজের টুকরার কারণেই তার পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং তাকে নিয়ে যাওয়া হবে দোজখের দিকে। সে বলবে, আমাকে একবার আল্লাহ্‌র সমীপবর্তী করা হোক।

আল্লাহ্ বলবেন, হে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, কি বলতে চাও তুমি? সে বলবে, হে আমার আল্লাহ্! আমি পিতার অবাধ্য একথা ঠিক কিন্তু আমি যে দেখতে পেলাম তাকেও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন আমি এ মর্মে নিবেদন করতে চাই যে, আমার পিতাকে রেহাই দিয়ে আমাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হোক। আল্লাহ্ মৃদু হেসে (যে হাসি তাঁর অতুলনীয় সত্তার উপযোগী– যা ধারণাতীত) বলবেন, হে আমার বান্দা! পৃথিবীতে তুমি তোমার পিতার নাফরমান ছিলে। আজ প্রকাশ করছো পিতৃপ্রেম। ঠিক আছে, তুমি তোমার পিতার হাত ধরে পিতাপুত্র উভয়ে জান্নাতের দিকে চলে যাও।

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের মাঠে এক ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের দুই পাল্লাই সমান হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, অনুসন্ধান করে দেখো কেউ তোমাকে একটি পুণ্য দিতে রাজী হয় কিনা। একটি পুণ্য পেলে পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং তুমি বেহেশতে যেতে পারবে। সেই লোকটি অন্যের কাছে একটি পুণ্য অনুসন্ধান করবে। সকলেই বলবে, এখন একটি পুণ্যই অনেক। শেষে একজনের সঙ্গে দেখা হবে– সেই লোকটি বলবে, আমার আমল নামায় একটি মাত্র নেকি রয়েছে। সেই নেকিটি দিয়েতো আর আমার কিছু হবে না, তাই আমি তা তোমাকেই দিয়ে দিলাম। যার মাত্র একটি নেকি প্রয়োজন, সেই লোকটি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার সকাশে হাজির হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বজ্ঞ, তা সত্ত্বেও তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করবেন, কি অবস্থা তোমার? সে বলবে, তার একটি পুণ্য লাভের কাহিনীটি। আল্লাহ্‌পাক তখন ওই লোকটিকে ডেকে আনবেন, যে একটি নেকি দিয়ে সাহায্য করেছিলো। বলবেন, 'হে আমার বান্দা! তোমার দয়ার চেয়ে আমার দয়া অনেক প্রশস্ত। যাও তুমি তোমার এই ভাইয়ের হাত ধরে বেহেশতে প্রবেশ করো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আখেরাতের ওজনের পাল্লার অবস্থা দুনিয়ার ওজনের পাল্লার বিপরীত। যে পাল্লাটি নিচে নেমে আসে পৃথিবীতে সে পাল্লাটিকে ভারী ধরা হয়। আর যে পাল্লাটি উপরে ওঠে সে পাল্লাটিকে ধরা হয় হালকা। কিন্তু আখেরাতে মিজানের যে পাল্লাটি উপরের দিকে উঠে যাবে সে পাল্লাটিকে ধরা হবে

ভারী। আর যেটি নিচে ঝুলে পড়বে সেটি গণ্য হবে হালকা বলে। এ অভিমতটি অবশ্য জটিল। কিন্তু এ মতের প্রবক্তারা বলে থাকেন, পুণ্যের সম্পর্ক আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে তাই পুণ্যের পাল্লাটি উপরে উঠে যায়। অর্থাৎ বান্দার নেক আমল উপরের দিকে ওঠানো হয়। তাই কালাম মজীদে বলা হয়েছে– ফা আম্মা মান ছাকুলাত মা ওয়াজিনুহু ফা হুয়া ফি ঈশাতির রদ্বিয়াহ্ (যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে আনন্দঘন পরিবেশে জীবন যাপন করবে)।

তবে স্মর্তব্য যে, এ আয়াতটির মাধ্যমে পুণ্যের পাল্লা উপরের দিকে ওঠানোর ব্যাপারটি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করা যায় না। তাই বিরোধী মতের প্রবক্তারা তাদের স্বপক্ষে এ আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন– 'যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে আনন্দঘন পরিবেশে জীবন-যাপন করবে।' আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

হজরত হুজায়ফা থেকে বর্ণিত– মিজান পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন হজরত জিব্রাইল। তিনি মানুষের পাপ-পুণ্য হিসাব করবেন। ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করছেন। হিসাব-নিকাশ, সওয়াল-জওয়াব, পাপ-পুণ্যের ওজন– এসবকিছুই অনুষ্ঠিত হবে রসুল করীম স. এর সম্মুখে। অব্যাহতি, ক্ষমা– তাঁর সুপারিশ ও শুভদৃষ্টি অনুসারেই হবে। হিসাব নিকাশের পরে তিনি হাউজে কাওছারের কাছে আসবেন এবং পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন করবেন। এ ঘটনাটি ঘটবে পুলসিরাত অতিক্রম করার পর। হাদিস শরীফে এসেছে– যে ব্যক্তি হাউজে কাওছারের পানি পান করতে পারবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। পানি পানের পর শুরু হবে জান্নাতে প্রবেশের পালা। সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন রসুলে আকরম স.। তাই তিনি এরশাদ করেছেন, আমিই হবো জান্নাতের দরোজায় প্রথম করাঘাতকারী। তাঁর জন্য প্রহরীরা জান্নাতের সকল দরোজা উন্মুক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকবে, যে রকম দাঁড়িয়ে থাকে সম্রাটের সেবকেরা সম্রাটের জন্য।

প্রধান প্রহরী বলবে, আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যেনো আমি আপনার প্রবেশের পূর্বে অন্য কারো জন্য জান্নাতের দরোজা উন্মুক্ত না করি এবং আপনি ছাড়া অন্য কারো সম্মানে যেনো দণ্ডায়মান না হই। বর্ণিত হয়েছে– বেহেশতীরা যখন বেহেশতের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে তখন বলাবলি করতে থাকবে, প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে কার কাছ থেকে? তাঁরা তখন একে একে হজরত আদম, হজরত নূহ, হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত মুসার কাছে যাবেন। তাঁরা সকলেই অনুমতি দানে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। পরিশেষে সবাই সমবেত হবেন রসুলে আকদাস স. সকাশে। তিনি তখন প্রথম প্রবেশ করবেন জান্নাতে। তাঁর এই উদ্বোধন হবে অন্য সকলের জন্য প্রবেশের অনুমতি। হজরত ওমর ফারুক থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, সকল নবীদের জন্য আমার প্রবেশের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম। সকল উম্মতের জন্যও হারাম ওই সময় পর্যন্ত, যতোক্ষণ না আমার উম্মতেরা বেহেশতে প্রবেশ করে। বর্ণিত

হয়েছে– রসুলপাক স. বলেছেন, মেরাজের রাতে হজরত জিব্‌রাইল আমার হাত ধরে জান্নাতের সকলের স্থান দেখিয়েছেন। একস্থানে এসে তিনি বললেন, এটা হচ্ছে আপনার উম্মতের জন্য বেহেশতের প্রবেশপথ। এ কথা শুনে হজরত আবু বকর সিদ্দীক নিবেদন করলেন, আমি যদি আপনার সঙ্গে থাকতাম তবে প্রবেশ পথটি দেখে ধন্য হতাম। রসুলে আকরম স. বললেন, হে আবু বকর জেনে নাও, আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী।

এ বর্ণনাটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য বেহেশতে প্রবেশের বিশেষ তোরণ রয়েছে। সেই তোরণ দিয়ে কেবল তারাই প্রবেশ করতে পারবে। আরও বিশেষ বিশেষ দরোজা থাকবে সেখানে। নামাজীদের জন্য থাকবে 'বাবুস সালাত' মুজাহিদদের জন্য থাকবে 'বাবুজ জেহাদ', রোজাদারদের জন্য 'বাবুর রইয়ান'। আর যে দরোজা দিয়ে রসুলে করীম স. প্রবেশ করবেন তার নাম 'বাবুর রহমত' বা বাবুত্তাওয়া।

রসুল পাক স. বলেছেন, যখন আমি বেহেশতে প্রবেশ করবো তখন দেখতে পাবো, এক রমণী আমা অপেক্ষা অগ্রগামিনী। আমি তাকে বলবো, একি করছো তুমি? রমণীটি বলবে, আমি পৃথিবীতে বৈধব্যবৃত মেনে নিয়ে এতিম সন্তানদের লালন করেছি। এতিমদের কথা ভেবে আমি আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইনি। সবরের উপরে অতিবাহিত হয়েছে আমার সুদীর্ঘ বৈধব্য জীবন। এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবুল ইয়া'লা। হাদিসটির বর্ণনাকারীরা ক্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত। আল মুনজেরী বলেছেন, ইনশাআল্লাহ্ এ হাদিসের সনদ উত্তম। তবে বিধবা রমণীটির অগ্রগামিনী হওয়ার তাৎপর্য এই যে, বেহেশতে যাওয়ার জন্য মহিলাটি আগেভাগে যাত্রা শুরু করবে। এ রকমও হতে পারে যে, মহিলাটি থাকবে রসুল পাক স. এর পশ্চাতে এবং অন্যাপেক্ষা অগ্রগামিনী হয়ে ওই হাদিসটির প্রমাণ হয়ে যাবে যেখানে বলা হয়েছে, আমি এবং এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে অবস্থান করবো এভাবে– একথা বলে তিনি স. তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী একত্র করে দেখালেন। আলেমগণ বলেছেন, সকল বিশ্বাসীদের জন্য এই হাদিসটির স্মরণ ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

ওসিলা, ফযীলা এবং দরজায়ে রফীয়া

হাশরের ময়দানে রসুলে পাক স. লাভ করবেন ওসিলা, ফযীলা ও দরজায়ে রফীয়া। আজানের দোয়ায় উল্লেখিত হয়েছে– হে আল্লাহ্! আপনি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে ওসিলা, ফযীলা ও দরজায় রফীয়া প্রদান করুন। মুসলিম শরীফে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে– নবীপাক স. বলেছেন, তোমরা আজান শুনলে মোয়াজ্জিন যে কথাগুলো বলবে সেগুলো বলো।

তারপর আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্তায়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। দরূদ পাঠের পর তোমরা আমার জন্য ওসিলা প্রার্থনা করো। ওসিলা জান্নাতের এমন একটি মাকাম যেখানে পৌঁছতে পারবে একজন, দ্বিতীয় কারো প্রবেশের অধিকার সেখানে নেই। আমি দৃঢ় আশা রাখি– আমিই সেই একক প্রবশাধিকারী। সুতরাং যে আমার জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট ওসিলা প্রার্থনা করবে, তার উপর অবতীর্ণ হবে আমার শাফায়াত।

আলেমগণ বলেছেন, জান্নাতের একটি সুউচ্চ স্থানের নাম ওসিলা আর সে স্থানটি রসুলে আকরম স. এর জন্যই নির্ধারিত। ওই স্থানটিই হবে তাঁর আবাস। ওই আবাসস্থলটি আরশের সর্বাপেক্ষা নিকটে। আলেমগণ আরও বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা পর্যন্ত উপনীত হওয়ার জন্য ওসিলা হচ্ছে একটি মাধ্যম। ওসিলাকে 'মানযেলায়ে উলইয়া' বলা হয়া। হাদিস শরীফে এ রকম বলা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্তায়ালা পর্যন্ত উপনীত হওয়ার অর্থ তার সান্নিধ্য লাভের মাকামে উপনীত হওয়া। প্রকৃত মর্ম এই যে, ওসিলা এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে জান্নাতে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়। আর একথা তো সর্বাবাদী সম্মত যে, উবুদিয়াতের দিক দিয়ে রসুল আকরম স. ই সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মারেফত লাভের দিক দিয়ে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আরেফ (আল্লাহ্র পরিচয় লাভকারী)। আল্লাহ্কে ভয় করার দিক দিয়েও তিনিই সর্বাগ্রগামী। আর মহব্বতে ইলাহীর দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মাহবুব (প্রেমাস্পদ)। সুতরাং মর্যাদা ও অবস্থান লাভের দিক দিয়ে নিকটতম ও শ্রেষ্ঠতম স্তরটি তিনিই লাভ করবেন। জান্নাতের মধ্যে তিনিই হবেন অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী।

বান্দা মিসকীন (গ্রন্থকার) বলেছেন, ওসিলা শব্দের আভিধানিক অর্থ সবব বা কারণ এবং হস্ত প্রসারণ। কোনো উপকরণের মাধ্যমে কোনোকিছুর দিকে যাওয়াকে বলা হয় ওসল। বান্দা যখন অঙ্গীকারের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করে তখন বলা হয়, ওসিলা ইলাল্লাহ্ অথবা তাওসিলা ইলাল্লাহ। সাররাহ গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। কেননা রসুল পাক স. এর দ্বারা ওসিলা করেছেন, আল্লাতায়ালার নৈকট্য কামনা করেছেন এবং শাফায়াতের দরোজা উন্মুক্ত করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। হাদিস শরীফেও এর ইঙ্গিত রয়েছে। শাফায়াতের হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, বেহেশত গমনের পর তিনি ওসিলা নামক মাকাম প্রাপ্ত হবেন। এক বর্ণনামতে আরশের নিচে এবং অন্য এক বর্ণনামতে আল্লাহ্পাকের সকাশে তিনি উক্ত মাকামটি প্রাপ্ত হবেন। ওসিলা প্রদানের ব্যাপারে উম্মতের প্রতি প্রার্থনার হুকুম দেয়া হয়েছে এজন্য– যাতে করে প্রার্থনাকারীরা অগণিত সওয়াব, নৈকট্য ও বিশ্বাসের শক্তি লাভের সুযোগ পায় যেনো আল্লাহ্পাকের সন্তোষ ও রসুল আকরম স. এর শাফায়াত লাভে ধন্য হয়। রসুল পাক স. এর এই অনন্য মর্যাদা লাভ

কারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর এই মাকাম লাভের জন্য তাঁর উম্মতগণের প্রার্থনাও উম্মতের পরিত্রাণপ্রাপ্তির কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ। যাঁরা রাসুলপাক স. এর পবিত্র হস্ত স্পর্শ করে ঈমান ও হেদায়েত লাভ করেছেন, তাঁদের ওসিলা সম্পর্কিত প্রার্থনা অন্যান্য উম্মতের প্রতিও কার্যকর হবে– এ রকম মন্তব্য করেছেন মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা। তবে পূর্বোক্ত উক্তিটিই সঠিক। কেননা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীবের জন্য যে সকল কামালাত নির্ধারণ করেছেন এবং যে সকল মর্যাদা দানের অঙ্গীকার করেছেন, সেগুলো উম্মতের প্রার্থনার প্রতি নির্ভরশীল নয়। তাঁর জন্য প্রার্থনার বরকত লাভ করবে উম্মতেরাই। যেমন তাঁর প্রতি দরূদ পাঠকারীরা লাভ করে দশটি রহমত। ওসিলার জন্য প্রার্থনার বিষয়টিও এ রকম।

ওসিলার পরে এসেছে ফযীলার কথা। ফযীলা যাচনা করার মধ্যেও সৃষ্টি কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভের নিবেদন করা হয়। এ রকমও হতে পারে যে, ওসিলার মতো ফযীলাও একটি মাকাম। অথবা ওসিলা ও ফযীলা একটি মিলিত মাকামের নাম। দরজায়ে রফীয়াকেও এর সঙ্গে সম্মিলিত করতে হবে। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে– নবী করীম স. বলেছেন, ওসিলার মাকামের উপরে আর কোনো মাকাম নেই। সুতরাং তোমরা আমার জন্য ওসিলা প্রার্থী হও। ইমাম আহমদ তাঁর মসনদ গ্রন্থে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত আলী থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন– রসুল করীম স. এরশাদ করেন, তোমরা দোয়ার সময় আমার জন্য ওসীলা লাভের দোয়া করো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ওসিলার মাকামে আপনার সঙ্গে থাকবেন কে? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসেন। আবু হাতেম বলেছেন, হজরত আলী মুরতজা কুফার মসজিদে বক্তৃতা দানের সময় ঘোষণা করেছেন, হে মনুষ্য সমাজ! জেনে রাখো জান্নাতে রয়েছে শাদা ও হলুদ রঙের দুটি মোতি। শাদা রঙের মোতিটি প্রকৃতপক্ষে একটি বালাখানা আর সেটাই মাকামে মাহমুদ (প্রশংসিত মাকাম)। ওই বালাখানায় রয়েছে সত্তর হাজার জানালা। এক জানালা থেকে অপর জানালার দূরত্ব তিন মাইল। ওই মাকামটির আরেক নাম ওসিলা। মাকামটি রসুল আকরম স. এবং তাঁর আহলে বাইতের জন্য নির্ধারিত। হলুদ বর্ণের মোতিটি হচ্ছে আরেকটি বালাখানা। ওই বালাখানাটি নির্ধারণ করা হয়েছে হজরত ইব্রাহিম এবং তাঁর আহলে বাইতের জন্য।

"ওয়ালা সাওফা ইউ'তিকা রব্বুকা ফাতারদ্বা"– এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে হাজার মহল বা বালাখানা থাকবে। প্রতিটি মহল ও তৎসম্পৃক্ত হুর গেলমান নবী পাক স. কে দেয়া হবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, একবার কতিপয় সাহাবী রসুল পাক স. এর প্রতীক্ষায়

ছিলেন। তিনি তাঁর গৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সাহাবীগণকে তিনি বলতে শুনলেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহিম আ.কে খলিল নির্বাচন করেছেন। আরেকজন বললেন, আল্লাহ্পাক মুসা আ.কে করেছেন কলিমুল্লাহ। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আল্লাহ্পাক। তৃতীয় সাহাবী বললেন, আল্লাহ্পাক হজরত ঈসাকে করেছেন রূহুল্লাহ। চতুর্থজন বললেন, আর হজরত আদম হচ্ছেন সফিউল্লাহ। রসুলপাক স. বললেন, তোমাদের আলোচনা আমি শুনেছি। তোমরা যা যা বলেছো সবই ঠিক। কিন্তু আমি হাবিবুল্লাহ। এ কথার মধ্যে অহংকার মাত্র নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার নিশানবাহী হবো আমি। আমার একথা দম্ভপ্রবণতা থেকে মুক্ত। আমিই প্রথম শাফায়াতকারী। আর আমার শাফায়াত গৃহীতও হবে। এ কথা গৌরবমুক্ত। আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মধ্যে সর্বাধিক পবিত্র ও সম্মানিত। দর্পপ্রকাশ ও উক্তির উদ্দেশ্য নয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। এ হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায় খল্লাত (বন্ধুত্ব) নির্ধারিত হয়েছে হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে। আর মহব্বত নির্ধারিত রয়েছে রসুল আকরম স. এর সঙ্গে। কিন্তু অন্য এক হাদিস দ্বারা জানা যায়, রসুল আকরম স.ও খলিলুল্লাহ (আল্লাহ্র বন্ধু)। আর এ বন্ধুত্ব হজরত ইব্রাহিমের বন্ধুত্বের তুলনায় অধিকতর পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। তদুপরি রয়েছে মহব্বতের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাচুর্য।

এক হাদিসে এসেছে– আমি যদি আমার প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু নির্বাচন করতাম তবে আবু বকরকেই করতাম। এ কথায় বুঝা যায় যে, আল্লাহ্তায়ালাই ছিলেন রসুল আকরম স. এর একমাত্র বন্ধু। বন্ধুত্বের সম্পর্ক রযেছে উভয় দিকে। তাই বলা যেতে পারে আল্লাহ্তায়ালা যেমন রসুলপাক স. এর খলিল, তিনিও তেমনি তাঁর খলিল। অন্য এক হাদিসে এসেছে– তোমাদের সাথী (আমি) আল্লাহ্তায়ালার খলিল। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মাধ্যমে। আমি আল্লাহ্র খলিল এবং আমি আল্লাহ্র হাবিব। এ হাদিস দু'টির মাধ্যমে তাঁর সমুন্নত মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায়। খলিল অর্থ প্রিয়জন। হাবিব অর্থ ওই প্রিয়জন, যিনি প্রেমাস্পদত্বের (মাহবুবিয়াতের) মর্যাদায় উন্নীত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে– আল্লাহ্তায়ালা রসুল পাক স. কে বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনি আমার নির্বাচিত খলিল। তওরাত কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে– হে মোহাম্মদ ! আপনি হাবিবুর রহমান (আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ)।

কাযী আবুল ফজল আয়ায মালেকী বলেছেন, খিল্লাত শব্দটির অর্থ নিয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। শব্দটি মূলতঃ খিল্লুন থেকে উদ্ভূত। আর খলিল ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ঐকান্তিকতার সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার দিকে ধাবিত হন। অর্থাৎ তিনি হন একনিষ্ঠ প্রেমিক। কেউ কেউ বলেছেন, খলিল ওই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক ওই নামে ভূষিত হয়েছেন। অনেকেই এই মতটির সমর্থক। কেউ কেউ এরকমও বলেছেন যে, খিল্লাত শব্দটির অর্থ পরিশুদ্ধতা এবং

বিশুদ্ধতা (এখলাস)। হজরত ইব্রাহিমকে একারণেই খলিলুল্লাহ বলা হয় যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ্তায়ালার জন্য খালেস (বিশুদ্ধচিত্ত)। তিনি আল্লাহ্র জন্যই মহব্বত করতেন এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তেই শত্রুতা পোষণ করতেন। আল্লাহ্তায়ালা খিল্লত তাঁকে সাহায্যমণ্ডিত করেছে এবং বানিয়েছে পরবর্তীদের জন্য ইমাম (নেতা)। কেউ কেউ বলেছেন, খলিল শব্দটি এসেছে 'খাল্লাত' থেকে– যার অর্থ অনটন ও বিচ্ছিন্নতা। হজরত ইব্রাহিম তাঁর সকল প্রযোজন পূরণের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন আল্লাহ্পাকের নিকট। যোগ্যতা ও সত্তাকেও তিনি প্রত্যর্পণ করেছিলেন আল্লাহ্র কাছে। নমরুদ বাহিনী যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলো তখন হজরত জিব্রাইল বললেন, আপনি কি সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেন? হজরত ইব্রাহিম বললেন, আপনার পক্ষ থেকে যদি হয়, তবে প্রয়োজন নেই। আবু বকর ইবনে ফুরক বলেছেন, যে ব্যক্তি নিষ্কলুষ প্রেমে নিমজ্জিত এবং প্রেমরহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত তার অবস্থাকে খিল্লত বলে চিহ্নিত করা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, খিল্লত এর প্রকৃত অর্থ মহব্বত। তাছাড়া এ শব্দটি দয়া, স্নেহ, সম্মান ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে "ইহুদি এবং খৃষ্টানেরা বলে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র এবং মাহবুব। হে রসুল! আপনি বলে দিন তবে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে পাপের কারণে শাস্তি দিবেন কেনো?" আল্লাহ্পাক তার মাহবুবগণের জন্য ভুল-ক্রুটির কারণে শাস্তি দান না করা অপরিহার্য করে নিয়েছেন। আপনজন বা পুত্রকে শাস্তি প্রদানের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ প্রেম ও শত্রুতা এক সঙ্গে থাকতে পারে না। হজরত ইব্রাহিম এবং রসুল আকরম স. এর ক্ষেত্রে খলিল নামের ব্যবহার হয়েছে এজন্য যে, তারা ছিলেন পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ, আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং গায়রুল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু) থেকে বিমুখ। আল্লাহ্পাক রসুল করীম স. কে মাধ্যমবিবর্জিত অবস্থায় খফি লতিফাসমূহ দান করলেন। আসরারে ইলাহিয়া (আল্লাহ্ রহস্য) এবং গায়েবী বিষয়সমূহের গুপ্ত রহস্য উন্মোচন করে দিয়ে তাঁর অন্তর্জগতকে মারেফতে পরিপূর্ণ করে দিলেন এবং কলবকে করে দিলেন গায়রুল্লাহর আকর্ষণ থেকে চির পরিশুদ্ধ। তিনি স. হজরত আবু বকর সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে যদি আমি খলিল হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে গ্রহণ করতাম আবু বকরকে। আবু বকর ইবনে ফুরকের মতে এখানে খলিল শব্দটির অর্থ একই, যা এতক্ষণ বর্ণনা করা হলো। তবে হ্যাঁ, হজরত আবু বকর যদি রসুলপাক স. এর খলিল হতেনও, তবুও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কটি বিদ্যমান থাকতো। উপরোক্ত বর্ণনাটি প্রদত্ত হয়েছে কাযী আয়ায কর্তৃক। তিনি আরও বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম এবং রসুলপাক স. এর বেলায় খিল্লত শব্দটি সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁরা দু'জনেই নবুয়তের ও রেসালাতের ফযীলত যৌথভাবে লাভ করেছেন। খিল্লতও লাভ করেছেন যুগ্মভাবে। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের তুলনায় রসুলপাক স. এর খিল্লত অধিকতর মহান ও

শক্তিশালী। নবুয়ত ও রেসালাতের বৈশিষ্ট্য সকল নবী ও রসুলের মধ্যেই বিদ্যমান। তবুও সেই বৈশিষ্ট্যের তারতম্য রয়েছে নিশ্চয়। কোরআন মজীদে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে এভাবে, "ওই সমস্ত রসুল যাদেরকে আমি একজনকে অন্য জনের উপর ফযীলত দান করেছি।"

কাযী আয়ায পুনরায় বলেছেন, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ খিল্লত ও মহব্বতের মধ্যে প্রাধান্য নির্ণয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, উভয়টিই সমমর্যাদাসম্পন্ন। যিনি খলিল তিনিই হাবীব। আর যিনি হাবীব তিনিই খলিল। এতদসত্ত্বেও রসুল আকরম স. কে মহব্বত এবং হজরত ইব্রাহিমকে খিল্লত দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। উভয়কেই স্বতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করার অভিপ্রায়ে এ রকম করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খিল্লাত ও মহব্বত সম অর্থবাহী। এ অভিমতটি যুক্তিসম্মত বলে মেনে নেয়া যায় না। কেননা রসুলে আকরম স. কে যদি খলিল আখ্যায়িত করা হয়, তবে তাঁর বিশেষত্ব আর রইলো কোথায়?

কেউ কেউ বলেছেন, খিল্লতের মর্যাদা মহব্বতের মর্যাদার চেয়ে উন্নত। আমি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম– এ হাদিসটিকে তারা তাদের মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। আবার তিনি স. মহব্বত শব্দটি প্রয়োগ করেছেন হজরত ফাতেমা ও তার সন্তানগণের ক্ষেত্রে, হজরত উসামা ও আরো কয়েকজন সাহাবীর ক্ষেত্রে । তবে অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, মহব্বত খিল্লতের চেয়ে উত্তম। কেননা রসুল পাক স. হজরত ইব্রাহিমের চেয়ে উত্তম। আকৃষ্ট হওয়া, মগ্ন হওয়া এবং প্রেমাস্পদের অনুগত হওয়াই মহব্বতের নিদর্শন। মহব্বত শব্দটির প্রয়োগ মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রয়েছে। মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে, আকৃষ্ট হয় এবং সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রিয়জনের আনুগত্য মেনে নেয়। বিষয়টি স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা এ ধনের আনুগত্যের উপযোগী হওয়া থেকে পবিত্র। আল্লাহ্র মহব্বত বান্দার মহব্বতের মতো নয়। আল্লাহ্র মহব্বতের নিদর্শন বান্দার পুণ্যজীবনের নিশ্চিতি দান, অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া, নৈকট্য লাভের উপকরণ দান করা, তৌফিক দেয়া এবং রহমতের ফয়েজ প্রবাহিত করা। আল্লাহ্র এ মহব্বতের কারণে বান্দার অহমিকা ও আমিত্ব বিলুপ্ত হয়। তখন বান্দা তার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কেবল আল্লাহ্তায়ালাকে অবলোকন করেন। যেমন হাদিস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে– আল্লাহ্তায়ালা বলেন, আমি যখন বান্দাকে মহব্বত করি তখন আমি হয়ে যাই তার কান, যদ্দ্বারা সে শোনে। হই চক্ষু, যা দিয়ে সে দেখে। হই রসনা– যার দ্বারা সে কথা বলে। এ হাদিসটির মাধ্যমে আল্লাহ্র মহব্বত সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা লাভ করা যায়। বুঝে নিতে হবে যে, আকৃষ্টি, মগ্নতা, আনুগত্য– এ সমস্ত থেকে আল্লাহ্তায়ালা পুত-পবিত্র। আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনম্র হওয়া উচিত। পুণ্য কর্মের সঙ্গে বিশুদ্ধচিত্ততার (এখলাসের) সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। দাসসুলভ বিনয় এবং বিশুদ্ধচিত্ততা পরিপূর্ণ

রূপে প্রতিভাসিত ছিলো রসুল পাক স. এর মহান চরিত্র। তাঁর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে জননী আয়েশা বলেছিলেন, রসুল পাক স. এর চরিত্র ছিলো কোরআনের বাস্তবরূপ। আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষে সম্পৃক্ত ছিলো তাঁর সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি সম্পৃক্ত ছিলো আল্লাহ্তায়ালার অপ্রসন্নতার সঙ্গে।

খলিল শব্দের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, খলিলের সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে সমর্পিত। তার বক্তব্য হয় এ রকম– হে আল্লাহ্, আমি নীরবতা অবলম্বন করলে তোমার জন্যই নীরবতা অবলম্বন করবো– কথা বললে, তোমার জন্যই বলবো। তোমার জন্যই থাকবো সদা প্রস্তুত। আমার অভিযাত্রা তোমার জন্যই। তোমার অন্বেষণেই আমার জীবনপাত।

প্রসিদ্ধ হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. ছিলেন খিল্লত ও মহব্বতের সর্বোচ্চ শিখরে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার ওই পবিত্র বাণী উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যেখানে বলা হয়েছে "হে রসুল আপনি বলে দিন। তোমরা যদি আল্লাহ্র মহব্বত চাও, তবে আমার আনুগত্য করো। এ রকম করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকেও ভালোবাসবেন।"

নবম অধ্যায়

মহানবী স. এর প্রতি উম্মতের কর্তব্য

তাঁর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া উম্মতের জন্য ওয়াজিব। তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের যথা বাস্তবায়ন করা বাঞ্ছনীয়। নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাকে মান্য করা, সুন্নতের অনুসারী হওয়া, তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া, সুন্নত মিটিয়ে দেয় এ রকম বেদাত (নতুনত্ব) পরিহার করা এবং তাঁকে মহব্বত করা জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর আনীত শরিয়তের সম্মান করতে হবে। তাঁর আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে এবং তাঁর প্রতি প্রেরণ করতে হবে সালাত ও সালাম। ইতোপূর্বে নবুয়ত ও রেসালতের প্রমাণপঞ্জী বিশুদ্ধ সূত্রে সুসাব্যস্ত হয়েছে। তাই সকল সাব্যস্ত বিষয়ের উপর ইমান আনা ওয়াজিব।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, তোমরা ইমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি এবং ওই নূরের প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। আরও এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি। যাতে তোমরা (হে মানব সম্প্রদায়) আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনয়ন করো। আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেছেন, "হে রসুল আপনি বলে দিন, হে মনুষ্য সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রসুল। আমি প্রেরিত হয়েছি তোমাদের সকলের প্রতি। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল উম্মী নবীর উপর ইমান আনয়ন করো।" বর্ণিত আয়াতসমূহের মূল নির্দেশ হচ্ছে এই যে, রসুল আকরম স. এর উপর ইমান আনা ওয়াজিব। তাঁর রেসালাতকে না মেনে নেয়া পর্যন্ত ইমানের হকিকত পূর্ণত্ব লাভ করবে না, বিশুদ্ধ ইসলাম অর্জিত হবে না।

কোনো কোনো হাদিস শরীফে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"– এ উচ্চারণকে কলেমা বলা হয়েছে। যেখানে এ রকম লিখা রয়েছে সেখানে বুঝতে হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'। কোনো বিষয়কে কখনো কখনো এ রকম সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। প্রথম অংশ উল্লেখ করে বুঝানো হয় সম্পূর্ণ অংশকে। সুতরাং মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সংযোগ ব্যতীত কলেমা পূর্ণ হয়েছে ধরা যেতে পারে না। এ রকমও হতে পারে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে ইসলামের কলেমার নাম বা শিরোনাম। দৃষ্টান্তটি এ রকম– একজন জিজ্ঞেস করলো তুমি কি পড়ছো? সে বললো, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। তার এ কথায় বুঝে নিতে হবে, সে সুরা ফাতেহা অধ্যয়ন করছে। আর যদি সে বলে, আমি আলিফ-লাম পড়ছি, তবে বুঝে নিতে হবে সে অনুশীলন করছে সুরা বাকারা।

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে– রসুল পাক স. বলেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেনো আমি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকি যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং আমার উপর এবং আমি যা এনেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

এখানে কলেমার প্রথম অংশ উল্লেখের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কলেমাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। একথা সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে যে, জমহুরের অভিমত অনুযায়ী রসুল আকরম স. এর নবুয়ত রেসালাত এবং তিনি যা কিছু নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর সবকিছু মান্য করা ও মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করার নামই ইমান। মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল– এ কথাটিরও মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্ত রের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি পূর্ণ ইমানকে প্রকাশ করে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুল করীম স. বলেছেন, আমাকে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।" হাদিসটির অর্থ হচ্ছে এ কলেমা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে এবং মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। আর যে সকল হাদিসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেই কলেমা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সকল স্থানে ইমানের বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করাই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। তাই কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেই বাক্যকে সংক্ষেপ করা হয়েছে। যেমন অন্য এক হাদিসে এসেছে– তারা যখন শাহাদাতের স্বীকৃতি প্রদান করলো, তখন তাদের জীবন ও সম্পদ আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো। তবে তাদের চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণ করবেন আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং। হাদিসে জিব্রাইলের উদ্দেশ্য এটাই যে, ইমানের অংশ দু'টি। একটি হচ্ছে শাহাদাত (মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান) এবং অপরটি হচ্ছে তাসদিক (অন্তরের স্বীকৃতি)। দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ ইমান। তবে শরিয়তের পরিভাষায় আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক সাক্ষ্যের সমন্বিত অবস্থার নাম ইমান। অন্তরের বিশ্বাসই মূল ইমান। এ বিশ্বাসকে মুখে প্রকাশ করা জরুরী কিনা সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– যদি কেউ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" কলেমার প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসী হয়, তবে শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদান ছাড়াই সে মুমিন (বিশ্বাসী) পদবাচ্য হবে। তবে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান উত্তম। এ ব্যাখ্যাটিতে সকলে একমত।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে রয়েছে চারটি অবস্থা–

১. অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে মৌখিক স্বীকৃতি। এ অবস্থাটি ইমানের সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থা।

২. আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতিরেকে কেবল মৌখিক স্বীকৃতি– এ রকম ইমান গ্রহণীয় নয়। বরং এরকম ইমান ইমানই নয়। এ অবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাস (কুফরী)। যারা এ রকম করে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের নিকৃষ্ট স্তর।

৩. কেবল আন্তরিক বিশ্বাস। এ বিষয়টি আবার দু'ধরনের। একটি হচ্ছে একজনের আন্তরিক বিশ্বাস রয়েছে ঠিকই কিন্তু সে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ পায়নি– এ রকম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। এ রকম ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, ওই ব্যক্তি ইমান ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের মত হচ্ছে– অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখে তার স্বীকৃতির সমন্বয়ই হচ্ছে ইমান। কিন্তু এখানে মৌখিক স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। সুতরাং সে ইমানদার পদবাচ্য নয়। তাই ইমানের উপর নয় তার মৃত্যু হয়েছে কুফরীর উপর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওই ব্যক্তি হবে বেহেশতবাসী। যেহেতু নবী করীম স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে যার অন্তঃকরণে অণু পরিমাণ ইমান রয়েছে। এ হাদিসের মাধ্যমে একথাটি পরিষ্কার যে, কেবল আন্তরিক বিশ্বাস গ্রহণীয়। অন্য একটি হাদিসে এসেছে– রসুল পাক স. এক সাহাবীকে প্রশ্ন করেছিলেন– তুমি কি তার বুক চিরে দেখেছিলে (সেখানে ইমান আছে কি না)? আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন "যখন তাদের অন্তঃকরণে ইমান প্রবেশ করবে...." বর্ণিত হাদিস ও আয়াতদৃষ্টে বুঝা যায়, মানুষের হৃদয়ই ইমানের আধার। সুতরাং যে ব্যক্তি কেবল অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে– সে মৌখিক সাক্ষ্যদানের সুযোগ পায়নি বলে মনে করতে হবে। সত্যনিষ্ঠ আলেমগণের মতে ওই ব্যক্তি অবশ্যই ইমানদার। কেবল আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বিতীয় ধরনটি হচ্ছে এই– যেমন কোনো ব্যক্তি বোবা। কথা বলার শক্তি তার নেই। তাই সে মৌখিক স্বীকৃতি না দিতে পারলেও ইমানদার বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই।

৪. ওই ব্যক্তি যে অন্তরে বিশ্বাস রাখে এবং মুখে তা প্রকাশ করার সুযোগও হয়েছে। মৌখিক সাক্ষ্য যে একটি জরুরী বিষয় সে কথাও তার জানা আছে। কিন্তু সে কোনোদিন মুখে তার বিশ্বাসকে প্রকাশ করেনি– এ ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, জীবনে অন্ততঃ একবার মৌখিক সাক্ষ্য দিলেও তাকে মুমিন হিসাবে গণ্য করা যাবে। তবে সে মৌখিক সাক্ষ্য বর্জন করার কারণে গুনাহ্গার হবে। কারণ, মৌখিক স্বীকৃতি দানও এক প্রকারের ইবাদত। সুতরাং এ ইবাদতটি পরিত্যাগ অবশ্যই গোনাহ। তারা আরও বলেছেন, কলবের তাসদিকই (অন্তরের বিশ্বাসই) আসল ইমান। আর মৌখিক স্বীকৃতি ইমানের বাহ্যিক চিহ্ন। এটা ইমানের অংশও নয় এবং ইমান বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তও নয়। আমরা একথা বলি না যে, আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে পুণ্য অর্জিত হবে না। আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। মুখের আমল অথবা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল কেবলই আমল, ইমান নয়।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ ধরনের ব্যক্তির মাধ্যমেই ইমানের বিপরীত কর্মকাণ্ড প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ইমানদারই মনে করতে হবে। আর ওই ব্যক্তি যদি ইমান বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়, তবে আর তাকে ইমানদার বলা যাবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসের বাস্তবতা অনুপস্থিত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মৌখিক স্বীকৃতি না দিলে ইমানদারই হতে পারবে না। কেননা মৌখিক স্বীকৃতি হচ্ছে বান্দার বিশ্বাসের চূড়ান্ত পর্যায় এবং ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মৌখিক প্রকাশের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি তা প্রকাশ না করে তবে তাকে পূর্ণ ইমানদার মনে করা যাবে না। মুখ হচ্ছে মনের প্রতিনিধি। আর একথা মনে রাখতে হবে যে, মুখ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তবে যারা কথা বলতে পারে না, তাদের বিষয়টি স্বতন্ত্র। আলেমগণ বলেছেন, এটাই বিশুদ্ধ মত। আশশিফা গ্রন্থে এ রকম বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহু আ'লাম।

এ রকম লোকও দেখা যায়, যারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী পরিচয় দান করা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীর চিহ্ন বহন করে। পৈতা পরিধান করা, মূর্তিকে সম্মান বা সেজদা করা ইত্যাদি। এ ধরনের নিদর্শন যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে কাফের (অবিশ্বাসী)। এটাই শরিয়তের বিধান। কেউ কেউ বলেছেন, শরিয়তের প্রকাশ্য বিধানানুসারে সে কাফের। তবে সে প্রকাশ্যতঃ কাফের। প্রকৃত অর্থে কাফের নয় (যদি অন্তরে কিঞ্চিত বিশ্বাস থাকে)।

হানাফী মতাবলম্বী ফকিহ্গণ কিছুকিছু কথা ও কাজকে কুফরী বলেছেন। যেমন– গায়রুল্লাহর (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের) কসম করা, মা-বাবার কসম বা অন্য কোনো মানুষের কসম করা। ফেকাহর পুস্তকসমূহে এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক– যেগুলোর মূল প্রতিপাদ্য এই যে, এ ধরনের কথা ও কাজ কুফরীর ধারণাকে স্পষ্ট করে। তবে তা হাকিকী কুফরীকে (প্রকৃত অবিশ্বাসকে) অবশ্যম্ভাবী করে না। তবে এ জাতীয় কথা, কাজ যদি কুফরী করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সে অবশ্যই কাফের। আর যদি সে তার কথা ও কাজের কুফরী বিরোধী ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং নিজেকে ইমানদার বলে প্রমাণ করতে চায়, তবে সে প্রকৃতপক্ষে কাফের হবে না। কিন্তু একথাও ঠিক যে, প্রকাশ্য নিদর্শনের উপরেই বিধান বলবৎ হয়ে থাকে। তাই কুফরীর নিদর্শন দেখা দিলে তাকে কাফের বলেই সাব্যস্ত করতে হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইমানের হ্রাস–বৃদ্ধি

এ বিষয়টি নিয়ে আলেমগণ বিস্তর আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রকম মত পরিদৃষ্ট হওয়ায় ইমান কম-বেশী হওয়ার প্রকৃত অর্থ হবে আমল কম-বেশী হওয়া। কিন্তু যারা ইমান ও আমলকে দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়

বলে জানেন তাদের নিকট হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারটি দুর্বোধ্য। প্রকৃত ইমান কম কিংবা বেশী হওয়া অসম্ভব। কারণ হ্রাসবৃদ্ধি হওয়ার বিষয়টি গাণিতিক। তবে ইমানের পূর্ণতা-অপূর্ণতার ধারণাটিকে গুণগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অর্থাৎ দৃঢ়তা ও দুর্বলতা কিংবা উজ্জ্বলতা ও অনুজ্জ্বলতা– এভাবে কমবেশী বলা যেতে পারে। মূল ইমান কমবেশী হয়েছে এ রকম কথা কিছুতেই বলা যাবে না। ইমান অর্থ অন্তরের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থাকবে অথবা থাকবে না। কিন্তু ক্ষয় হবে বা বৃদ্ধি পাবে, পূর্ণ হবে অথবা অপূর্ণ থাকবে– এ রকম নয়। যারা এ রকম মনে করেন তাদেরকে সতর্ক করে দিতে হবে। কেননা, মোহাদ্দেছগণ ইমানের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এ রকম– অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা (তাসদিক বিল জেনান), মুখে সাক্ষ্য দান করা (একরার বিল লেসান) এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিশ্বাসের অনুকূল আমল করা– এ তিনটি বিষয়ের সমন্বিত অবস্থার নামই ইমান। কেউ কেউ আবার এ সংজ্ঞাটির যথা মূল্যায়ন করতে অনীহ। তারা মোহাদ্দেছগণের এ সংজ্ঞাটির তাৎপর্য অনুভব করতে সক্ষম হননি। তারা সংজ্ঞাটিকে ভুল বলেছেন, কিন্তু এটাই তাদের প্রকৃত ভ্রান্তি। মোহাদ্দেছগণের অভিমতের অর্থ– ইমানের বিদ্যমানতা একই রকম। তবে পুণ্যকর্মের অভাবে ইমান নিষ্প্রভ হয়। পুণ্যকর্মের প্রভাবে হয় উজ্জ্বলতর। ইমাম বোখারী ও অন্য ইমামগণ এরকম বলেছেন। ইমানে কোনো ন্যূনাধিক্য ঘটে না– প্রথম দিকে এ অভিমতটি মান্য করা হতো। যেমন, কাযী আজদুদ্দিন মাওয়াকেফ গ্রন্থে লিখেছেন, প্রকৃত ইমান সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আসলাফ ও মোহাদ্দেছগণ বলেছেন, “আল ইমানু তাসদিক বিল জিনান ওয়া ইকরার বিল লিসান ওয়া আমালু বিল আরকান” সলফে সালেহীনের সময় থেকে এ উক্তিটি প্রসিদ্ধ। এটাই ইমানের পরিপূর্ণ সংজ্ঞা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ অভিমতটিকেই মান্য করে চলেছে। অথচ কেউ কেউ বলে থাকে সলফ ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কথাটি সত্য নয়।

রসুলের আনুগত্য ও অনুসরণ

সাঈয়েদে আলম, নবীয়ে মোকাররম মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উপর ইমান আনা ওয়াজিব। তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণও ওয়াজিব। আনুগত্য অর্থ– ফরজ, ওয়াজিব, ইবাদত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি। অনুসরণ অর্থ– সুন্নত, আদব ও জীবনাদর্শ। আশশিফা রচয়িতা দু’টি পৃথক অনুচ্ছেদে আনুগত্য ও অনুসরণের আলোচনা করেছেন। আর মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা করেছেন, আনুগত্য ও অনুসরণের একক অনুচ্ছেদে।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ করো।' আরও এরশাদ করেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য করো। তাহলে তোমাদেরকে অনুকম্পা করা হবে।' আরও নির্দেশ করেছেন, আল্লাহ্র হুকুমে মানুষ রসুলের আনুগত্য করবে– এ জন্যই আমি তাকে প্রেরণ করেছি। আরও বলেছেন, 'যে রসুলের অনুগত নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্রও অনুগত।' বর্ণিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে এ কথাটিই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলের আনুগত্যকে তাঁর নিজের আনুগত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর এজন্য পুণ্য ও পুরস্কার দানের অঙ্গীকার করেছেন। আর যারা এ নির্দেশের বিরুদ্ধে, তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন শাস্তি। তাই রসুলের নির্দেশ প্রতিপালন করা এবং তার বিরোধিতা বর্জন করা ওয়াজিব। রসুলের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালারই আনুগত্য। এখানে একথাটিও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রসুলের সকল আদেশ-নিষেধ, কথা ও কাজ মাসুম বা পবিত্র। যদি এ রকম না হতো তবে তাঁর আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগত্য হিসেবে গ্রহণ করা হতো না।

সুহাইল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো– "রসুল যা তোমাদেরকে প্রদান করেন তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো"– এ কথার তাৎপর্য কি? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমরা ফারায়েজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র এবং সুন্নতের ক্ষেত্রে রসুলের আনুগত্য করো। এর আরেকটি উত্তর এই– তোমাদের প্রতি যে বিধান আরোপিত হয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্য করো এবং রসুল যা তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছেন সে ব্যাপারে রসুলের অনুগত হও। আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্য হচ্ছে তার প্রতিপালকত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা এবং রসুলের আনুগত্য হচ্ছে, তাঁর নবুয়তের সাক্ষ্য দেয়া। এ আনুগত্যই মহব্বতের প্রমাণ। আর মহব্বতই হচ্ছে মাইয়েত বা সঙ্গতা। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'হে রসুল! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহ্তায়ালাকে বালোবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো। এ রকম করলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।' এ আয়াতকে আয়াতে মহব্বত বলা হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বলেছেন, একদল লোক আল্লাহ্তায়ালার মহব্বতের দাবী করলে এ আয়াতটি নাজিল হয়। এ আয়াতই আল্লাহ্র আনুগত্য ও মহব্বতের দলিল। রসুলের অনুগত হওয়াই আল্লাহ্কে মহব্বত করা। আর এ রকম করলেই কেবল আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ করা যায় (মাহবুব হওয়া যায়)। এভাবেই আল্লাহ্র মাহবুব রসুল স. এর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা সম্ভব। পবিত্র আয়াতটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তোমরা যদি আল্লাহ্তায়ালার বন্ধু হতে চাও তবে আমার অনুসারী হও। যদি হও তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। প্রকৃতকথা এই যে, রসুলের

অনুসরণের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা। রসুলের আনুগত্য ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র ভালোবাসার উত্তরাধিকার লাভ করা যায় না। সুতরাং রসুলানুসরণই ভালোবাসা লাভের কারণ ও শর্ত। এ শর্তটি পাওয়া গেলে পরবর্তীতে লাভ হয় মাহবুবিয়াতের মাকাম। এ মাকাম আগের মাকামের চাইতে অধিক মর্যাদামণ্ডিত। তাই আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, তিনি তোমাদেরকে মাহবুব বানাবেন।

আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'ইমান আনো আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর রসুলের উপর যিনি উম্মী নবী এবং তাঁর আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমরা সিরাতুল মুস্তাক্বীমের প্রতি হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। এ 'সিরাতুল মুস্তাক্বীমই আল্লাহ্' প্রাপ্তির একমাত্র পথ। এ পথ পেতে গেলে যে দুটি বিষয় প্রয়োজন সে দু'টি হচ্ছে– রসুলের প্রতি ইমান এবং তাঁর আনুগত্য (ইত্তেবা)।

ওই সকল লোককে হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে যারা রসুলে করীমকে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর অনুসরণকে অপরিহার্য মনে করে না। তারা বিভ্রান্ত যদিও মূল ইমানের সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিন্ন হয়নি। কথা ও কাজে রসুলের ইত্তেবা বা অনুসরণ আমাদের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'শপথ আপনার প্রতিপালকের! তারা ইমানদার হতে পারবে না যতোক্ষণ না তারা তাদের মতবিরোধের ব্যপারে আপনার দেয়া সমাধান মেনে নেয়।' অর্থাৎ রসুলের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার ব্যাপারে যেনো কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাকে। অন্তরে বাহিরে যেনো এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। এ আয়াতের মাধ্যমে অনুসরণ ও সমর্পণের উচ্চতর মাকামের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বিধান দেয়া হয়েছে, প্রকাশ্যে– গোপনে তার অনুসরণকেই শিরোধার্য করতে হবে। প্রবৃত্তির প্রতিকূলে হলেও। মনে রাখতে হবে তার নির্দেশ প্রতিপালনের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনোই অবকাশ নেই। দোদুল্যমানতার কোনোই সুযোগ নেই। এ মাকামকে বলা হয় মাকামে রেজা ও মাকামে তাসলীম। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, তিনি তাঁকে (হজরত ইব্রাহিমকে) বললেন, সমর্পিত হও। তিনি বললেন, আমি আত্মসমর্পণ করলাম রব্বুল আলামীনের প্রতি। এ আয়াতেও রয়েছে মাকামে তাসলীমের প্রতি ইঙ্গিত।

রসুল করীম স. বলেছেন, তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমার সুন্নত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। ধর্মের মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা। কেননা, অতিরিক্ত সংযোজন হচ্ছে বেদাত আর সকল বেদাতই পথভ্রষ্টতা। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসে অতিরিক্ত একথাটি রয়েছে। পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে প্রবেশ করায়। হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. রুখসতের (সহজসাধ্যতার) সঙ্গে আমল করতেন। কিন্তু কেউ কেউ আজিমতের (দুরুহতার) দিকে ধাবিত হতো। রসুল করীম স. একথা জানতে পেরে আল্লাহ্‌পাকের প্রশস্তি বর্ণনান্তে ঘোষণা করলেন, ওই সম্প্রদায়ের কী হলো

যে, তারা এমন আদর্শ পরিহার করে চলেছে যা আমি গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম। রেজায়ে মাওলা (প্রভুর প্রসন্নতা) কি তা তাদের চেয়ে আমি ভালো জানি। আর আমি তাদের চাইতে আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করি। অর্থাৎ উক্ত জ্ঞান ও ভয় থাকা সত্ত্বেও আমি সহজসাধ্যতার উপরে আমল করে থাকি। উত্তমরূপে অবগত হও যে, এটাই সত্য। এটাই হেকমতের চাহিদা। এ রুখসতের মধ্যে রয়েছে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ। অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌পাক যেমন আজিমত পছন্দ করেন, তেমনি পছন্দ করেন রুখসতকেও। কিন্তু কোনো কোনো সময় রুখসতই অধিক পছন্দনীয় হয়। অন্য এক হাদিসে এসেছে– আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করি এবং সাবদানতা (তাকওয়া) অবলম্বন করি। তৎসত্ত্বেও আমি রোজা রাখি। আবার ইফতারও করি। নামাজ পড়ি। আবার নিদ্রামগ্নও হই। স্ত্রীর সঙ্গেও মিলিত হই। যে আমার সুন্নত প্রতিপালনে বিমুখ সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। রসুল পাক স. আরও বলেছেন, আমার সুন্নতসম্মত অল্প আমলও উত্তম। বেদাতের অধিক আমলও সুন্নতের অল্প আমলের তুলনায় কিছুই নয়।

বেদাতের বিবরণ

রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, ফেৎনা ফাসাদের সময় যে আমার একটি সুন্নতকে প্রতিষ্ঠিত করবে, সে একশত শহীদের সওয়াব পাবে। আরেক হাদিসে এসেছে, সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা বেদাত আবিষ্কার করার চেয়ে উত্তম (যদিও সেটা বেদাতে হাসানা হয়)। যেমন– শৌচাগারে যাওয়া আসার সময় সুন্নত নিয়ম প্রতিপালন করা, দ্বিপ্রহরে আহারের পর কাইলুলা করা (সামান্য নিদ্রা বা বিশ্রাম করা)। এ ধরনের সুন্নত প্রতিপালন করা মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা নির্মাণ করার চাইতে উত্তম (কারণ মাদ্রাসা ও মুসাফিরখানা নির্মাণ করা বেদাতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত)। আর যে সকল বেদাত সুন্নতকে পরিবর্তন বা স্থানচ্যুত করে দেয় সে সকল বেদাত সম্পূর্ণতঃই পরিত্যাজ্য। যে সকল বেদাত সুন্নতকে স্থানচ্যুত করে না বরং সুন্নত প্রতিষ্ঠায় সহায়ক বলে বিবেচিত হয়, তাকে বলে বেদাতে হাসানা। এ ধরনের বেদাত মুসলেহাত ও হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতে জায়েয।

বেদাতের প্রকার

আলেমগণ বলেন, কোনোকোনো বেদাত পালন করা ওয়াজিব। যেমন– আরবীভাষা ও ব্যাকরণ (নাহু ও সরফ) শিক্ষা করা ওয়াজিব। এ ধরনের আরও কিছু জ্ঞান শিক্ষা করা ওয়াজিব যা নবুয়তের জামানায় ছিলো না। কোনো কোনো বেদাত মোস্তাহাব। যেমন– মাদ্রাসা, মুসাফির খানা নির্মাণ করা, কল্যাণজনক

কাজের জন্য ভবন, অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণ করা। কোনো কোনো বেদাত আবার মোবাহ। যেমন– উদরপূর্তি করে আহার করা। এ ছাড়া অন্য সকল বেদাত মাকরূহ এবং হারাম। অধিক বেদাত পালন করার চেয়ে অল্প সুন্নত প্রতিপালন করা উত্তম। বেদাত উপকারী হলেও সুন্নতের সমতুল্য নয়।

সুন্নত প্রতিপালন সম্পর্কিত একটি ঘটনা

তখন খলিফা ছিলেন হজরত ওমর বিন আবদুল আজীজ র.। তিনি তাঁর এক আঞ্চলিক শাসনকর্তা থেকে একটি পত্র পেলেন। ওই শাসনকর্তা তার পত্রে লিখেছেন, এ অঞ্চলে চোরের উৎপাত খুব বেশী। সুতরাং সন্দেহবাজনদেরকে কি গ্রেফতার করা যাবে? নাকি দলিল প্রমাণ সাপেক্ষে সুন্নতের নীতি অনুসারে গ্রেফতার করতে হবে? ওই পত্রের উত্তরে খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজীজ লিখেছেন, সুন্নতের নীতি প্রতিপালন করতে হবে। প্রত্যক্ষ দলিল প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। সুন্নত প্রতিপালন করতে গিয়ে যদি বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নাও আসে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরং সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে এ সুন্নতের বরকতেই আল্লাহ্তায়ালা জাতির প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করবেন।

হজরত ওমর ফারুক রা. 'হজরে আসওয়াদকে' লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম আমি জানি তুমি একটি নিরেট পাথর বই কিছু নও। কারও উপকার কিংবা ক্ষতি করার সাধ্য তোমার নেই। কিন্তু আমি দেখেছি আল্লাহ্র রসুল তোমাকে চুম্বন করেছেন। তাই অবশ্যই আমি তোমাকে চুম্বন করবো। তিনি স. যদি এরূপ না করতেন তবে আমিও এরূপ করতাম না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর উষ্ট্রারোহী অবস্থায় তাঁর উটকে সেই দিকে ফেরাতেন যেদিকে উট ফেরাতেন রসুল আকরম স.। লোকেরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, এ রকম করা সুন্নত।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর একবার অজু করলেন। কাছেই ছিলো একটি গাছ। তিনি অজু সমাপনের পর অবশিষ্ট পানি ঢেলে দিলেন ওই গাছের গোড়ায়। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, রসুল করীম স. এরকম করতেন। وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে রসুল আকরম স. এর অনুসরণই আমলে সালেহ।

সুহাইল তসতরী বলেছেন, আমাদের মাজহাবের মূলনীতি তিনটি– ১. রসুলের স্বভাব ও কার্যাবলী অনুসরণ ২. হালাল রুজী ৩. সকল আমলের মূলে বিশুদ্ধ নিয়ত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, একবার একদল লোক উলঙ্গ হয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করলো। কিন্তু আমি এ রকম করলাম না। আমি রসুল স. এর ওই হাদিসের উপর আমল

করলাম– যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখবে সে যেনো উলঙ্গ হয়ে গোসলখানায় প্রবেশ না করে। গোসল করে যেনো লুঙ্গি পরিধান অবস্থায়। সে রাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম কেউ যেনো বলছে– হে আহমদ! সুসংবাদ শোনো। এই একটি সুন্নত প্রতিপালনের জন্য আল্লাহ্পাক তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোমাকে ইমাম বানানো হবে। একদল মানুষ তোমার অনুসরণ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? জবাব এলো, আমি জিব্রাইল।

নবী পাক স. এর দরবারের আদব

তাঁর দরবারের আদব সম্পর্কে কোরআন মজীদে অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে "তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনো এবং রসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।" আরও এরশাদ হয়েছে– "হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসুল অপেক্ষা অগ্রগামী হয়ো না"। আরও নির্দেশ এসেছে, "হে বিশ্বাসীরা! রসুল স. এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উচ্চ করো না।" আরও বলা হয়েছে– "তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাকো তাঁকে সেভাবে ডেকোনা।"

উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে তাঁর প্রতি যথাসম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁর কথার উপরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি কথা বললে পূর্ণ অভিনিবেশসহ তা শুনতে হবে। তাঁর কথার উপর কথা বলা যাবে না। তাঁকে উপেক্ষা করে কোনো ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করা যাবে না। সে কাজ যতোই গুরুত্ববহ বলে মনে করা হোকনা কেনো। আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বাসীদেরকে ভয় প্রদর্শনের নিমিত্তে এরশাদ করেন– আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা শ্রেষ্ঠ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। কাযী আয়ায বলেছেন, এভাবে বিভিন্ন নির্দেশের মাধ্যমে দরবারে রসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় উল্লেখিত হয়েছে– দরবারে রসুলের প্রতি একটি অন্যতম আদব হচ্ছে– নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা এবং অনুমতির ক্ষেত্রে অতি উৎসাহী অথবা অতি কৌতূহলী হওয়া যাবে না। নীরবে নির্দেশের প্রতীক্ষা করাই আদব। এ আদব কিয়ামত পর্যন্ত রক্ষা করে যেতে হবে। সুতরাং তাঁর নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতিসমূহকে যেমন তাঁর পৃথিবীর জীবনে মান্য করা হতো, তেমনি মান্য করতে হবে তাঁর মহাতিরোধানের পরেও। আদব সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেছেন– কোনো কিছুকেই রসুল স. এর উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। কেবল আল্লাহ্তায়ালার সরাসরি নির্দেশই অধিক প্রাধান্য লাভের উপযোগী। জুহাক

বলেছেন, রসুল স. এর হুকুমের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো হুকুম সংযুক্ত করা যাবে না। আলেমগণ বলেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কর্তৃক প্রদর্শিত আদবের প্রতি উম্মতের লক্ষ্য রাখা উচিত। তিনি রসুল স. এর অনুমতি সপেক্ষে নামাজের ইমাম হয়ে নামাজ শুরু করেছিলেন, তখন রসুল স. এর আগমন ঘটলে সাথে সাথে পিছনে চলে আসতে শুরু করেছিলেন– এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, আবু কোহাফার পুত্রের এ রকম অধিকার নেই যে, সে রসুল স. এর অগ্রবর্তী হবে। তিনিই হয়েছিলেন পরবর্তীতে রসুল স. এর স্থলাভিষিক্ত। তিনি আদবের যে স্তরে পৌঁছেছিলেন, অন্য কেউই সে স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হননি।

দরবারে রসুলের আরেকটি আদব হচ্ছে এই– সেখানে তাঁর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অন্য কারো কণ্ঠস্বর উচ্চ হতে পারবে না। মানুষেরা যেমন একে অপরকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করে। অথবা একে অপরকে নাম ধরে ডাক দেয়, রসুলের দরবারে সে রকম করা নিষিদ্ধ। তাঁকে কিছু বলতে হলে বিনয় ও নম্রতাসহ অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে হবে– ইয়া রসুলাল্লাহ অথবা ইয়া নবী আল্লাহ্ (হে আল্লাহ্র রসুল অথবা হে আল্লাহ্র নবী)। বনী তামিম অথবা অন্য এক গোত্র রসুল স. এর গৃহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতো, হে মোহাম্মদ! বাইরে আসুন। এভাবে ডাকাডাকি শুরু করতো তারা। আল্লাহ্পাক তাঁর আয়াতে এহেন অসুন্দর আচরণের নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিবোধ। কেউ কেউ বলেছেন, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা নিজেদের কণ্ঠস্বর উচ্চ কোরো না– এ নির্দেশটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক ও হজরত ওমরের ওই বিতণ্ডাকে লক্ষ্য করে যখন তাঁরা একবার রসুলের দরবারে কিঞ্চিত উচ্চস্বরে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতটি নাজিল হয়েছিলো হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস সম্পর্কে। তিনি ছিলেন বধির। আর তার কণ্ঠস্বরও ছিলো অতুচ্ছ। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি দরবারে রসুলের আদব ভঙ্গের আশংকায় নিজের বাড়িতেই বসে থাকতেন। রসুল পাক স. একথা জানতে পেরে তাঁকে তাঁর গৃহ থেকে ডেকে এনেছিলেন এবং তাঁকে দিয়েছিলেন শাহাদাত এর সুসংবাদ। পরে ইয়ামামার যুদ্ধে হজরত ছাবেত শহীদ হয়েছিলেন। বর্ণিত হয়েছে, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে হজরত আবু বকর বলেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আল্লাহ্র কসম, এখন থেকে আমি আপনার পবিত্র দরবারে ওইভাবে কথা বলবো যেভাবে কানাকানি করা হয়। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত ওমর এমতো নিম্নকণ্ঠ হয়েছিলেন যে, তার কথা বুঝতে হলে রসুল স. কেও পুনরায় জিজ্ঞেস করতে হতো। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় যারা রসুলের সম্মুখে নিম্নকণ্ঠ হয় তারা ওই সকল লোক যাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ্তায়ালা তাকওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহাপ্রতিদান।'

তদানীন্তন খলিফার সঙ্গে ইমাম মালেকের বিতর্ক

মসজিদে নববীতে খলিফা আবু জাফরের সঙ্গে ইমাম মালেকের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ইমাম মালেক খলিফাকে বলেছিলেন, হে আমিরুল মুমেনিন! আপনার কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী করুন। কারণ, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, হে বিশ্বাসীগণ! নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজকে উচ্চ কোরো না। আরও এরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় যারা রসুল স. এর সম্মুখে তাদের কণ্টস্বরকে নিম্নগামী করে.......।'

আরও বলেছেন, 'যারা আহবান জানায় প্রকোষ্ঠের বাইরে থেকে....।' ইমাম মালেক পুনরায় বললেন, ইন্তেকালের আগে রসুল স. কে যেরকম সম্মান প্রদর্শন করতে হতো এখনো সেরকম সম্মান করতে হবে। এ কথা শুনে খলিফা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং কেঁদে ফেললেন। এরপর বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমাকে বলুন, দোয়া করার সময় আমি কি কেবলামুখী হবো না রসুলমুখী হবো? ইমাম মালেক বললেন, আপনি রসুলমুখী হবেন না কেনো? কিয়ামতের দিন তিনি আপনার, এমনকি আপনার পিতা হজরত আদমের ওসিলা হবেন। রসুল স. এর রওজা শরীফের সামনে গিয়ে তাঁর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করুন। কেননা আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, তারা যদি আত্মঅত্যাচার করার পর আল্লাহ্র ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আগমন করে এবং আপনি যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে তারা দেখতে পাবে আল্লাহ্পাক ক্ষমাপরবশ ও দয়ালু।'

দরবারে নববীর অন্যতম একটি আদব হচ্ছে– তাঁর পবিত্র বাণীর প্রতি সন্দেহ করা যাবে না। বিরুদ্ধ চিন্তাতো দূরের কথা, পবিত্র বাণীর সঙ্গে নিজস্ব ব্যাখ্যা ও অনুমানকেও সংযুক্ত করা যাবে না। ব্যাখ্যা হতে হবে সম্পূর্ণতঃই তাঁর মতের অনুগামী। যুক্তিবিদ ও দার্শনিকদের অহেতুক জটিল, অতি বা অপব্যাখ্যা নিষিদ্ধ। তিনি স. বলেছেন, যে সকল নির্দেশ নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন– তা বুদ্ধির অনুকূল হওয়া জরুরী নয়। প্রত্যাদেশকে বুদ্ধির অনুগামী করা চরম ধৃষ্টতা। অবশ্য মোতাশাবেহ (রহস্যপূর্ণ) বিষয়কে মোহকাম (স্পষ্ট) বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল করার সুযোগ রয়েছে– যদি তা সুসাব্যস্ত ও শরিয়তসম্মত হয়। এ রকম সমন্বয় সাধনের সুযোগ না থাকলে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। এ সকল ক্ষেত্রে সলফে সালেহীনের মাযহাবকে স্বীকার করতে হবে। তাফসীর ও হাদিসের কিতাবে এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। তাফসীরে বায়যাবী ও অন্যান্য গ্রন্থে এ প্রসেঙ্গ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সুতরাং এখানে এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিস্প্রয়োজন।

দরবারে রসুলের আরেকটি আদব তৌহিদে ইলাহী (আল্লাহ্র এককত্ত্ব) সম্পর্কিত। আলেমগণ বলেন, বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে দু'টি তৌহিদ যা মান্য না করা পর্যন্ত আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ্

পাকের সন্তোষ অর্জন করতে হলেও দু'টি তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। একটি তৌহিদ হচ্ছে– তৌহিদে মুরসীল (রসুল প্রেরণকারী আল্লাহ্র উলুহিয়াতের তৌহিদ) আরেকটি তৌহিদ হচ্ছে তৌহিদে রসুল (রেসালাতের তৌহিদ)। যা কেবল রসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রসুল ব্যতীত অন্য কাউকে বিধানপ্রদাতা হিসাবে স্বীকার করা যাবে না এবং অন্যকারো বিধানের উপর নীরব অথবা সরব সমর্থনও দেয়া যাবে না। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে।

রসুলের দরবারের আরেকটি আদব হচ্ছে– তাকে সাধারণভাবে সম্বোধন করা যাবে না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাকো রসুল স. কে সেভাবে ডেকো না।' এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দু'টি মত রয়েছে। একটি হচ্ছে– রসুলপাক স.কে তাঁর নাম ধরে ডাকা যাবে না। বলতে হবে, ইয়া নবী আল্লাহ্, ইয়া রসুলাল্লাহ! দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, তাঁর ডাকে অতি অবশ্যই সাড়া দিতে হবে। এটা উম্মতের জন্য ওয়াজিব। তাই আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন জীবনদান করার জন্য তোমাদেরকে ডাকা হয়।' এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হজরত ইবনে মোয়াল্লাকে লক্ষ্য করে। তিনি নামাজ পড়ছিলেন। রসুল পাক স. তাকে ডেকেছিলেন। নামাজরত থাকার কারণে তিনি সে ডাকে সাড়া দিতে পারেননি। নামাজ শেষে তিনি রসুল স. এর নিকট গেলেন। তখন তিনি স. বললেন, তুমি কি আল্লাহ্র এ বাণী শোনোনি 'আতী উল্লাহ ওয়া রসুলাহ।' ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রসুল স. এর ডাকে সাড়া দিলে নামাজ বাতিল হবে না।

রসুলের প্রতি ভালোবাসা

জেনে রাখা উচিত যে, রসুল প্রেমই ইমানদারদের জীবনের জীবন এবং আত্মার আত্মা। এ মহব্বতের মাকামই সর্বোন্নত ও সর্বোত্তম। প্রকৃত রসুল প্রেমিকেরা তাঁর মহব্বত ব্যতিরেকে প্রাণহীন প্রাণীর মতো। মহব্বতের অর্থ ও তত্ত্ব সম্পর্কে প্রেমিকজনেরা অনেক কথা বলেছেন। আপনাপন আত্মিক অবস্থা সূত্রেই উচ্চারিত হয়েছে তাঁদের বক্তব্যরাজি। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে কোনো কোনো মোহাক্কেকীন সূত্রে বলা হয়েছে– আহলে মারেফাতের নিকট প্রেম-ভালোবাসা এমন একটি অনুভূতি, যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না। ভালোবাসার মঞ্জিলে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত প্রেমরহস্যের উন্মোচন ঘটে না। সুতরাং প্রেমের কথা যতোই বলা হোক না কেনো, প্রেম-বিরহের তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত গোপনই থেকে যাবে। যে প্রকৃত প্রেমিক সেই কেবল প্রেমের সংজ্ঞা অনুভব করতে সক্ষম। শব্দগত ব্যাখ্যার দিক থেকে ভালোবাসা হচ্ছে একটি আকর্ষণ যা মানুষকে

একাগ্রচিত্ত ও মগ্ন করে দেয়। ভালোবাসার রয়েছে অনেক স্তর, নিদর্শন, ক্রমপরিণাম ও অবস্থান্তর– জ্ঞানীদের কথায় যার ইশারা ইঙ্গিত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সকল অবস্থায় প্রিয়জনের অনুকরণ করার নামই মহব্বত। আর এ অনুকরণ হতে হবে প্রধানতঃ ত্যাগ-তিতিক্ষা, দান ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে। প্রবৃত্তির আকাংখা পরিত্যাগ করে হৃদয়াবেগের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে হবে এ অনুকরণ। কেউ কেউ বলেছেন, প্রিয়তমের সৌন্দর্যে আত্মহারা হওয়া এবং তাঁর গুণমুগ্ধতায় বিলীন হওয়ার নামই মহব্বত। আত্মবিলীনতা বা ফানা-ই মহব্বতের প্রকৃত নিদর্শন। বায়জীদ বোস্তামী বলেছেন, মহব্বতের নিদর্শন হচ্ছে– প্রেমিক তাঁর প্রেমাস্পদের জন্য সবকিছু করলেও তার মনে হবে কিছুই করা হলো না। অপরপক্ষে প্রেমাস্পদও যতো কমই করুক না কেনো প্রেমিক মনে করবে তাঁর প্রতি অনেক কিছুই করা হয়েছে। প্রকৃত প্রেমিক সব কিছু কোরবানী করার পরেও এই ভেবে লজ্জিত থাকবে যে, প্রেমের হক আদায় করার সাধ্য তার নেই। অথচ প্রেমাস্পদের সামান্য সাড়ায় সে ধনা হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেছেন, প্রিয়তমের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করার নামই প্রেম। প্রেমিকের নিজের বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রেমিকের হৃদয়ে তাঁর প্রিয়তম ব্যতিরেকে অন্য কারো সংকুলান হয় না। এ অবস্থার নামই প্রকৃত ভালোবাসা। প্রেমরাজ্যে প্রবেশের দরোজা হচ্ছে হৃদয়। প্রেমাস্বাদনও হৃদয়েরই ব্যাপার। কেউ কেউ এ রকমও বলেছেন, প্রিয় মিলনের পথে যাত্রা করার নামই মহব্বত। তাই প্রেমিকের মন ও মুখ তার প্রেমাস্পাদের স্মরণে সতত নিমগ্ন থাকে। কারণ, যে যাকে ভালোবাসে সে তারই স্মরণে নিমজ্জিত হয়।

মহব্বতের সংজ্ঞা হিসেবে এতোক্ষণ যা আলোচনা করা হলো সে সকল হচ্ছে মহব্বতের নিদর্শন মাত্র। প্রিয় বস্তুর প্রতি বিমোহিত হওয়াই মহব্বত। প্রেমিকেরা এ মহব্বতের আস্বাদ গ্রহণ করে। সুন্দর চিত্র, সুমিষ্ট আওয়াজ, সুস্বাদু আহার্য, মাতাল সুবাস, এ সকলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অর্থ এ সকলের মহব্বতে পড়ে যাওয়া। এগুলো বাহ্যিক মহব্বতের চিহ্ন। অভ্যন্তরীণ মহব্বতের প্রকৃতি এরকম নয়। অভ্যন্তরীণ ভালোবাসা সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ ও হৃদয়ানুভূতির ব্যাপার। এ প্রকৃতির ভালোবাসা হচ্ছে আধ্যাত্মিক ভালোবাসা। পুণ্যবান জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ– আধ্যাত্মিক আকর্ষণ। সৎ কর্মের প্রতি আকর্ষণও আধ্যাত্মিক ভালোবাসা থেকে উৎসারিত। এসবের প্রতি ভালোবাসা মানুষের স্বভাবের গভীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান। প্রাপ্তি ও অনুগ্রহের সূত্রে এরকম ভালোবাসা সৃষ্টি হতে পারে। তাই, যে উপকার করে তার প্রতি মহব্বত হয়। মোটকথা, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যে কারণগুলো প্রেম ভালোবাসার সৃষ্টি করে তার সবকিছুই ছিলো রসুল পাক স. এর মধ্যে। তাই তাঁর ভালোবাসা অপরিহার্য। তাঁর অসাধারণ রূপ সৌন্দর্য, অনুপম জীবনাদর্শ ও বিভিন্ন প্রকার পূর্ণতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী

অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। এবার আলোচিত হবে উম্মতের প্রতি তাঁর অবদান, অনুগ্রহ ও অনুপম শিক্ষা দানের কথা। তিনি মানুষকে সরল পথের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে সকলকে পরিচালিত করেছেন বেহেশতের দিকে। সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অতুলনীয়। তিনিই হেদায়েতের মূল ওসিলা। তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন সম্মানের দিকে– সফলতার দিকে। তিনি শাফী, তিনি শাহেদ। শরিয়ত, হকিকত এবং ফিতরত সকল দিক দিয়েই তিনি ভালোবাসার মূল আধার। পার্থিব সৌন্দর্য ও প্রাপ্তি যদি মানুষকে প্রেমমগ্ন করে, তবে সামগ্রিক সফলতাও ইহ-পারলৌকিক অক্ষয়তা প্রাপ্তিতে প্রেমমগ্নতা আসবে না কেনো? তিনি স. ছিলেন ইহ-পারলৌকিক সকল রূপ, গুণ ও পূর্ণতার নির্যাস। শ্রেষ্ঠ বিবেচনাবোধ তাই বলে। তিনিই ভালোবাসার প্রধানতম হকদার। তাই জীবন, সম্পদ এবং সকলপ্রিয় অনুষঙ্গ অপেক্ষা তাঁর ভালোবাসাই অধিকতর কাম্য। যে তাঁকে বিশ্বাস করবে সে তাঁকে অবশ্যই ভালোবাসবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিশ্বাসীদের ভালোবাসার মধ্যে অনভিপ্রেত তারতম্য। কেউ প্রকৃত প্রেমিক আবার কেউ অবিকশিত পুষ্পের ন্যায় অপূর্ণ। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং ঔদাসিন্যই পূর্ণ ভালোবাসা থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আল্লাহ্পাক সকলকে রক্ষা করুন। তাঁর সম্মানিত সহচরবৃন্দই ছিলেন তাঁর পরিপূর্ণ প্রেমিক। তাঁরা এ নেয়ামতের অধিকারী হয়েছিলেন প্রত্যক্ষ সাহচর্যের কারণে। এর প্রমাণ বিধৃত রয়েছে হাদিস শরীফের বিভিন্ন বিবরণে।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, হে রসুল! আপনি বলে দিন, তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের সহধর্মিণীগণ, তোমাদের গোত্র বিত্তবৈভব যা তোমরা অর্জন করো, তোমাদের সন্তান-সন্তুতি, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার ক্ষতির আশংকা করো, তোমাদের আকাংখিত আবাস– এ সকল কিছু যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে জেহাদ করার চেয়ে তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তবে জেনে রেখো, এর জন্য পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তির আয়োজন। রসুল স. এরশাদ করেছেন– ওই সময় পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্তুতি এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হবো। অন্য এক হাদিসে কেবল 'তোমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চেয়ে অধিক প্রিয় না হবো'– একথা বলা হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'তোমার আপন সত্তা থেকে প্রিয়তর না হবো।' বিবরণগুলোর প্রকৃত মর্ম এই যে, কোনো কিছুই যেনো রসুল স. অপেক্ষা অধিক মূলবান মনে না হয়। এ ধরনের ভালোবাসাই অক্ষয় মর্যাদামণ্ডিত ও পরিপূর্ণ।

হজরত ওমর বলেছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি আমার নিকট সবকিছু থেকে প্রিয়। কিন্তু আমার জীবনের চেয়ে...। রসুল আকরম স. বললেন, এমন কোনো

ইমানদার নেই আমি যাদের নিকট প্রাণাধিক প্রিয় নই। হজরত ওমর তখন বললেন, যিনি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন– ওই পবিত্র সত্তার শপথ! আপনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়। রসুলপাক স. বললেন, হ্যাঁ এবার তুমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ও বিশুদ্ধচিত্ত। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল পাক স. হজরত ওমরের বক্ষদেশে তাঁর পবিত্র হস্ত স্থাপন করে ভাবান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। সাহল তশতরী বলেছেন, যে সমস্ত অবস্থায় রসুলুল্লাহ স. এর নৈকট্য অনুভব করে না এবং আপন সত্তাকে রসুলুল্লাহ স., এর নিয়ন্ত্রণাধীন দেখতে পায় না সে কখনো সুন্নতের স্বাদ অনুভব করতে পারে না। কেননা রসুল পাক স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি মুমিন নয়, আমি যার জীবনাপেক্ষা প্রিয় নই। কেউ কেউ বলেছেন, সকল কামনা-বাসনাকে রসুল পাক স. এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরবানী না করা পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়া যায় না। একথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহব্বত ব্যতীত আনুগত্যের অস্তিত্ব নেই।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা বলেছেন, হজরত ওমর প্রথমে বলেছিলেন সবকিছু থেকে আমি আপনাকে বেশী ভালোবাসি, কিন্তু জীবনের চেয়ে....। তাঁর ওই কথায় মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থা ফুটে উঠেছিলো। প্রকৃতিগত বা সৃষ্টিগত দিক থেকে আপন জীবনই মানুষের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। পরে তিনি চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রসুলু পাক স. জীবনাপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই পরে বলেছিলেন, আপনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়। তখনই রসুল পাক স. বলেছিলেন হে ওমর! এখন তুমি মুমিন ও মোখলেছ। অর্থাৎ এখন তুমি প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে পেরেছো। এখন তোমার জবাবে ফুটে উঠেছে পূর্ণ বিশ্বাস ও বিশুদ্ধচিত্তা।

বর্ণিত বর্ণনা সম্পর্কে বান্দা মিসকিন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, হজরত ওমরের প্রথম জবাব ছিলো সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর। পরের জবাবটি ছিলো পরিবর্তিত অন্তঃকরণজাত। পরিবর্তিত ওই অন্তঃকরণ ছিলো আল্লাহ্তায়ালার দান। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া প্রণেতা বলেছেন, আতায়ী মহব্বতের (দান হিসেবে প্রাপ্ত ভালোবাসার) মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। এটি সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থাও নয়। মানুষ তার আত্মিক অবস্থাকে কখনো কখনো কঠোর সাধনার মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে। রসুল পাক স. তাঁর আত্মিক প্রভাবে সাহাবায়ে কেরামের প্রবৃত্তিসমূহকে পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন। প্রবৃত্তির অন্ধকারে এনেছিলেন আলোর জোয়ার। যারা যোগ্য তারা সকলে স্নাত হয়েছিলেন ওই অলৌকিক আলোয়। হজরত ওমর ছিলেন সেই অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে– রসুল স. প্রশ্ন করলেন, হে ওমর! তোমার অন্তরের অবস্থা কি? আমি ব্যতীত অন্য কিছু কি তোমার নিকট অধিকতর প্রিয়? হজরত ওমর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার অন্তরে আমার পরিবার-

পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং সহায়-সম্পদের সঙ্গে আপনার মহব্বতও সম্মিলিত আছে। রসুল পাক স. তখন তাঁর পবিত্র হাত রাখলেন হজরত ওমরের বুকে। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, এবার বলো তোমার মনের অবস্থা কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অন্তর থেকে পরিবার-পরিজন ও বিত্ত-বৈভবের আকর্ষণ দূর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে আত্ম-প্রেম। রসুল স. পুনরায় তাঁর পবিত্র হস্ত স্থাপন করলেন হজরত ওমরের বক্ষদেশে। এরপর হজরত ওমর বলে উঠলেন, হে প্রিয়তম রসুল! আমার হৃদয়ে এখন আপনার ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ভালোবাসা নেই। এ হাদিসের মধ্যে একথাটি প্রতীয়মান হয় যে, স্বভাবজাত ভালোবাসা তার সীমানা অতিক্রম করে প্রকৃত ভালোবাসায় উপনীত হতে পারে। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল পাক স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ্! পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্পদ এবং জীবনের চেয়ে আমার অন্তরে অধিক দান করুন আপনার ভালোবাসা। পিপাসিত জনের নিকট পানি যেরকম প্রিয়, আপনি যেনো তদপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় হন। একথাটি সুস্পষ্ট যে, আপন সত্তার প্রতি ভালোবাসা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভালোবাসা। কিন্তু শীতল পানির প্রতি ভালোবাসা আপন অভিপ্রায় বর্হিভূত। হজরত আলী বলেছেন, আমার অন্তরে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা এমনকি শীতল পানি অপেক্ষা রসুলুল্লাহ স. এর ভালোবাসা অধিক।

নৈকট্য ও ভালোবাসা

ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি নৈকট্য বা মিলন। এ মিলন আত্মিক বা আধ্যাত্মিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন। শারীরিকভাবে দূরত্ব থাকলেও আত্মিকভাবে কখনোই দূরত্ব থাকে না। সুতরাং বিরহ ও মিলন নিয়েই প্রেম। আত্মিক প্রেমই প্রেমিকজনের নিকট সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

এক লোক রসুলুল্লাহ স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কিয়ামত কখন হবে? রসুল পাক স. বললেন, কিয়ামতের জন্য কি পরিমাণ আমল সঞ্চয় করেছো তুমি? লোকটি বললেন, কিয়ামতের জন্য নামাজ, রোজা, দান, সদকা ইত্যাদি বেশী করতে পারিনি। তবে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে আমি ভালোবাসি। রসুল পাক স. বললেন, তুমি তারই সঙ্গী যাকে তুমি ভালোবাসো।

হজরত সফওয়ান ইবনে কুদামা থেকে বর্ণিত হয়েছে– আমি হিজরত করে রসুল পাক স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার পবিত্র হস্ত সম্প্রসারিত করুন। আমি আপনার হস্ত ধারণ করে অঙ্গীকারাবদ্ধ (বায়াত) হবো। রসুলপাক স. হস্ত প্রসারিত করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি স. বললেন, যে যাকে ভালোবাসে সে

তার সঙ্গে। রসুল পাক স. থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হজরত আনাস এবং হজরত আবু জর।

হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. একদিন ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেনের হাত ধরে বললেন, যে ব্যক্তি এ দু'জনকে এবং এদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসবে সে কিয়ামতের দিন আমার নৈকট্যভাজন হবে। সে সেখানে অবস্থান করবে আমার সামান্তরালে। এখানে 'মাইয়েত' বা সঙ্গতার চূড়ান্ত পর্যায় বিবৃত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, সে থাকবে আমার সমান্তরালে। প্রেমিকজনের এ বিশেষত্বই তাদেরকে অন্যের তুলনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এক বর্ণনায় রয়েছে, এক লোক রসুল পাক স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি আমার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সম্পদ এবং আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। আপনার স্মৃতি আমাকে বিচলিত করে। আপনার বিচ্ছেদ অসহনীয়। আপনার সন্দর্শন ব্যতীত অন্তরে শান্তি লাভ করতে পারি না। এক সময়তো এমন হবে আপনি এ নশ্বর পৃথিবী থেকে প্রস্থান করবেন। তখন বেহেশতবাসী নবী ও রসুলদের সঙ্গে মহামর্যাদাপূর্ণ বসবাস হবে আপনার। হে প্রিয়তম রসুল! তখন আমি আপনার সন্দর্শন কী করে পাবো?

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করলেন, 'যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন নবী ও সিদ্দিকদের সঙ্গে বসবাস করবে।' রসুল পাক স. তৎক্ষণাৎ ওই ব্যক্তিকে ডেকে এনে সদ্য অবতীর্ণ আয়াত পড়ে শুনালেন। কেউ কেউ বলেছেন, ওই ব্যক্তি ছিলেন রসুলপাক স. এর প্রিয়ভাজন ক্রীতদাস হজরত সাওবান। তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন রসুল পাক স. কে। রসুলবিরহ তাঁর নিকট ছিলো অসহনীয়। তাঁকে সে দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে পড়তেন তিনি। তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। অবিন্যস্ত ও আলু-থালু বেশে বসুল পাক স.কে দেখার জন্য তিনি যখন ছুটে আসতেন, তখন মনে হতো তাঁর দু'চোখে জমেছে কালি। রসুল পাক স. বলতেন, একি চেহারা হয়েছে তোমার? এমন বিবর্ণ হয়েছো কেনো? তিনি জবাব দিতেন, হে প্রাণপ্রিয় রসুল! আমি রোগাক্রান্ত নই। কোনো শারীরিক অসঙ্গতিও আমার নেই। কিন্তু আপনার রূপ সৌন্দর্য দর্শন থেকে বঞ্চিত হলে আমি পেরেশান হয়ে পড়ি। তখনই দগ্ধীভূত অন্তরে ছুটে আসি আপনার দরবারে। আপনার পবিত্র সন্দর্শন ব্যতীত আমার হৃদয় হয় অশান্ত, বিহ্বল। একটু আগেই আমি ভাবছিলাম আখেরাতের কথা। ভাবছিলাম, পরবর্তী পৃথিবীতে কোথায় খুঁজে পাবো আপনাকে? সেখানে তো আপনি হবেন নবী রসুল পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ মাকামের অধিকারী। বেহেশতে প্রবেশ যদি আমার নসীবে হয়ও, তবুও আমি থাকবো অত্যুচ্চ মাকামে থেকে অনেক নিম্নস্তরে। আর যদি বেহেশত নসীব না হয় তবে তো কোনোদিন আর আপনাকে দেখতে পাবো না। হায় কী হবে তখন আমার! তাঁর এ কথার

পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে উদ্ধৃত আয়াতখানি। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, সকল সাহাবায়ে কেরামই এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যস্থল।

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– রসুল পাক স. এর দরবারে বসে এক ব্যক্তি তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। তিনি স. বললেন, এভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী দেখছো! লোকটি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত, বিস্মিত ও আনন্দিত। আমি দেখছি আর ভাবছি কিয়ামতের দিন আপনাকে এভাবে দেখার সুযোগ পাবো কিনা। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে বর্ণিত আয়াত। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুল পাক স. বলেছেন, যে আমাকে ভালোবাসবে সে বেহেশতের মধ্যে আমার সঙ্গেই বসবাস করবে।

এ ধারণাটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, রসুল পাক স. এর সঙ্গে বসবাস করার অর্থ তাঁর সম-মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া নয়। অবশ্য কোনো কোনো হাদিসে রয়েছে– আমাকে যারা ভালোবাসে তাঁরা একই মর্যাদা লাভ করবে। এ সকল হাদিসের শাব্দিক অর্থ গ্রহণীয় নয়। 'আমার সঙ্গে', 'আমার মর্যাদায়' এ সকল কথার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে রসুল প্রেমিকেরা জান্নাতের এমন অবস্থানে থাকবে যেখান থেকে তাঁরা লাভ করবে তাঁর অন্তরালহীন দর্শন। অর্থাৎ অবস্থানের দূরত্ব থাকলেও দৃষ্টির দূরত্ব থাকবে না। আর আত্মিক নৈকট্য ও সম্পর্ক তো থাকবেই। দর্শনহীনতার চিন্তা প্রেমিকজনদের প্রধানতম দুশ্চিন্তা। 'মাইয়াত' বা সঙ্গতার অর্থ এটাই। অর্থাৎ সঙ্গতা অর্থ চাক্ষুষদর্শনসম্ভূত সঙ্গতা। নতুবা আত্মিক সঙ্গতা (মাইয়াতে কলবী) বা হৃদয়ে রসুল স. এর বিদ্যমানতা বিশ্বাসীদের জন্য এটি সার্বক্ষণিক ব্যাপার। যেমন কোনো কোনো যুদ্ধের সময়ে রসুল পাক স. বলেছেন 'কতিপয় লোক যারা তোমাদের সফরসঙ্গী হতে পারেনি, তাঁরা মদীনায় বসবাস করলেও তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। শরিয়ত সম্মত ওজর ও অক্ষমতাই তাদেরকে মদীনায় আটকে রেখেছে (কিন্তু তাঁরা তোমাদের আত্মিক সঙ্গী)। আত্মিক সঙ্গতা লাভ হয় আত্মার মাধ্যমে আর আত্মা ও শরীরের সঙ্গে যে দর্শন লাভ হয় তাকে বলে মোশাহাদা বা দীদার। একারণেই দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী রসুলপাক স. এর নিকটেই ছিলেন। আবার মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনাবাসী হওয়া সত্ত্বেও ছিলো অনেক দূরে। তার বসতবাটি ছিলো মসজিদে নববীর অতি সন্নিকটে। রসুলপ্রেমিকেরা তাদের অন্তরে সার্বক্ষণিক রসুলপ্রেম অনুভব করলেও প্রত্যক্ষদর্শনের অভিলাষী ছিলেন। তারা চাইতেন যেনো প্রত্যক্ষগোচরতার মাধ্যমে অন্তর ও দৃষ্টি উভয়টি ধন্য হয়ে যায়।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র.) বলেন, জান্নাতে রসুলপাক স. অত্যুচ্চ মাকামে অবস্থান করবেন বলে প্রেমিকজনেরা দর্শন বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করেছিলেন। তাই তাঁদেরকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে,

পৃথিবীতে যেমন মর্যাদার তারতম্য সত্ত্বেও উম্মতেরা তাঁর দীদার লাভ করে ধন্য হয়ে থাকেন, আখেরাতেও তারা তেমনি দীদার লাভ করবেন। এভাবেই লাভ হবে তাঁদের দৃষ্টির অন্তরালহীন নৈকট্য এবং সঙ্গতা।

দীদার

এখানে এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হবে– যা প্রেম ও দর্শন সম্পর্কিত এবং যা বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী ইমামগণের বর্ণনায়। হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে এসেছে– রসুল আকরম স. বলেছেন, পরবর্তীতে পৃথিবীতে আগমনকারীরাই আমাকে বেশী ভালোবাসবে। তারা আমাকে এক নজর দেখার বিনিময়ে জীবন বিসর্জন দেয়ার আকাংখা করবে। এ হাদিস সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, পরবর্তী উম্মতেরা মনে করবেন, তারা যদি পৃথিবীতে রসুলপাক স. কে একনজর দেখতে পেতেন, তবে সবকিছুই কোরবানী করতেন। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, হাদিসের অর্থ এই যে, পরবর্তী উম্মতের কেউ কেউ অন্তরে এ বাসনা লালন করবেন যে, একটি বারও যদি স্বপ্নে রসুল দর্শন হয় তবে তার জন্য সবকিছু কোরবান। পুণ্যবান উম্মতেরা স্বপ্ন দর্শনের এ অভিলাষ পোষণ করে থাকেন। আর কামেল আউলিয়াগণ চান জাগ্রত অবস্থার দর্শন। এ রকম দর্শন কিন্তু সুদূরপরাহত কোনো ব্যাপার নয়। যারা রসুল দর্শনের জন্য পাগলপ্রাণ তাঁরা স্বপ্নের মাধ্যমে মাত্র একবার দর্শনের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এটাই তাঁদের নিকট প্রকৃত গনিমত।

ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে– এক আনসারী রমণীর স্বামী, পিতা ও ভাই রসুল স. এর যুদ্ধসঙ্গী হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যুদ্ধের সংবাদ জানার জন্য তিনি চলে যাচ্ছিলেন রণক্ষেত্রের দিকে। পথে যাকে পেলেন তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, রসুল আকরম স. কী অবস্থায় রয়েছেন? লোকেরা বললো, তিনি ভালো আছেন। রমণী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমি আমার রসুলকে ভালোবাসি। রমণী পুনরায় বললেন, তিনি এখন কোথায়? আমি তাঁর পবিত্র সৌন্দর্য দর্শন করে আশ্বস্ত হতে চাই। যখন তিনি রসুলে করীম স. এর নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন বললেন, আপনি নিরাপদ, সুতরাং সকল বিপদই আমার নিকট তুচ্ছ।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে– উহুদ যুদ্ধের দিন চতুর্দিকে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে, শত্রুরা জয়লাভ করেছে এবং বহুসংখ্যক সাহাবী পান করেছেন শাহাদাতের সুধা। এ দুঃসংবাদ শুনে মদীনার অনেক রমণী গৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কাঁদতে কাঁদতে কেউ অগ্রসর হলেন সমরপ্রান্তরের দিকে। এক আনসারী রমণীর স্বামী, পুত্র, পিতা ও ভাই শহীদ হয়েছিলেন। লোকেরা তাঁকে তাঁর স্বামী, পুত্র, পিতা ও ভাইয়ের লাশ দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ

ছিলো না ওই বিশ্বাসিনী রমণীর। তিনি কেবল বার বার বলছিলেন, রসুলুল্লাহ্ স. কোথায়? লোকেরা রসুল স. এর অবস্থান দেখিয়ে দিলেন। রোরুদ্যমানা শোকাতুরা রমণী দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন রসুলপাক স. এর সম্মুখে। তারপর তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের এক প্রান্ত স্পর্শ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক। এখন আমার আর স্বজন হারানোর শোক নেই। কারণ আপনি নিরাপদ।

বন্দী সাহাবী হজরত জায়েদ ইবনে ওয়াশানাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হেরেম শরীফের বাইরে বধ্যভূমিতে নিয়ে চললো মক্কার মুশরিকেরা। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, জায়েদ। তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, সত্যি করে বলোতো দেখি, এখন যদি তোমার বদলে মোহাম্মদকে হত্যা করা হয় এবং তুমি মুক্ত হয়ে যাও তবে কি তুমি আনন্দিত হবে না? হজরত জায়েদ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমি তাঁকে ভালোবাসি। আমিতো চাই আমার এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকুক, আর আমার রসুলের পথে যেনো একটি কাঁটাও পতিত না হয়। একথা শুনে আবু সুফিয়ান বললো, মোহাম্মদ এর সাথীরা তাকে যে রকম ভালোবাসে এ রকম ভালোবাসতে আমি কাউকে দেখেনি।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক বিশ্বাসিনী নারী হিজরত করে রসুল আকরম স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমি স্বামীবিরহে কাতর হয়ে এখানে আসিনি। কেবল স্থানবদলও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি হিজরত করেছি আমার প্রিয়তম রসুলের জন্য।

হজরত বেলালের অন্তিম কাল উপস্থিত হলো। শোকাতুরা সহধর্মিণীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিলেন এভাবে, দ্যাখো কতইনা আনন্দের মুহূর্ত এখন আমার। রসুল আকরম স. এবং তাঁর প্রিয় সঙ্গীদের সঙ্গে মিলনের সময় সমাগত। কাল প্রত্যুষেই আমার বিরহ যাতনার অবসান হবে।

হজরত আবদাহ বিনতে খালেদ ইবনে মা'দান থেকে বর্ণিত হয়েছে। শয্যাগ্রহণকালে হজরত খালেদ রসুলুল্লাহ স. এবং আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের নাম নিয়ে বলতেন, তাঁরাই আমার প্রকৃত আপন জন। তাঁদের বিরহে নিরবধি দগ্ধমান আমি। হে আমার আল্লাহ্! আমার পৃথিবীর জীবনে যবনিকা টেনে দিন। আমার মিলন সৌভাগ্য ত্বরান্বিত করুন। একথা বলে কাঁদতে শুরু করতেন তিনি। এভাবেই একসময় নিদ্রাভিভূত হয়ে যেতেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক বলেছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! যিনি আপনাকে সত্য ধর্মের নিশানবাহী করে প্রেরণ করেছেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! নিশ্চয় আমার পিতা আবু কোহাফার ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা আপনার পিতৃব্য আবু তালেবের

ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিলো। আমার চক্ষুযুগল অধিকতর শীতল হতো যদি আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ করতেন। কারণ তাঁর ইসলাম গ্রহণের মধ্যে রয়েছে আপনার চোখের শীতলতা।

হজরত ওমর হজরত আব্বাসকে বলতেন, আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা আপনাদের ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়। কারণ আপনাদের ইসলাম গ্রহণ রসুলে করীম স. এর নিকট অধিকতর প্রিয়।

হজরত জায়েদ বিন আসলাম কৃর্তক বর্ণিত হয়েছে, এক রাতে খলিফা হজরত ওমর জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পথ চলছিলেন। একস্থানে দেখলেন, এক বৃদ্ধা প্রদীপের আলোয় কাপড় বুনতে বুনতে একটি কাসিদা আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন, যার অর্থ– মোহাম্মদ স. এর উপর পুণ্যবানদের দরূদ বর্ষিত হচ্ছে। উত্তম ও পবিত্র ব্যক্তিরা তাঁর উপর এই গভীর নিশীতেও দরূদ পাঠরত। আর আমিও তাঁর বিরহে নিঃসঙ্গ অশ্রুপাত করে চলেছি। হায় কতোদিন আমি আর শুভ্র কেশ নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করবো। তোমরা কেউ কি পারো আলমে বরযখবাসী আমার প্রিয়তম রসুলের কাছে নিয়ে যেতে? হজরত ওমর বৃদ্ধার নিকটে উপবেশন করলেন। বললেন, হে মাননীয়া রসুল বিরহিণী। আবার আপনার কাসিদাটি পাঠ করুন। বৃদ্ধা পুনরায় শোক গাঁথাটি পাঠ করে শোনালেন। চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো অশ্রুর স্রোত। একটানা কেঁদে চললেন আমিরুল মুমিনিন হজরত ওমর।

একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের পা অবশ হয়ে গেলো। একজন বললেন, আপনার প্রিয়তম ব্যক্তিকে স্মরণ করুন। দেখবেন এই মুহূর্তেই আপনি নিরাময় লাভ করবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, ওয়া মোহাম্মাদাহ। এ কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলেন তিনি।

এক বর্ণনায় এসেছে, এক রমণী জননী আয়েশার নিকটে এসে বললেন, দয়া করে একটিবার রওজা শরীফের দরোজা খুলে দিন। তিনি দরোজা খুলে দিলেন। রওজা শরীফ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন দর্শনার্থিনী। একটানা কেঁদেই চললেন তিনি। কান্না থামলে দেখা গেলো তাঁর পৃথিবীর পিঞ্জর নিঃসাড়। প্রাণপাখি পলাতক।

হজরত জায়েদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী বাগানের পরিচর্যা করছিলেন। এমন সময় তাঁর পুত্র এসে রসুল আকরম স. এর ইন্তেকালের সংবাদ জানালেন। তিনি তখন কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! এখন আমার চোখ দিয়ে আর কী হবে? আমার প্রিয়তম রসুল আর নেই। তাঁকেই যখন আর দেখতে পাবো না তখন অন্যকিছুও আর দেখতে চাই না। হে আমার আল্লাহ্! আমার দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে দিন। প্রার্থনা কবুল হলো। তিনি হয়ে গেলেন দৃষ্টিহীন।

ভালোবাসার নিদর্শন ঃ এক

রসুলপাক স. এর ভালোবাসার অনেক নিদর্শন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে তাঁর অনুসরণ, তাঁর সুন্নতের উপর আমল করা, তাঁর নির্দেশানুযায়ী চলা। তাঁর জীবনাদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করা। অর্থাৎ শরিয়তের বিধিবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত থাকা। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'হে রসুল! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসা লাভ করবে।' এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসা এবং রসুল স. এর ভালোবাসা মূলতঃ একই।

ইমাম কুশাইরীর একটি গ্রন্থে আবু সাঈদ হারাজ থেকে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেন, একবার আমি রসুল পাক স.কে স্বপ্নে দেখলাম। বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! আমি আপনার মহব্বতে এমনভাবে ডুবে থাকি যে, আল্লাহ্‌র মহব্বতের কথা আমার মনে থাকে না। আপনার প্রগাঢ় প্রেম ব্যতিরেকে আমার জীবধারণ অসম্ভব। আমার স্মৃতিতে আপনি ভিন্ন কেউ নেই। অবশ্য আমি এটাও জানি যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসাই অগ্রগণ্য। একথা আপনি বলেছেনও। কিন্তু আমি নিরুপায়। আপনার প্রেমে আমি আসক্তা নিমজ্জিত। অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সুযোগ আমার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। কেবল মনে হয়, আপনাকে যেরূপ ভালোবাসা যায়, আমি সেরূপ ভালোবাসতে অক্ষম। এ প্রেমের পিপাসা অনন্ত।

রসুল আকরম স. বললেন, হে মোবারক ব্যক্তি! যে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে সেতো আমাকে ভালোবাসবেই। তাঁর কথার অর্থ– আল্লাহ্‌প্রেম ও রসুলপ্রেম এক– অভিন্ন। যদিও আল্লাহ্‌ এবং রসুল এক নন। একজন স্রষ্টা অন্যজন সৃষ্টি। প্রেমোন্মত্ততা এ পার্থক্যকে নিরূপণ করতে পারে না। কিন্তু শরিয়ত পূর্ণ সজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই শরিয়তের দৃষ্টিতে মত্ততাসম্ভূত দর্শনকে মান্য করা হয়নি। তাই আবু সাঈদ হারাজের দর্শনকে অপূর্ণ ধারণা করতে হবে। কিন্তু তিনি প্রেমপথের একনিষ্ঠ পথিক। তাই, রসুলুল্লাহ স. তাঁকে মোবারক ব্যক্তি বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর অক্ষমতাকে উপেক্ষা করে রসুল পাক স. তাঁকে কবুল করেছিলেন। রাবেয়া বসরী থেকেও এ ধরনের মত্ততাসম্ভূত প্রেমাসক্তির বিবরণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌পাকই তাঁর প্রেমিক দাস ও দাসীদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভালোবাসা হচ্ছে আনুগত্যের নাম। ভালোবাসাই আনুগত্যের প্রমাণ এবং নিদর্শন। আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা থেকে প্রাপ্ত নেয়ামতের পর্যালোচনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। নেয়ামত সম্পর্কে যে যতোবেশী জানবে তার অন্তরে ততো বেশী ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এ নেয়ামত

লাভ হয় আনুগত্যের মাধ্যমে। আর ভালোবাসাই আনুগত্যকে সহজতর করে। উপাসনাকে করে আস্বাদ্য। তাই ইবাদত প্রেমিকজনের অন্তরের আহার, আত্মার সৌন্দর্য, চিত্তের প্রফুল্লতা ও চোখের শীতলতা। এ আস্বাদ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আস্বাদ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট। আর এ অনন্য আস্বাদ রসুল করীম স. এর প্রেম ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জিত হয়। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে উজ্জীবিত করলো সে যেনো, আমাকে উজ্জীবিত করলো। তার অবস্থান নির্ধারিত হবে আমার সঙ্গে জান্নাতে।

মহব্বত হচ্ছে একটি নূর। আর পাপ হচ্ছে অন্ধকার। আলো সবসময়ই অন্ধকারকে অপসারিত করে। আলেমগণ বলেছেন, রসুলপাক স. এর আনুগত্য অপেক্ষা উত্তম কোনো মর্যাদা নেই। রসুলের আনুগত্য মহব্বতের শক্তিমত্তাকে প্রকাশ করে। তাই রসুলের অনুসারীরাই প্রকৃত প্রেমিক ও উচ্চ মর্যাদর অধিকারী। আনুগত্যে যারা একনিষ্ঠ নয়, তারাই নাকেছ বা অপূর্ণ। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ্কথা বলা যায় না। একথার প্রমাণ রয়েছে এই ঘটনায়– রসুলপাক স. এক ব্যক্তিকে মদ্যপানের অপরাধে শাস্তি প্রদান করলেন। পুনরায় আরেকদিন সে শরাব পান করে বসলো। লোকেরা তখন তাকে তিরস্কার করতে লাগলো। রসুল আকরম স. বললেন, তোমরা তাকে তিরস্কার কোরো না। কারণ, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসে। ওই লোকটির নাম ছিলো জাহের। তিনি রসুল স. কে লাকড়ি ও শাকসব্জি সরবরাহ করতেন। আর রসুলপাক স. তাকে দান করতেন কাপড়, ঘি ইত্যাদি। তিনি স. বলতেন, হে জাহের! এ হচ্ছে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের নিদর্শন। কোনো কোনো গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়– শরাব পানকারী ওই ব্যক্তির নাম ছিলো আব্দুল্লাহ। এ হাদিসটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহব্বতের মূল সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। বাহ্যিক আনুগত্য বিঘ্নিত হলেও হৃদয়স্থিত ভালোবাসা বিনষ্ট হয়েছে একথা বলা যাবে না। আরেকটি কথা এখানে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হলো যে, কবীরা গোনাহ্কারী কাফের নয়। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত।

আল্লাহ্তায়ালার ভালোবাসা হৃদয়ে সদা বিদ্যমান থাকতে হবে। যে পাপী তার অন্তরেও এ ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন। যদি তা থাকে তবে পাপীরা পাপ করার পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। আর পাপের জন্য শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করা হলে পাপ মোচন হয়ে যায়। পাপীদের ইমান রক্ষা হয় এভাবেই। আর যে পাপীর উপর শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না এবং যে পাপের জন্য লজ্জিত বা অনুতপ্ত হয় না, তার জন্য রয়েছে সমূহ বিপদ। সে তখন ক্রমাগত পাপ পথে অগ্রসর হতে থাকে। এ পাপ পথের দূরগামীতাই তাকে শেষ পর্যন্ত ইমানের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করে দেয়। আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন।

ভালোবাসার নিদর্শন ঃ দুই

রসুলে আকরম স. এর ভালোবাসার আর একটি নিদর্শন তাঁর সম্পর্কে অত্যধিক আলোচনা। অধিক আলোচনা ভালোবাসাকে অপরিহার্য করে দেয়। মানুষ যাকে ভালোবাসে তাঁর প্রসঙ্গেই বেশী আলোচনা করে থাকে। এটাই প্রেম পথের নিয়ম। কেউ কেউ বলেছেন, প্রিয়জনের স্মরণ সার্বক্ষণিক হওয়াই সমীচীন। আর এই সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চা এবং রসুল স. এর জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে। যাঁরা হাদিস শাস্ত্রের অনুশীলনে নিয়োজিত, তাঁদের সঙ্গে রসুল পাক স. এর বিশেষ আত্মিক যোগসূত্র সংস্থাপিত হয়– যা অন্যদের ক্ষেত্রে হয় না। কারণ রসুল স. এর অবস্থা ও গুণাবলীর আলোচনাই তাঁদের সাধনার বিষয়বস্তু। তাঁরা একান্ত দরদ দিয়ে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। লাভ করেন তাঁর পবিত্র সত্তার সম্যক পরিচয়। তাঁদের মানসপটে সদা উদ্ভাসিত থাকে রসুল আকরম স. এর অপরূপ সৌন্দর্য। তাঁর পবিত্র অবয়বের স্মরণ আত্মিক সম্পর্ককে করে দৃঢ়বদ্ধ। তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারিত হলে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে স্বর্গীয় সুষমার অনির্বচনীয় আস্বাদ। অন্তর তাঁর দর্শনাকাঙ্খায় হয়ে পড়ে আপ্লুত। মন পড়ে থাকে তাঁরই জ্যোতিস্নাত দরবারে, অঙ্গনে। এভাবে হাদিস শাস্ত্র চর্চাকারীরা সাহাবায়ে কেরামের মতো হন। তবে এই সংসর্গ অবিকল সাহাবীগণের মতো নয়। সাহাবীগণ ছিলেন প্রকাশ্য ও হৃদয়গত উভয় সংসর্গের অধিকারী। আর মোহাদ্দেছগণের সংসর্গ কেবলই আত্মিক বা হৃদয়গত। সাহাবীগণ তাঁকে দেখতেন স্বচক্ষে। কথা শুনতেন সরাসরি, স্বকর্ণে। আর মোহাদ্দেছগণের দর্শন ও শ্রবণ কেবলই আধ্যাত্মিক। যারা তাঁর রওজা শরীফের কাছে গিয়ে পবিত্র নামসমূহের উল্লেখ করে দরূদ শরীফ পাঠে মগ্ন হন, তাঁদের সৌভাগ্যতো অকল্পনীয়। তাঁরা তখন 'আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হও' এই হাদিসের প্রতিভু হয়ে যান। হয়ে যান 'ফাজকুরুনি আজকুরকুম' (আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো) এই আয়াতে প্রকাশস্থল। মনে রাখতে হবে দরূদ ও সালাম পাঠ রসুল আকরম স. এর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক। যারা হাদিস শাস্ত্র চর্চায় নিবেদিত প্রাণ তাঁরাই অনুধাবন করতে সমর্থ হন দরূদ ও সালাম প্রেরণের গুঢ় মাহাত্ম্য। অন্তর্নিহিত রহস্য।

ভালোবাসার নিদর্শন ঃ তিন

রসুল আকরম স. এর পবিত্র নাম উচ্চারণ ও শ্রবণের সময় সম্মান ও বিনয় প্রকাশ করাও তাঁর প্রতি ভালোবাসার একটি অন্যতম নিদর্শন। মহব্বতের দাবীদারদের এ রকম অবস্থা হওয়াই সমীচীন। রসুল পাক স. এর ইন্তেকালের পর সাহাবীগণের অবস্থা ছিলো এ রকম– তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করলে অথবা

শুনলে কান্নায় ভেঙে পড়তেন তাঁরা। প্রদর্শন করতেন সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা। ভক্তি, ভালোবাসা ও বিনয়ের পূর্ণতার কারণে রসুল পাক স. এর নাম শোনামাত্র তাঁদের শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যেতো। এ রকম অবস্থা বিরাজমান ছিলো তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের মধ্যে (রেদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন)।

আবু ইব্রাহিম ইয়াহ্‌হইয়া বলেছেন, রসুল পাক স. এর নাম উচ্চারণ করলে অথবা শুনলে পূর্ণ বিনয় প্রকাশ করতে হবে। দেহ ও মনকে করতে হবে শ্রদ্ধানিষ্ঠ। আপনসত্তার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তাঁর পরাক্রম ও মহিমা। এ রকম করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। রসুল পাক স. এর সামনে উপস্থিত থাকলে যে রকম আদব প্রদর্শন করা উচিত, তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করলে অথবা শুনলে সেরকমই আদব প্রদর্শন করতে হবে।

হজরত আবু আইয়ুব সখতিয়ানীর অবস্থা ছিলো– তাঁর সামনে রসুল পাক স. এর নাম উচ্চারণ করলে তিনি এতোবেশী রোদন করতেন যে, মানুষ তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে সমবেত হয়ে যেতো।

জাফর বিন মোহাম্মদ ছিলেন সদা প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি। তিনিও রসুল পাক স. এর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হয়ে পড়তেন। তাঁর চেহারা হয়ে যেতো বিবর্ণ।

আবদুর রহমান বিন কাসেমের অবস্থা ছিলো এ রকম– রসুলুল্লাহ স. এর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তিত হতো। তিনি তখন তাঁর কটিদেশের বস্ত্রে দ্বিগুণ পেঁচ কষতেন। তাঁর সঙ্গী সাথীরা এ রকম অবস্থা দেখে নিজেরাই বিব্রত হয়ে পড়তেন। একবার লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এমন করেন কেনো? তিনি বললেন, আমি যা দেখি তোমরা যদি তা দেখতে পেতে, তবে তোমাদের অবস্থা এ রকমই হতো। তিনি আরও বললেন, মোহাম্মদ বিন মুনকাদের ছিলেন সাঈয়েদুল কোররা। আমরা তাঁর নিকট হাদিস শুনতে যেতাম। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। আমরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতাম। রসুল পাক স. এর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতাম তাঁর চেহারা বিবর্ণরূপ ধারণ করেছে। মনে হতো মুখমণ্ডলে এক ফোঁটা রক্তও নেই। নির্বাক, নিথর হয়ে যেতেন তিনি তখন।

রসুল আকরম স. সম্পর্কিত আলোচনা শুনলেই রোদন শুরু করতেন বিখ্যাত বুজর্গ আমের ইবনে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের। সে রোদন ছিলো তপ্ত ও অশ্রুশোষক। ইমাম জুহুরী ছিলেন সদা প্রফুল্লচিত্ত ও সামাজিক। কিন্তু তিনি রসুল স. প্রসঙ্গে শুনলেই হয়ে যেতেন অন্য মানুষ। মনে হতো তিনি কাউকেই আর চিনছেন না। সুফিয়ান বিন সুলায়ম ছিলেন এক পুণ্যবান ও একনিষ্ঠ সাধক। রসুল স. এর কথা শুনলেই তিনি এমন কান্না শুরু করতেন যা মানুষ সহ্য করতে পারতো না। তাই দূরে সরে গিয়ে তাঁকে প্রাণ ভরে কাঁদবার সুযোগ করে দিতো তারা। তাঁর নাম শুনলেই কেঁপে উঠতেন হজরত কাতাদা। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন। আব্দুর

রহমান মাহদী হাদিস শরীফ আলোচানার সময় সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকতে বলতেন সবাইকে। পাঠ করতেন এ আয়াতটি 'তোমরা নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা তোমাদের কণ্ঠস্বর অধিক উচ্চ কোরো না।' তিনি আরো বলতেন, রসুল স. এর নিকট সরাসরি হাদিস শ্রবণকালে নিশ্চুপ থাকা ফরজ। তেমনি পরোক্ষভাবে হাদিস শরীফ শ্রবণকালেও চুপ থাকা ফরজ।

ভালোবাসার নিদর্শন ঃ চার

রসুলপাক স. কে দেখার জন্য অস্থির চিত্ততাও রসুলপ্রেমের নিদর্শন। সকল রসুলপ্রেমিকই তাঁর দর্শন লাভের জন্য সদা লালায়িত থাকেন। আলেমগণ বলেছেন, প্রিয়মিলনের উদগ্র আর্তিও একটি অনন্য প্রেমচিহ্ন। সাহাবায়ে কেরাম রসুল সান্নিধ্যের জন্য সদাব্যাকুল থাকতেন। বিচ্ছেদে দগ্ধীভূত হতেন তাঁরা। পবিত্র সৌন্দর্যবিবা দর্শনের জন্য বার বার ছুটে আসতেন তাঁর দরবারে। নিকট সান্নিধ্যে এলে মগ্ন হয়ে যেতেন শান্ত সাগরের মতো। বিচ্ছেদে হয়ে যেতেন অশান্ত জলধি। আশআরীদের কোনো কোনো হাদিসে এসেছে– যখন রসুলশ্রেষ্ঠ স. মদীনা মনোয়ারায় শুভ আগমন করেছিলেন তখন মদীনাবাসীরা প্রশস্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। হজরত বেলাল, হজরত খালেদ এবং হজরত মা'দান থেকেও এ রকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ভালোবাসার নিদর্শন ঃ পাচ

যিনি রসুল স. কে ভালোবাসেন তাঁকে ভালোবাসাও রসুল প্রেমের আর একটি অনন্য নিদর্শন। তাঁর স. শত্রুদেরকে শত্রু ভাবাও রসুলপ্রেমের আলামত। সুতরাং তাঁর পবিত্র বংশধর, সহচরবৃন্দ, আনসার, মুহাজির– সকলকেই ভালোবাসেন রসুল প্রেমিকেরা। কারণ তাঁরা ছিলেন রসুলনিষ্ঠ– ছিলেন তাঁর প্রেমিকদের প্রেমিক এবং দুশমনদের দুশমন। তিনি স. ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেন সম্পর্কে বলেছেন, হে আমার আল্লাহ্! যারা এদেরকে ভালোবাসে তুমিও তাদেরকে ভালোবাসো। তিনি স. আরো বলেছেন, যারা এদেরকে ভালোবাসে তারা আমাকেই ভালোবাসে। আর যারা আমাকে ভালোবাসে তারা ভালোবাসে আল্লাহ্কেও। আর যারা এদের দুশমন তারা আমার দুশমন, আল্লাহ্ পাকেরও দুশমন। তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমা সম্পর্কে বলেছেন, ফাতেমা আমার শরীরের মাংসখণ্ডের মতো। যে ফাতেমার বিরাগভাজন সে আমারও বিরাগভাজন।

হজরত উসামা বিন জায়েদ সম্পর্কে একদিন রসুলপাক স. তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী হজরত আয়শাকে বললেন, হে আমার আয়েশা! তুমি উসামাকে ভালোবাসো কারণ আমি তাকে ভালবাসি। তিনি তাঁর সকল সহচরগণ সম্পর্কে

এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীগণকে তোমরা সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়ো না। তাদের অনুরাগীরা আমাকে ভালোবাসে বলেই তাদেরকে ভালোবাসে। আর যারা তাদের শত্রু তারা প্রকারান্তরে আমারই শত্রু। যারা তাদেরকে কষ্ট দেয় তারা আমাকে কষ্ট দেয়। যারা আমাকে কষ্ট দেয় তারা আল্লাহ্‌কেও কষ্ট দেয়। আর যারা আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়, তাদেরকে অচিরেই পাকড়াও করবেন আল্লাহ্‌পাক।

রসুল আকরম স. আরো বলেছেন, ইমানের একটি নিদর্শন হচ্ছে আনসারগণকে ভালোবাসা। তাদের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন হওয়া মুনাফিকির নিদর্শন। আরো বলেছেন, আরববাসীদেরকে ভালোবাসা আমাকে ভালোবাসার চিহ্ন। আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা প্রকারান্তরে আমার প্রতিই শত্রুতা পোষণ করা।

ভালোবাসা নিদর্শন ঃ ছয়

তাঁর উম্মতকে ভালোবাসাও তাঁকে ভালোবাসার চিহ্ন। রসুল প্রেমিকেরা তাঁর উম্মতের কল্যাণকামী। উম্মতের উপকার সাধন করা এবং তাদেরকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করাই তাঁদের স্বভাববৈশিষ্ট্য। প্রকৃত প্রেমিকেরা প্রিয়জনের সকল প্রিয় অনুষঙ্গকেই ভালোবেসে থাকেন। এটাই প্রেমপথের রীতি। পূর্ববর্তী সাধুপুরুষগণের স্বভাবে চিন্তায় এই রীতিটি ছিলো সদাপ্রোজ্জ্বল। তাঁরা শেষ নবীর উম্মতকে ভালোবাসতেন। তাঁদের প্রার্থনায় সদাউচ্চারিত হতো উম্মতের কল্যাণকামিতা।

সাহাবীগণ রসুল আকরম স. এর প্রাত্যহিক জীবনাচরণকেও হুবহু অনুসরণ করে গিয়েছেন। হজরত আনাস যখন দেখলেন, লাউ তরকারী রসুলের প্রিয় তখন তিনি প্রিয় ব্যঞ্জন হিসেবে গ্রহণ করলেন লাউকে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত হাসান ইবনে আলী, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর প্রমুখ রসুল স. এর পরিচারিকা হজরত সলিমার নিকট প্রশ্ন করে রসুল আকরম স. এর খাদ্য তালিকা জেনে নিয়ে নিজেদের খাদ্যাভ্যাসকেও করে নিয়েছিলেন সে রকম।

ভালোবাসার নিদর্শন ঃ সাত

রসুল আকরম স. কে ভালোবাসার আর একটি নিদর্শন হচ্ছে দ্বীনদার আলেম, সুফী দরবেশ এবং সুন্নতের অনুসারীগণকে মহব্বত করা এবং জাহেল ফাসেক ও বেদাতীদেরকে ঘৃণা করা। অর্থাৎ শরিয়তের বিরুদ্ধাচারীদেরকে অপছন্দ করা। কোরআন মজীদে এরশাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে তাদেরকে আপনি এরকম দেখতে পাবেন না যে, তারা আল্লাহ্ ও রসুলের দুশমনদেরকে ভালোবাসে। এমনকি পিতা-মাতা হলেও।

সাহাবায়ে কেরাম রসুল করীম স. এর সন্তোষসাধনের জন্য তাদের পিতা-পুত্র-ভ্রাতা ও বন্ধু-বান্ধবকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। মুনাফিকেরা একবার বলেছিলো, আমরা যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে সম্মানিতজনেরা অনভিজাতদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিবেই। তাদের দৃষ্টিতে সম্মানিতজনেরা ছিল কাফের ও মুনাফিক আর অনভিজাত ছিলো বিশ্বাসীরা। মুনাফিকদের প্রধান নেতা ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। কিন্তু তার পুত্র ছিলেন বিশুদ্ধ মুমিন। মুনাফিকদের উক্তি শুনে তিনি রসুলেকরীম স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! নির্দেশ করুন এই মুহূর্তে আমি আমার পিতার মস্তক কর্তন করে আনি।

মুনাফিকেরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলো। তিনি তখন দাঁড়ালেন মদীনার প্রধান তোরণে। মুনাফিকশ্রেষ্ঠ পিতা সামনাসামনি হতেই তাকে বললেন, 'বলো আমি মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট আর মোহাম্মদ স. এর সহচরবৃন্দ সর্বাধিক সম্মানিত। একথা না বললে আমি তোমার মস্তক কর্তন করবো।' আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলল, 'সত্যি কি তুমি আমার মস্তক কর্তন করতে পারবে। পুত্র বললেন, অবশ্যই। প্রাণভয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখন বললো, 'হ্যাঁ মোহাম্মদ স. এর সহচরবৃন্দ সর্বাধিক সম্মানিত।'

হুয়াইসা এবং মাহিসা দুই ভাই। তারা ছিল ইহুদী। ছোট ভাই মাহিসা ইমান গ্রহণ করেছিলেন। রসুলপাক স. তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এক দুর্বিনীত ইহুদীকে হত্যা করতে? সে ছিলো চরম অবাধ্য। হুয়াইসা বললো, ওই লোকটিকেই কি তুমি হত্যা করতে চাও, যে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং এখনও যে আমাদের উপর অনুগ্রহশীল। মাহিসা বললেন, আমি রসুলপাক স. এর নির্দেশপ্রাপ্ত। তাকে আমি হত্যা করবোই। ছোট ভাইয়ের কথা শুনে বিস্মিত হলো হুয়াইসা। বললো, তুমি তোমার রসুলকে এতো ভালোবাস! তোমার ধর্ম কি এতই সুন্দর! একথা বলে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

ভালোবাসার নিদর্শন ঃ আট

কোরআনুল করীমকে মহব্বত করাও রসুল পাক স.কে ভালোবাসার আরেকটি নিদর্শন। কারণ তিনি আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন কোরআন যা ভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধারকারী এবং যা প্রকৃত মানবতার পথপ্রদর্শক। আর রসুলপাক স. হলেন কোরআনের বাস্তবরূপ। উম্মত জননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, 'কানা খুলুকুহুল কোরআন' (তিনি কোরআনের চরিত্রে চরিত্রবান)। কোরআন আবৃত্তি করা, অনুধাবন করতে সচেষ্ট হওয়া, কোরআনের উপর আমল করা এবং তার বিধান বাস্তবায়নের প্রয়াসী হওয়াও রসুল পাক স. এর প্রতি ভালোবাসার

একটি অনন্য চিহ্ন। সহল তসতরী বলেছেন, কোরআনের মহব্বত আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মহব্বতের নিদর্শন। সুন্নতে রসুলকে মহব্বত করাও রসুল প্রেমের অন্তর্ভুক্ত। সুন্নতকে মহব্বত করার অর্থ পরকালকে মহব্বত করা। আর পরকালকে ভালোবাসার আলামত হচ্ছে ইহকালের প্রতি বিরাগভাজন হওয়া। ধনসম্পদ অযথা সঞ্চয় না করাই এই বিরাগভাজনতার আলামত। সম্পদ উপার্জন করতে হবে ততটুকই যতটুকু হবে আখেরাতের কল্যাণ লাভের সহায়ক।

আমিরুল মুমিনিন হজরত ওসমান ইবনে আফফান বলেছেন, যারা বিশুদ্ধচিত্ত তাদের অন্তরে থাকে কোরআন অধ্যয়নের অনন্ত তৃষ্ণা। তারা যত পাঠ করেন ততই তৃষিত হন। কেনো হবেন না, তারা যে অন্তহীন ও পবিত্রতম সত্তার কথা শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। যাদের কলব পবিত্র এবং ইমানের আলোয় আলোকিত, তারাই পেয়েছেন এবংবিধ পিপাসিত জীবন।

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি মহব্বতের মাপকাঠি হচ্ছে কোরআন ও হাদিস। প্রিয়জনের কথা শোনার জন্যই মন ও কান থাকে সদা ব্যাকুল। আক্ষেপ! শয়তানী সঙ্গীত ও প্রমোদে যারা লিপ্ত তারা কতই না মূর্খ। তাদের হৃদয় নষ্ট, ভ্রষ্ট এবং বিপর্যস্ত।

কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন রসুল প্রেম ও কোরআন আবৃত্তি আস্বাদ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজন অনুরাগী অন্তর ও সুন্দর কণ্ঠস্বর। তবে সুন্দর স্বর ও সুর ছাড়া যে ব্যক্তি কোরআন আস্বাদনে অসমর্থ সে ব্যক্তি আসলে কোরআনের অনুরাগী নয়। স্বর ও সুরই তার নিকট প্রধান ব্যাপার। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোরআনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাসহ যথা উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত কোরআনেরই একটি অনন্য সৌন্দর্য। তাই হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, সুন্দর স্বরে আবৃত্তি করো, যে এ রকম করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সাহাবায়ে কেরামের কোরআন শ্রবণ সম্পর্কে কোরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে– "রসুলের প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের আবৃত্তি শুনলে আপনি দেখবেন তাদের চক্ষুসমূহ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে– এ জন্য যে, তারা লাভ করেছে আল্লাহ্পাকের মারেফাত।"

সাহাবা কেরামের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সুন্দর ও যথা উচ্চারণসম্পন্ন ক্বারী (কোরআন পাঠক)। তাঁদের পাঠ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হৃদয়কে স্পর্শ করতো। ইমান হতো অধিকতর সমুজ্জ্বল। ওই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন হজরত আবু মুসা আশআরী, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রমুখ।

গভীর রাত্রে স্বগৃহে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করে চলেছিলেন হজরত আবু মুসা আশআরী। রসুল পাক স. সেখানে উপস্থিত হয়ে একপাশে বসে পড়লেন। সারা রাত কোরআন তেলাওয়াত চললো। আবৃত্তিকারী ও শ্রোতা দুজনেই হয়ে রইলেন মগ্ন ও বিভোর। সকাল হলো। রসুল আকরম স. বললেন, কী সুন্দর পাঠ

করো তুমি, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিলাম। হজরত আবু মুসা বললেন, আমি তো আপন মনে বিভোর হয়ে পাঠ করে যাচ্ছিলাম। টের পাইনি কখন এসেছেন আপনি। হে প্রিয়তম রসুল! আপনি এসেছেন জানলে আমি আরও সুন্দর করে পাঠ করতাম।

একদিন রসুলপাক স. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বললেন, কোরআনের কোনো একস্থান থেকে পাঠ করে শোনাও। তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনার সামনে আমি কোরআন পাঠ করবো! কোরআন তো আপনার উপরেই অবতীর্ণ হয়েছে। রসুলপাক স. বললেন, আমি কোরআনের আবৃত্তি শুনতে ভালোবাসি। তিনি কোরআন পাঠ শুরু করলেন। বিমুগ্ধ রসুল স. অশ্রুপাত করতে লাগলেন নীরবে। বদ্ধ পাত্রের ফুটন্ত পানির মত ওঠানামা করতে থাকলো তাঁর পবিত্র বক্ষদেশ।

মাঝে মাঝে শরীরে ব্যথা হতো হজরত ইবনে ওমরের। পথ চলার সময় হঠাৎ কখনও ব্যথা শুরু হলে তিনি মাটিতে পড়ে যেতেন। এরপর কয়েকদিন শয্যাবন্দী হয়ে থাকতে হতো তাঁকে। শয্যাপাশে সমবেত হতেন বন্ধুবর্গ। হজরত আবু মুসা আশআরী সেখানে উপস্থিত হলে তিনি বলতেন, হে আবু মুসা! আমাকে আমার আল্লাহ্‌র কথা শোনাও। তিনি কোরআন পাঠে নিমগ্ন হতেন। অন্যদের সঙ্গে হজরত ইবনে ওমরও আচ্ছন্ন হতেন তেলাওয়াতের সুর মুর্ছনায়।

ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌পাক কিয়ামতের দিন হজরত দাউদকে বলবেন, পৃথিবীতে যে সুমধুর কণ্ঠস্বর আমি তোমাকে দিয়েছিলাম সেই মধুর আওয়াজের মাধ্যমে এখন আমার স্তবস্তুতি বর্ণনা করো। হজরত দাউদ বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীর কণ্ঠস্বর এখানে আমি কি করে পাবো? আল্লাহ্‌পাক বলবেন, পৃথিবীতে যেমন তোমাকে সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী করা হয়েছিলো, এখানেও করা হয়েছে তেমনি। হজরত দাউদ আরশের পাদদেশে দণ্ডায়মান হয়ে তখন শুরু করবেন আল্লাহ্‌পাকের অনন্য গুণকীর্তন। বেহেশতবাসীরা সকল কিছু পরিত্যাগ করে ছুটে আসবে তাঁর কণ্ঠস্বরের দিকে। বিভোর হয়ে পান করবে স্তব ও স্তুতির শারাবান তহুরা। তন্ময় হয়ে শুনবেন সকলে যবুর শরীফের তেলাওয়াত। এরপর উন্মোচিত হবে যবনিকা, মহাতন্ময়তার মধ্যে দীদারে এলাহী লাভে ধন্য হবেন সকলে।

শায়েখ শিহাবুদ্দীন সহরওয়ার্দী বলেছেন, বেহেশতে কোরআনুল করীম আবৃত্তি ও শ্রবণের সময় অনুষ্ঠিত হবে দীদারে এলাহী। ওই তেলাওয়াতের অনুষ্ঠানে ইমানদারদের সকল মতপার্থক্য চিরদিনের জন্য অপসৃত হয়ে যাবে। বেহেশতের ওই সুমহান তেলাওয়াত সম্পর্কে যেমন কোনো মতভেদ নেই, তেমনি পৃথিবীতেও কোরআনের সুমধুর আবৃত্তির বৈধতা সম্পর্কে মতবিরোধ নেই। মতপার্থক্য রয়েছে সাঙ্গীতিক ছন্দ ও তাল লয়ের মাধ্যমে কবিতা পাঠের বিষয়ে। একদল বলেন,

এরকম সঙ্গীত নির্ভর কবিতা আল্লাহ্পাকের সমীপবর্তী হওয়ার সহায়ক। অপরদল বলেন, এটা সম্পূর্ণতঃই ভ্রষ্টতা। কিন্তু দুই দলেরই মন্তব্য বাড়াবাড়ি পর্যায়ের।

কোরআনের মহব্বত সম্পর্কে এ পর্যন্ত কেবল তেলাওয়াতের মর্যাদার বিষয়টি আলোচনা করা হলো। কোরআনের অনুসরণ ও আমলের প্রসঙ্গটি অবশ্য আরও অধিক মর্যাদামণ্ডিত। এই কোরআন মজীদই হচ্ছে দ্বীন, ধর্ম, নবুয়ত ও রেসালাতের প্রমাণ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এই কোরআন এবং তোমাদের প্রতি আমি অবতীর্ণ করেছি সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্টকারী নূর।

নির্লিপ্ততা, ত্যাগ, দারিদ্র এবং কোরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া রসুল করীম স. এর ভালোবাসার বিভিন্ন নিদর্শন। তিনি স. এরশাদ করেছেন, যার প্রতি দারিদ্র বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে, সে হচ্ছে উচ্চ আকাশ থেকে দ্রুত পতনশীল অশ্ব অপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী। এক ব্যক্তি রসুল পাক স. কে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি স. বললেন, যা বলতে চাও– ভেবে চিন্তে বলো। লোকটি আবারও বললো, আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি স. বললেন, যদি তাই হয় তবে দারিদ্র গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি আল্লাহ্তায়ালাকে ভালোবাসি। তিনি স. বললেন, তাহলে তুমি বালামুসিবত সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। শায়েখ আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী কাদেরী শাজেলী বলেছেন, আমাদের মোর্শেদ মুরিদ হয়ে আল্লাহ্র পথে অগ্রসর হওয়ার সময় বলতেন বিত্তাধিকারী হওয়া অপেক্ষা দারিদ্র হওয়া উত্তম। আমাদেরকে মুরিদ করানোর সময়ও তিনি ওই কথাটি স্বীকার করতে বলতেন, তারপর মুরিদ করতেন। এই ঘটনাটির মাধ্যমে ওই সকল সুফীর বক্তব্য অসার প্রমাণ হয়ে যায়, যারা দুনিয়ার লালসায় বন্দী থাকা সত্ত্বেও দাবী করে যে, অনুসরণের সকল স্তর তারা অতিক্রম করে ফেলেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন– পরবর্তী আগমনকারীদের কেউ কেউ হবে কেতাবের উত্তরাধিকারী। তারা দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে এবং একথাও বলবে যে, অচিরেই আমরা ক্ষমার্হ হবো।

কল্যাণকামিতা

রসুলুল্লাহ স. এর প্রতি অর্থাৎ তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া, বিশুদ্ধতা বজায় রাখা, প্রকাশ্য গোপন সকল ক্ষেত্রে তাঁর অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। হাদিস শরীফে এসেছে, আদদীনুন নাসিহা (কল্যাণকামিতার নামই ধর্ম)। সাহাবায়েকেরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া

রসুলাল্লাহ এই কল্যাণকামিতা কার জন্য। তিনি স. বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা, তাঁর রসুল, কোরআন মজীদ এবং সাধারণ ও বিশেষ মুসলমানদের জন্য। এক বর্ণনায় এসেছে কল্যাণকামিতা বা খয়েরখাহি করতে হবে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও সমগ্র মুসলমান জনতার জন্য। এই হাদিসটি জামে কালামের (সমষ্টিভূত বক্তব্যের) অন্তর্ভুক্ত। হাদিসটির মধ্যে নিহিত রয়েছে ধর্মজ্ঞান ও সৌন্দর্য। জামেউল কালাম বলা হয় ওই হাদিসকে যা শব্দগত দিক থেকে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মর্মগত দিক থেকে বিশাল। এই সংক্ষিপ্ত বাণীসমূহের মধ্যে রয়েছে রসুলপাক স. এর অনন্য সাধারণ মহিমা ও মর্যাদা। এ সম্পর্কে তিনি স. বলেছেন, আমাকে দেয়া হয়েছে জামে কালাম যা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থবাহী। সত্যি জামে কালাম সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধক ও ব্যাপক অর্থ নির্দেশক।

নসীহত শব্দের শাব্দিক অর্থ– বিশুদ্ধতা বা পরিচ্ছন্নতা। যে মধুতে মোম একেবারেই নেই, আরববাসীরা তাকে বলে মাসানুন নাসেহুন। হাদিস শরীফে উল্লেখিত নসীহত শব্দটির প্রকৃত অর্থ– মঙ্গলকামনার সঙ্গে কারও হক আদায় করা। সুতরাং সুবিবেচনা ও মঙ্গলকামনার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার হক আদায় করার অর্থ হচ্ছে– তাঁর অস্তিত্ব ও গুণবত্তার দৃষ্টান্তহীন অনন্যসাধারণত্বের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস রাখা। তাঁর জাত ও সেফাতের প্রতি আরোপিত বিকৃত ধারণাসমূহকে অপসারিত করা। শরিয়তের আদেশ ও নিষেধসমূহের যথাবাস্তবায়নও নসীহত বা সুবিবেচনার অন্তর্ভুক্ত। জেহাদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ওই সকল মাধ্যম বা উপকরণকে প্রস্তুত করতে হবে, যা ধর্মের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক। আর এলেম ও আমলকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিশুদ্ধতার (এখলাসের) উপর।

রসুল আকরম স. এর প্রতি কল্যাণকামিতার অর্থ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থায় তাঁর প্রবর্তিত আদর্শকে সমুন্নত রাখা, সমুজ্জ্বল সুন্নতকে বিজয়ী করা এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে প্রতিহত করা। নিজের জীবনকে করতে হবে তাঁর পবিত্র স্বভাববৈশিষ্ট্যের প্রতিভূ। ইয়াহইয়া ইসহাক বলেছেন, রসুলপাক স. এর খয়েরখাহী করার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা বিশ্বাস করা। সুন্নতসমূহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। তাঁর আদর্শের ব্যাপক বিস্তার ঘটানো এবং তাঁর শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত হওয়া। মানুষকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদানও এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রসুলের প্রতি এবং কিতাবের প্রতি। এই খয়েরখাহী তাঁর পৃথিবীর জীবনে যেমন করা সম্ভব ছিলো তেমনি তাঁর মহাতিরোধানের পরও করা সম্ভব। পৃথিবীর জীবনে তাঁর পবিত্র সংসর্গধন্য পবিত্র সহচরবৃন্দ তাঁর আদেশ নিষেধ বাস্তবায়নে সদা প্রস্তুত থাকতেন। অকুণ্ঠচিত্তে জীবন ও সম্পদকে ধর্মের পথে উৎসর্গ করার জন্য সদা ব্যাগ্র থাকতেন তাঁরা। প্রয়োজনে

যুদ্ধ করতেন। হতেন শহীদ কিংবা গাজী। তাঁর মহাতিরোধানের পরও উম্মতের জন্য খয়েরখাহী ওয়াজিব। এখনও তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতে হবে। তাঁর ভালোবাসাকেই করতে হবে সুখ ও দঃুখের একমাত্র অবলম্বন। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সুন্নতের অনুপম শিক্ষা। অর্থ ব্যয় করতে হবে দ্বীনের জন্য। ভালোবাসতে হবে তাঁর আহলে বাইতকে ও তাঁর সম্মানিত সহচরদেরকেও। যারা সুন্নতের শত্রু তাদের প্রতি প্রকাশ করতে হবে বিরাগ। সুন্নতের অনুসারীদের প্রতি থাকতে হবে ভালোবাসা। সুন্নত এবং কেবল সুন্নতই হতে হবে জীবনের মূল লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য। যে সকল চিন্তা ও কর্ম তাঁর রেসালাতের পরিপন্থী সে সব থেকে পবিত্র জানতে হবে তাঁকে। প্রদর্শন করতে হবে তাঁর প্রতি যথাযোগ্য আদব ও সম্মান। আল্লাহ্পাকই একমাত্র উপাস্য। তাঁর অস্তিত্ব, গুণ ও কর্ম আকার প্রকারহীন, অবিভাজ্য ও অতুলনীয়। এই বিশ্বাসে স্থির হওয়ার সাথে সাথে অন্য সকল পূর্ণতা ও সৌন্দর্য যে কেবল এককভাবে রসুলপাক স. এর জন্য সংরক্ষিত একথাটিও মেনে নিতে হবে। রসুল আকরম স. কে ভালোবাসলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সকল কিছুকেও ভালোবাসতে হবে। তাই ভালোবাসতে হবে আলেম সমাজকে, অলি দরবেশকে, তাঁর পবিত্র বংশধরকে, সহচর ও নিকট জনদেরকে। ভালোবাসতে হবে সেই সকল শহর ও জনপদকেও, যেগুলো ছিলো তাঁর পবিত্র পদযুগলের স্পর্শধন্য।

আমর ইবনে লায়িস ছিলেন খোরাসানের বাদশাহ্। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিধর, বিপুল বিত্তাধিকারী। জনগণের সেবক হিসাবেও যশস্বী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দর্শন পেয়ে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্পাক আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। লোকটি বললেন, কোন আমলের বিনিময়ে আল্লাহ্পাক আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন? বাদশাহ্ বললেন, আমার জীবদ্দশায় একদিন আমি এক পাহাড়ে আরোহণ করে দেখতে পেলাম পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে আমারই সুসজ্জিত বিশাল সেনাবাহিনী। তখন আমি মনে মনে ভেবেছিলাম আমি যদি এই বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রসুলপাক স. এর সাহায্যকারী হিসাবে তাঁর কোনো এক জেহাদের অনুগামী হতে পারতাম। আমার ওই সৎ ভাবনার কারণেই আল্লাহ্পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, বাদশাহ্ তখন বলেছিলেন, হায়! কারবালার প্রান্তরে অবরুদ্ধ ইমাম হোসাইন এবং আহলে বাইতের সঙ্গী হয়ে দূরাচার এজিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি যদি আমার এই বিশাল বাহিনীসহ লড়াই করার সুযোগ পেতাম।

কিতাবুল্লাহর প্রতি খয়েরখাহী বা সদাচরণের অর্থ হচ্ছে কোরআন পাকের উপর ইমান আনা এবং তার নির্দেশাদির উপর আমল করা। কোরআনের আয়াতের উপর চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। মূল বক্তব্য বুঝবার জন্য সাধনা করে যেতে

হবে। আবৃত্তির সময় পবিত্রতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সুমধুর স্বরে কোরআনের মাহাত্ম্যকে স্মরণে রেখে একাগ্রচিত্তে তেলাওয়াত করতে হবে। এজন্য অধিকারী হতে হবে সংবেদনশীল অন্তরের। পথভ্রষ্টদের অতি ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা সম্পর্কে থাকতে হবে সচেতন। সন্দেহ ও বিশ্বাস পরস্পর বিপরীত বস্তু। সুতরাং কোরআনের ক্ষেত্রে সন্দেহের প্রশ্রয় দেয়া যাবে না কিছুতেই। কোরআনের মনগড়া তাফসীর করা যাবে না। যে তাফসীরের সনদ নেই এবং যা সলফে সালেহীন থেকে সংকলিত নয়, তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। এ যামানার আবুল ফজল (বাদশাহ আকবরের নবরত্নের একজন) কোরআন মজীদের অপব্যাখ্যাকারী। সুতরাং তার তথাকথিত তফসীরুল কোরআন পরিত্যাজ্য। কতোইনা মূর্খ আবুল ফজলের সম্প্রদায়েরা (বর্তমান সময়ের মওদুদীরা। অনুবাদক)। এরা সম্ভবতঃ জানে না অথবা মানে না যে, হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোরআনের মনগড়া তাফসীর করে সে কাফের। আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন।

সাধারণ মুসলমানদের প্রতি খয়েরখাহীর তাৎপর্য হচ্ছে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা। সকলকে কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করা। দ্বীন-দুনিয়ার কথায় ও কাজে শুভাকাঙ্খী ও সাহায্যকারী হওয়া। উদাসীনদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। অন্ধদেরকে দিতে হবে পথের সন্ধান। সম্বলহীনদেরকে সাহায্য করতে হবে। মুসলমান ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন করে যেতে হবে। সকলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ক্ষতিকর বিষয় থেকে। জীবন, সম্পদ এবং সম্মান রক্ষা করতে হবে সকলের। ছোট মনে করা যাবে না কাউকে। কষ্ট দেয়া যাবে না। বচসায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। কথা বলতে হবে শ্রোতাদের জ্ঞানানুপাতে। সাধারণ্যে উপস্থাপন করা যাবে না সূক্ষ্ম ও রহস্যপূর্ণ কোনো প্রসঙ্গ। আলেমদের বিদ্যা ও বুদ্ধিজাত বিষয়সমূহও প্রচার করা যাবে না সাধারণভাবে।

বিশেষ মুসলমানদের প্রতি সদাচরণের বিষয়টি এরকম– মুসলমান বাদশাহ্ ও শাসকদের আনুগত্য করতে হবে। বৈরীতা নয়, সহযোগিতা করতে হবে তাদেরকে। সৌজন্য, শিষ্টাচার ও বিনয়ের মাধ্যমে তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে পুণ্যার্জনের কথা, আল্লাহ্ভীতির কথা। মুসলমানদের অধিকার পরিপূরণের বিষয়ে অমনোযোগী হলে তাদেরকে সজাগ করে দিতে হবে। তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করার খেয়ালকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। জনবিশৃঙ্খলা ঘটানো যাবে না। রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক গৃহীত জনহিতকর কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সকলকে। বাদশাহ্ বা শাসক যদি কঠোর হন, তবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাদের সুমতির জন্য দোয়া করে যেতে হবে।

কোনো কোনো অনারব সূফী ও মাশায়েখ বলেছেন, বিশেষ মুসলমান তিন ধরনের ১. আমীর বা শাসক (উলুল আমর– যারা লাভ করেছেন হুকুম জারির নৈতিক অধিকার)। এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, প্রতিটি পরিবারের প্রধান

পুরুষও উলুল আমর বা আমীর। শিক্ষকও উলুল আমর শিক্ষার্থীদের উপর। পিতা ও সন্তানের উপর তেমনি। এই নিয়মে প্রজা সাধারণের শাসন কর্তারা উলুল আমর। ২. ওলামায়ে কেরাম বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্মান করা এবং তাদের কথা বিশ্বাস করা ওয়াজিব। যদি তাদের কথা দ্বীনের অনুকূল হয় তবে তাঁরা দলিল পেশ করতে থাকেন কোরআন ও হাদিস থেকে। কিন্তু তারা যদি ইহকালাসক্তির কারণে ধর্মের নামে শঠতা ও প্রবঞ্চনামূলক কথা বলে, তবে তা বিশ্বাস করা যাবে না। ৩. তরিকতের পীর মাশায়েখ যাঁরা জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার সাথে সৎকর্মময় জীবন গড়ে তোলেন তাঁরা সদাসর্তক, সুন্নাহনুগ, আল্লাহ্র প্রতি অধিকার সচেতন, মোহমুক্ত, আল্লাহ্র জিকিরে সদাজাগ্রত হৃদয়ের অধিকারী। তাঁরা শরিয়ত ও তরিকতের পূর্ণতা সাধনের পর হকিকতের নূর ও এলমুল আসরার অর্জন করে কামালিয়াত লাভ করে থাকেন। শরিয়ত ও হকিকতের সমন্বয় সাধনকারী এ সকল সত্যনিষ্ঠ পীর মাশায়েখগণকেও মানতে হবে– যদি তাঁরা শরিয়তের অনুকূল অবস্থায় থাকেন। শরিয়তবিরোধী সকল কথাই পরিত্যাজ্য। আর দ্ব্যর্থবোধক কথার ক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বনকরাই শ্রেয়। তবে বক্তব্য প্রদানকারী মাশায়েখ যদি পরেহেজগার ও জ্ঞানে সুগভীর হন তবে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর কথার শরিয়তসম্মত ব্যাখ্যা করাই সমীচীন। প্রকাশ্যতঃ পথভ্রষ্টতার ইঙ্গিত পরিদৃষ্ট হলে বর্জন করাই উত্তম।

একটি কথা স্পষ্ট জানা প্রয়োজন যে, ইসমত (নিষ্পাপত্ব) কেবল নবী ও রসুলগণের জন্যই নির্ধারিত। তাঁরা ছাড়া আর কাউকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ মনে করা যাবে না। বিশিষ্ট আলেম সাহাবী হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল অন্তিমকালে বলেছিলেন, শরিয়ত বিরোধী সকল বিষয়কে অস্বীকার করো এবং প্রতিহত করো।

রসুল পাক স. এর খয়েরখাহী সম্পর্কে এতোক্ষণ ধরে যা বলা হলো, তা-ও রসুল প্রেমের নিদর্শন বটে। প্রিয়জনের আলোচনা যত দীর্ঘ হয় ততই সুন্দর। কাযী আয়ায তাঁর রচিত গ্রন্থে হাদিসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল স. এর খয়েরখাহী সম্পর্কে দু'টি পৃথক অধ্যায়ে অবতারণা করেছেন। তাছাড়া হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে– কল্যাণকামীতাই ধর্ম। তাই আমি এ প্রসঙ্গটিকে দীর্ঘ করেছি। এতে করে হয়তো কোনো কোনো বিষয়কে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করতে হয়েছে। আশা করি এই পুনরাবৃত্তিও সকলের নিকট সুন্দর বলে অনুমিত হবে। কারণ, রসুল স. এর সুন্দর জীবনাদর্শ মেশকআম্বর সদৃশ। এ প্রসঙ্গকে যতই আন্দোলিত করা যাবে ততই ছড়িয়ে পড়বে সুবাস। মোট কথা আল্লাহ্, কিতাব, রসুল, আম ও খাস মুসলমান– এ সকল আলোচনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রসুলের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের অনুষঙ্গটি। উম্মতের উপর তাঁর অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্যই এতক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সাহাবায়ে কেরামের মান্যতা

সাহাবায়ে কেরামের রসুলমান্যতা সম্পর্কে হজরত আমর বিন আস থেকে একটি সুদীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রসুল পাক স.-ই ছিলেন আমার সর্বাধিক প্রিয়জন। তিনি ছিলেন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সর্বাধিক সম্মানিতজন। এরকম আমি আর কাউকেই দেখিনি। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের দিকে এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকা যেতো না। তাই তাঁকে দেখে আমার চোখ পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হতো না। আমার নিকট কেউ তাঁর পবিত্র অবয়ব সম্পর্কিত বিবরণ জানতে চাইলে আমি সেই বিবরণ দিতে সক্ষম হবো না। কারণ তাঁর সামনে দৃষ্টি উত্তোলনের সাহস আমার ছিলো না।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল আকরম স. গৃহাঙ্গণের বাইরে আনসার ও মোহাজির সাহাবীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন সকল সমাবেশের মধ্যমনি। হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের মাঝখানে উপবেশন করতেন তিনি। কিন্তু তাঁরাও তাঁর দিকে তাকাতে সাহস করতেন না। এরকমই ছিলো তাঁর মহত্ব, মর্যাদা ও পরাক্রম। তিনি মৃদু হেসে তাঁদের দিকে এবং অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে কথা বলে যেতেন, যতটুকু বলার প্রয়োজন হতো। গাম্ভীর্য ও ভালোবাসার এক অসাধারণ অবস্থায় পরিকীর্ণ থাকতো তাঁর পবিত্র দরবার। তিরমিজি।

হজরত উসামা বলেছেন, আমি একবার রসুল পাক স. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। দেখলাম তাঁর সকল সহচর এমনভাবে বসে আছেন যেনো সকলের মাথায় উপবিষ্ট রয়েছে পাখি (একটু নড়াচড়া করলেই উড়ে যাবে)। প্রথমোক্ত হাদিসটিতেও রসুলপাক স. এর অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা শেষে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. যখন কিছু বলতেন তখন সাহাবায়ে কেরাম মস্তক অবনত করে দিতেন এবং এমন স্থির বসে থাকতেন, যাতে করে মনে হতো তাঁদের মাথায় বসে রয়েছে পাখি।

হজরত উরওয়া বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ আমাকে রসুল স. এর নিকট প্রেরণ করলো। আমি গিয়ে দেখলাম তিনি অজু করছেন। আর সেই অজুর ব্যবহৃত পানি সংগ্রহের জন্য সাহাবীগণের মধ্যে শুরু হয়েছে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে হচ্ছিলো এই নিয়ে যেনো সকলে যুদ্ধ শুরু করে দিবেন। পানির একটি ফোঁটাও তাঁরা মাটিতে পড়তে দিচ্ছে না। তাঁর পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিধৌত পানি যে যতটুকু পাচ্ছেন ততটুকুই মেখে নিচ্ছেন নিজেদের মুখে ও শরীরে। আমি আরও দেখলাম তাঁর পবিত্র শরীরের পশমও সযত্নে সংগ্রহ করছেন সাহাবায়ে কেরাম। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে নির্দেশ প্রতিপালিত হচেছ। তিনি কথা বলছেন, আর সে কথা

গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনে যাচ্ছেন তাঁরা। সকলের দৃষ্টি অবনমিত। তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস কারো নেই। আমি দেখলাম সম্মান প্রদর্শনের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। দেখলাম নবুয়তের অশ্রুতপূর্ব প্রতাপ। এসব দেখে কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের নিকট ফিরে গেলাম আমি এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়, আমি পারশ্য, রোম ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর রাজ দরবারসমূহ দেখেছি। আল্লাহ্‌র কসম, কোনো দরবারের সম্রাটেরা মোহাম্মদ স. এর মর্যাদা ও প্রতাপের সমকক্ষ নন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, কোনো সম্রাটই তার অমাত্যবর্গ থেকে ওরকম সম্মান পান না, যে রকম সম্মান লাভ করেন মোহাম্মদ স. তাঁর সহচরবর্গ থেকে।

হজরত আনাস থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মাথার চুল কাটবার সময় রসুল পাক স. কে ঘিরে দাঁড়িয়ে যেতেন সাহাবীগণ। কর্তিত কেশ মাটিতে পড়তে পারতো না। হাত বাড়িয়ে সেগুলো ধরে ফেলতেন তাঁরা। শেষে কর্তিত চুলগুলোকে একত্রিত করতেন রসুল পাক স.। তারপর সেগুলোকে বণ্টন করে দিতেন।

রসুলমান্যতার আরেকটি ঘটনা হচ্ছে এই, হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রসুল পাক স. হজরত ওসমানকে মক্কায় প্রেরণ করলেন। সন্ধি সম্পর্কিত আলোচনা চূড়ান্ত করার নিমিত্তে দূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত ওসমান। কুরায়েশেরা তাঁকে কাবা শরীফ তাওয়াফের অনুমতি দিলেন। হজরত ওসমান বললেন, না। রসুল স. তাওয়াফ করার পূর্বে আমি তাওয়াফ করতে পারবো না। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ওসমানের নিকট বায়তুল্লাহ তাওয়াফ অপেক্ষা রসুলুল্লাহ স. এর সম্মানই ছিলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত অবস্থা এটাই। জেনে রাখা উচিত যে, কোনো আমল ইবাদতই রসুল পাক স. এর প্রতি আদব প্রদর্শনের সমতুল্য নয়।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম কামনা করতেন, কোনো বেদুঈন এসে যেনো রসুল স. এর নিকট দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। আর তাঁরা রসুল স. এর পবিত্র জবাব শুনে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন। তাঁরা ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব সম্মান প্রদর্শনকারী। তাই প্রশ্ন করার সাহস তাঁদের হতো না।

কাইলা নামক জনৈক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি রসুল পাক স. কে কারকাসা নামক আসনে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। দেখামাত্র আমার শরীর কম্পিত হতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে শেষে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। হজরত মুগীরা বলেছেন, রসুল স. এর দরজায় করাঘাত করার সাহস পেতেন না সাহাবায়ে কেরাম। উপায়ান্তর না দেখলে হাতের আঙ্গুল দ্বারা দরজায় মৃদু আঘাত করতেন। আর চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত থাকতেন এই ভেবে যে, হয়তোবা আল্লাহ্‌র

রসুলের বিশ্রামের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হলো। হজরত বারা ইবনে আজিব বলেছেন, আমি মনে মনে একটি প্রশ্ন এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মুখে প্রকাশ করতে সাহস করিনি। অথচ তিনি স. ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও প্রফুল্লচিত্ত। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ছিলো তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা। আর তিনি বিশেষভাবে ভালোবাসতেন ফকির ও দরিদ্র জনতাকে।

হাদিস শরীফ বর্ণনাকালে আদব প্রদর্শন

আমর ইবনে মায়মুন বলেছেন, আমি হজরত ইবনে মাসউদের নিকট এক বৎসর নিয়মিত যাতায়াত করেছি, কিন্তু একদিনও তাঁকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন ব্যতিরেকে ক্বলা রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনিনি। তবে একদিন অন্যমনস্কভাবে তাঁর মুখ দিয়ে ক্বলা রসুলুল্লহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারিত হয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে একথা বুঝতে পেরে চরমভাবে লজ্জিত ও মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন তিনি। তাঁর চেহারার রঙ হয়ে গিয়েছিলো ফ্যাকাশে। লজ্জায় ও ভয়ে তিনি স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তখন তাঁর চেহারা ধারণ করেছিলো মৃত্তিকা বর্ণ। অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছিলো চোখ থেকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এমনভাবে তিনি কাঁদছিলেন যে, গলার রগগুলো ফুলে ফুলে উঠছিলো।

মালেক ইবনে আনাস একদিন হজরত আবু হাজেমের নিকট গিয়েছিলেন। মালেক ইবনে আনাস বলেন, তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে সরে গেলাম। কারণ, মজলিশে আমি বসার জায়গা পাচ্ছিলাম না। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাদিস শোনাও আমার মনঃপুত হচ্ছিলো না। তিনি আরও বলেছেন, একবার এক লোক হজরত ইবনে মুসাইয়্যেবের নিকট একটি হাদিস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হজরত ইবনে মুসাইয়্যেব কাৎ হয়ে শুয়ে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন তিনি। তারপর আদবসম্মতভাবে উপবেশন করে হাদিস সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিলেন। লোকটি বললো, আপনি এভাবে কষ্ট করবেন জানলে আমি প্রশ্ন করতাম না। তিনি বললেন, এভাবে শুয়ে শুয়ে হাদিস বর্ণনা করাকে আমি আদবসম্মত মনে করি না।

মোহাম্মদ ইবনে সিরিন ছিলেন সদাহাস্যময়। সবসময় তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে থাকতো মৃদু হাসির চিহ্ন। কিন্তু হাদিস শরীফ বর্ণনাকালে তিনি হয়ে যেতেন গম্ভীর ও বিনয়ী এবং অবনতমস্তকে উপবেশনকারী বক্তা অথবা শ্রোতা।

আবু মুসআব বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ স. এর হাদিস বর্ণনাকালে ইমাম মালেক অজু করে নিতেন। এটাই ছিলো তাঁর স্বভাব।

জাফর ইবনে মোহাম্মদ মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, মালেক ইবনে আনাস হাদিস শরীফ বর্ণনার পূর্বে অজু

করতেন। তারপর এজন্য বিশেষভাবে তৈরী পোশাক পরিধান করে হাদিস শরীফের বর্ণনা দিয়ে যেতেন। এরকম করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রসুলের বাণী। এ কোনো সাধারণ কথা নয়। এই পবিত্র বাণীর যথাবিহিত মর্যাদা প্রদর্শন করা জরুরী।

মুতরেফ বলেছেন, সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ইমাম মালেকের গৃহের নিকট উপস্থিত হলে প্রথমে তাঁর বাদী এসে জিজ্ঞেস করতো, আপনারা কি শায়েখের নিকট হাদিস শরীফ শুনতে এসেছেন, না মাসআলা? 'আমরা মাসআলা জানতে এসেছি'— সাক্ষাৎপ্রার্থীরা একথা বললে একটু পরেই ঘরের বাইরে এসে তিনি মাসআলার জবাব দিতেন। আর সাক্ষাৎপ্রার্থীরা হাদিস শরীফ শোনার কথা বললে তিনি প্রথমে গোসলখানায় চলে যেতেন। গোসলের পর পরে নিতেন নূতন পোশাক। তারপর আতর লাগাতেন। মাথায় পাগড়ী পরতেন। কালো ও সবুজ বর্ণের জুব্বা পরিধান করে বাইরে এসে উপবেশন করতেন তাঁর বিশেষ আসনে। মজলিশে আতর ছড়ানো হতো। জ্বালানো হতো লোবান। এটাই ছিলো তাঁর হাদিস শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি। তিনি চলন্ত এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় হাদিস বর্ণনাকে মাকরূহ মনে করতেন। আর অজুবিহীন অবস্থায় হাদিস বর্ণনাকে মাকরূহ মনে করতেন সলফে সালেহীনগণ। হজরত আ'মাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি অজু করতে অপারগ হলে তায়াম্মুম করে হাদিস বর্ণনা করতেন।

হজরত কাতাদা বলেছেন, একদিন ইমাম মালেক আমাদের সম্মুখে হাদিস বর্ণনা করছিলেন। হঠাৎ একটি বৃশ্চিক এসে তাঁর শরীরে একে একে ষোলোবার দংশন করলো। বিষে বিবর্ণ হয়ে গেলেন তিনি। চেহারা হয়ে গেল হলুদাভ। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবে হাদিসের বিবরণ শেষ করলেন। মজলিশ শেষে সকলে চলে গেলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! আজ আপনার বিস্ময়কর ধৈর্য অবলোকন করে আমি ধন্য। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি রসুল আকরম স. এর হাদিস শরীফের মর্যাদা রক্ষার্থে ধৈর্যধারণ করেছি।

ইবনে মাহদী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি ইমাম মালেকের সঙ্গে আমীক নামক উপত্যকায় পৌঁছলাম। মদীনা থেকে অনতিদূরেই ছিলো ওই উপত্যকাটি। কবিরা তাদের কবিতায় ওই উপত্যকার অনেক প্রশস্তি গেয়েছেন। রসুল পাক স. সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে উপত্যকাটি ছিলো বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত। মাহদী বলেছেন, আমি ইমাম মালেকের নিকট ওই উপত্যকা বিষয়ে হাদিস শুনতে চাইলাম। তিনি বললেন, আমিতো মনে করেছিলাম তুমি পথিমধ্যে এ ধরনের প্রশ্নের অবতারণা করবে না। এখন আমরা পদবিক্ষেপরত। অথচ তুমি হাদিস শরীফ শুনতে চাও।

জাবীর আবদুল মজীদ ছিলেন এক শহরের কাযী। তিনি একবার ইমাম মালেকের নিকট রসুল পাক স. এর হাদিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। ইমাম মালেক

তখন ছিলেন দণ্ডায়মান অবস্থায়। তিনি নির্দেশ দিলেন এই কাযী সাহেবকে জেলখানায় নিয়ে যাও। উপস্থিত জনতা বললো, তিনি এই শহরের কাযী। তিনি তখন বললেন, কাযীকেই বেশী করে আদব শিক্ষা দেয়া উচিত।

হিশাম ইবনে আম্মার একবার ইমাম মালেকের নিকট জানতে চাইলেন, দণ্ডায়মান অবস্থায় হাদিস বর্ণনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসটি আমাদেরকে বলুন। ইমাম মালেক তাঁকে বিশটি বেত্রাঘাত করলেন। তারপর আদর করে বিশখানা হাদিসও শুনিয়ে দিলেন। হিশাম বলেছেন, আমি তখন কামনা করছিলাম আমাকে আরও বেত্রাঘাত করা হোক। তাহলে বিনিময়ে আমি আরও অধিক হাদিস শোনার সুযোগ পাবো। আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ বলেছেন, ইমাম মালেক ও শায়েখ লাইছ অজু করে নিয়ে হাদিস শরীফ লিপিবদ্ধ করতেন। ইমাম বোখারী সহিহ আল বোখারীতে উল্লেখিত প্রতিটি হাদিস লেখার আগে গোসল করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নিতেন। কেউ কেউ বলেছেন তিনি জমজমের পানি দ্বারা গোসল করে নিতেন এবং মাকামে ইব্রাহিমে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন।

আহলে বাইত ও উম্মতজননীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

রসুল আকরম স. এর পবিত্র বংশধর এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তাঁদের প্রতি আদব সম্মান প্রদর্শন করাও রসুল মান্যতার আওতাভূত। উম্মতেরা এরকম করতে বাধ্য। কারণ, রসুল আকরম স. নিজেই এরকম মর্যাদা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশের প্রতি যথামান্যতা ছিলো পূর্ববর্তী সাধু পুরুষগণের (সলফে সালেহীনের)। রসুল পাক স. ছিলেন আল্লাহ্তায়ালার প্রিয়তম জন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিতজনেরাও আল্লাহ্পাকের প্রিয়ভাজন। প্রকৃত কথা এই যে, ওই ব্যক্তিকে অতি অবশ্যই ভালোবাসতে ও সম্মান করতে হবে যিনি রসুল পাক স.কে ভালোবাসেন। আর রসুলপাক স.কে ভালোবাসা প্রকারান্তরে আল্লাহ্কেই ভালোবাসা। অপরপক্ষে রসুল স. এর দুশমন যারা তাদেরকে দুশমন মনে করাও রসুলপ্রেমের নিদর্শন। প্রেমপথের রীতি এই যে, প্রিয়জনের প্রিয় যারা তাদেরকেও ভালোবাসতে হবে। প্রিয়জনদের প্রিয়ভাজনদের প্রতি শত্রুতা রাখলে প্রিয়জনের প্রতিও শত্রুতা হতে বাধ্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন—

'হে রসুল, আল্লাহ্ ও রসুলে বিশ্বাসী এমন কাউকে আপনি পাবেন না যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দুশমনদেরকে ভালোবাসে।' সুতরাং আহলে বাইত, সাহাবায়ে কেরাম এবং নবীপত্নীগণকে ভালোবাসা ওয়াজিব। তাঁদের প্রতি অসন্তোষ কিংবা হিংসা আত্মহননের নামান্তর। সৌভাগ্য নির্ভর করে ভালোবাসার উপরেই, আর হতভাগ্যতা নির্ভর করে ঘৃণার উপর। প্রেমিকেরা লাভ করেন নূর।

আর হিংসুকেরা লাভ করে বঞ্চনা। আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, ‘হে আহলে বাইতগণ! আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করতে চান এবং পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দিতে চান তোমাদেরকে।’ আর নবীপত্নীদের সম্পর্কে বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্পাকের নির্দেশ এসেছে এরকম ‘রসুলের স্ত্রীগণ তোমাদের জননী।’

আহলে বাইত কারা– সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পরিদৃষ্ট হয়। কেউ কেউ বলেছেন, জাকাত ও সদকা গ্রহণ যাঁদের জন্য হারাম তাঁরাই আহলে বাইত। আর তাঁরা হচ্ছেন– হজরত আলী, হজরত জাফর, হজরত আকীল এবং হজরত আব্বাসের বংশধর। কেউ বলেছেন, রসুল আকরম স. এর সন্তান-সন্তুতি ও তাঁর সাধ্বী সহধর্মিণীগণ হচ্ছেন আহলে বাইত। কেউ আবার বলেছেন, আহলে বাইত বলতে বিশেষভাবে বুঝতে হবে হজরত ফাতেমা, হজরত ইমাম হাসান, হজরত ইমাম হোসাইন এবং হজরত আলীকে। এ সকল ব্যাখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে এভাবে যে, আহলে বাইতের অবস্থা তিন ধরনের। ১. বাইতে নসব, ২. বাইতে সুকনা এবং ৩. বাইতে বেলাদাত। সুতরাং বংশধর হিসাবে হজরত আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরেরা আহলে বাইত। সহ বসবাস বা সুকনা হিসাবে তাঁর স. পবিত্র পত্নীগণও আহলে বাইত। আর জন্মগতভাবে আহলে বাইত হচ্ছেন হজরত ফাতেমা, তাঁর নয়নমণিদ্বয় ও হজরত আলী। হজরত আলী অবশ্য পরিণয় সূত্রে আহলে বাইতের এই মূল বৃত্তের সদস্য।

হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলপাক স. বলেন, আমি তোমাদের নিকট দু’টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। ওই দু’টিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং অন্যটি হচ্ছে আমার বংশধারা। চিন্তা করে দ্যাখো এ দু’টি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ তোমাদের নেই। তিনি স. আরও বলেছেন, নবীবংশের পরিচিতি লাভ দোজখ মুক্তির ওসিলা। আর মোস্তফা বংশকে ভালোবাসা অর্থ পুলসিরাত পাড়ি দেওয়া। আর তাঁদেরকে বিশ্বাস করা, আল্লাহ্র আযাব থেকে নিরাপত্তা সদৃশ।

নবীবংশের পরিচিতি অর্থ তাঁদের যথামর্যাদা সম্পর্কে অবহিতি। তাঁরা নবীপাক স. এর কীরূপ প্রিয়ভাজন ছিলেন সে কথা জেনে নেওয়া একান্ত জরুরী। যদি এই জ্ঞান অর্জিত হয় তবে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ যে কোন পর্যায়ের ভ্রষ্টতা সে কথাটিও জানা যাবে সহজেই। তাঁদের প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে ভ্রষ্টতা ও শাস্তি থেকে অব্যাহতির সুযোগ।

ওমর ইবনে আবী সালমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, ‘হে আহলে বাইতগণ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করতে চান এবং পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দিতে চান তোমাদেরকে’ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় রসুল পাক স. উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর প্রিয় সহধর্মিণী হজরত উম্মে সালমার নিকটে। তিনি তখন হজরত

ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনকে ডেকে এনে তাঁদেরকে একটি চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। তারপর প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! এরাই আমার আহলে বাইত। তখন হজরত আলী দণ্ডায়মান ছিলেন রসুল পাক স. এর পিছনে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল পাক স. তখন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসনেকে কোলে নিয়ে এবং হজরত ফাতেমা ও হজরত আলীকে দুই বাহুদ্বারা বেষ্টন করে নিয়ে দোয়া করলেন, 'হে আমার আল্লাহ্! এরাই আমার আহলে বাইত। আপনি এদেরকে অপবিত্রতা থেকে চিরপবিত্র করে দিন।'

আহলে বাইতের সদস্য কারা সে সম্পর্কে কোরআন মজীদে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে দেখা দিয়েছে মতপৃথকতা। অধিকাংশ আলেম মনে করেন, হজরত ফাতেমা, ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন ও হজরত আলী– এঁরাই আহলে বাইত। অধিকাংশ বর্ণনাই এই অভিমতটির অনুকূলে। তবে সুবিবেচনার দাবী এই যে, তাঁর স. পবিত্র পত্নীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভূত। আয়াতে কারিমার পূর্বাপর বিবরণদৃষ্টে একথাটি প্রতীয়মান হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে 'হে আহলে বাইত! তোমাদের প্রতি পতিত হোক আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও বরকত। যেমন "ওয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইকুম ওয়া বারাকাতুহু আহলাল বাইতে" আয়াত দ্বারা হজরত ইব্রাহিম এর স্ত্রীকে তাঁর আহলে বাইতে শামিল করা হয়েছে।

রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, আমার আহলে বাইতের সঙ্গে যদি কেউ শত্রুতা করে তবে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তিনি স. ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন, হজরত ফাতেমা ও হজরত আলীকে নিয়ে যে বিশেষ প্রার্থনা করেছিলেন তাতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, আযওয়াযে মুতাহ্হারাত (পবিত্র নবীপত্নীগণ) আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন। তদুপরি ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হজরত উম্মে সালমার হাদিসে রয়েছে, হজরত উম্মে সালমা রসুলপাক স. কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি কি আপনার আহলে বাইতের অন্তর্ভূত নই? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, তুমিও আমার আহলে বাইত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি কল্যাণময়ী। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'হে রসুল! আপনি বলে দিন, এই দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় প্রত্যাশী নই। তবে আমি চাই তোমরা আমার নিকটজনদেরকে ভালোবাসো। এই আয়াতের তাফসীরে মতভিন্নতা রয়েছে। বলা হয়েছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনার নিকটজন কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা এবং তাদের দুই সন্তান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। কিন্তু এই আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে, আহলে বাইতের বর্ণিত সদস্য চতুষ্টয়সহ অন্যান্য নিকটবর্তীরাও আহলে বাইত। তবে এই চারজনই অন্য সকল সদস্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেছেন, রসুল পাক স. এর নিকটজনদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামগণও রয়েছেন। কেননা তাঁরা সকলেই ছিলেন রসুল পাক স. এর আত্মার আত্মীয় (রেদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আযমাইন)।

হজরত আলী সম্পর্কে রসুল পাক স. বলেছেন, আমি যার মাওলা আলীও তাঁর মাওলা। হে আল্লাহ্! আলীকে যে ভালোবাসে, তুমি তাকে ভালোবাসো। আর তার সাথে যারা দুশমনি করে তুমিও দুশমনি করো তাদের সাথে। তিনি স. হজরত আলীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আলী! তোমাকে যারা ভালোবাসবে তারা মুমিন। আর তোমার সঙ্গে যারা দুশমনি করবে তারা মুনাফিক। তিনি স. আরও বলেছেন, মুসার দরবারে হারুন যেমন তেমনি আমার দরবারে তুমি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি কি একথায় প্রসন্ন নও যে, মুসার সকাশে হারুন যেমন, তেমনি আমার সকাশে তুমি।

বর্ণিত হাদিস দু'টোতে হজরত আলীকে তুলনা করা হয়েছে হজরত হারুন আ. এর সঙ্গে। অথচ হজরত হারুন ছিলেন নবী আর হজরত আলী ছিলেন নবীর উম্মত। এ ধরনের তুলনায় বিভ্রান্তির সুযোগ যাতে না থাকে তাই তিনি পরক্ষণেই বলে দিয়েছেন, শুনে রাখো আমার পরে কোনো নবী নেই। সুতরাং রসুল স. এর পরে অন্য কোনো নবীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। নৈকট্য ও বিশেষত্বের দিক দিয়েও নবীর উম্মতেরা নবী সদৃশ হতে পারে না। তাই নবুয়তের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মর্যাদা হচ্ছে খেলাফতের মর্যাদা। হজরত মুসার জীবদ্দশায় হজরত হারুন ছিলেন তাঁর খলিফা। আর তাঁর এই খেলাফত, হজরত মুসার পৃথিবী পরিত্যাগের পূবেই অবলুপ্ত হয়েছিলো। কারণ, তাঁর মহাতিরোধান ঘটেছিলো হজরত মুসার পৃথিবীর জীবন শেষ হওয়ার পূর্বেই।

রসুল আকরম স. তবুক যুদ্ধে গমনের সময় হজরত আলীকে তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। হজরত মুসা হজরত হারুনকে এ ধরনের খলিফাই বানিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কোরআন মজীদের বর্ণনাটি এরকম– 'যখন মুসা তাঁর ভ্রাতা হারুনকে বলেছিলেন, তুমি আমার সম্প্রদায়ের জন্য আমার প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করো।' রসুল পাক স.ও এরকম প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। নামাজের জামাতের ইমামতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকদুম এবং হজরত আলীকে।

নবীপাক স. এর উক্তি ছিলো এরকম, 'মানকুনতু মাওলাহু (আমি যার মাওলা)'। এখানে মাওলা শব্দটির অর্থ প্রিয়ভাজন। এখানে মাওলা অর্থ শাসক হবে না কিছুতেই। আলেমগণ বলেছেন, অভিধানের কোথাও মাওলা শব্দের অর্থ শাসক বলা হয়নি।

হজরত ফাতেমা সম্পর্কে তিনি এরশাদ করেছেন, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। যে বিষয় তাকে কষ্ট দেয় সে বিষয় আমাকেও কষ্ট দেয়। আর যে বিষয় তাকে প্রফুল্ল করে সে বিষয় আমাকেও আনন্দ দেয়।

জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল আকরম স. এর নিকট রমণীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন হজরত ফাতেমা আর পুরুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন

তাঁরই স্বামী হজরত আলী। অপরদিকে হজরত ফাতেমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো, হজরত আয়েশাকে কিরূপ ভালোবাসতেন নবীপাক স. তখন তিনি বলতেন, রসুল পাক স. এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় পুরুষ ছিলেন হজরত আবু বকর এবং সবচেয়ে প্রিয় নারী ছিলেন হজরত আয়েশা। এ সম্পর্কে হজরত ফাতেমা ও হজরত আয়েশা উভয়ের অভিমতই সঠিক। কারণ প্রেম ভালোবাসার রয়েছে বহুতর দিক ও সম্পর্ক। ভলোবাসা পরিমাপের সর্বজনমান্য কোনো মাপকাঠি নির্ধারণ করা সহজ নয়। তাই এই অতি অদৃশ্য বিষয়ে মূল্যায়নের তারতম্য ঘটে যেতেই পারে।

তিনি স. ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ্! আমি হাসান ও হোসাইনকে ভালোবাসি। আর তাদেরকে যারা ভালোবাসে আমি তাদেরকেও ভালোবাসি। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রসুল স. ইমাম হাসানের মুখগহবরে তাঁর পবিত্র রসনা স্থাপন করেছেন। তারপর বলেছেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি একে ভালোবাসি, তুমি একে ভালোবাসো। আর একে যে ভালোবাসবে, তুমি তাকেও ভালোবাসো। তিনি স. তিনবার এরকম প্রার্থনা করলেন। তারপর বললেন, যারা আমাকে মহব্বত করে তারা আমার হাসান-হোসাইনকেও মহব্বত করবে। তাদের জননী সৈয়দা ফাতেমাতুজ জোহরা কিয়ামতের দিন আমারই সমমর্যাদায় অবস্থান করবে। তিনি স. শিশু ইমাম হাসানকে তাঁর নিজের জিহ্বা চুষতে দিতেন। এটা ছিলো তাঁর অত্যধিক ভালোবাসার নিদর্শন। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের শারীরিক গঠনও ছিলো রসুল স. এর গঠনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাঁর স. পবিত্র শরীরের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিলো আরও কয়েকজনের। যেমন হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব, তাঁর পুত্র হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর, হজরত কাসেম ইবনে আব্বাস এবং হজরত সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। বসরার অধিবাসী কায়েস ইবনে রুবীয়াহ নামক এক ব্যক্তিও ছিলেন রসুল পাক স. এর আকৃতিবিশিষ্ট। তিনি হজরত আমীর মোয়াবিয়ার দরবারে এলে হজরত মোয়াবিয়া আপন আসন থেকে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। চুম্বন করেছিলেন তাঁর দুই চোখের মধ্যস্থল। আর তাঁকে দান করেছিলেন মরগার নামক একটি অঞ্চল। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাঁর আহলে বাইতের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন ইয়াহইয়া বিন মোহাম্মদ বিন জাফর বিন মোহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইন বিন আলী। তিনি দেখতে ছিলেন অবিকল রসুল আকরম স. এর মতো। তাই তার উপাধি ছিলো শাবীহে রসুল। রসুল পাক স. এর শরীরের যে স্থানে মোহরে নবুয়ত মুদ্রিত ছিলো তাঁর সেই স্থানেই ছিলো কবুতরের জিমের মতো একটি চিহ্ন। চিহ্নটিও ছিলো মোহরে নবুয়তের মতো। গোসল করার জন্য তিনি যখন হাম্মামখানায় যেতেন

তখন মানুষ তাকে দেখার জন্য ভীড় করতো। রসুল আকরম স. এর মহব্বতে তখন সকলে পাঠ করতো দরূদ ও সালাম। বরকত লাভের জন্য মানুষ তাকে চুম্বন করতো।

রসুল আকরম স. এর সঙ্গে সাদৃশ্যগত পরিপূর্ণতা অবশ্য কারো মধ্যেই পরিদৃষ্ট হতো না। বরং সাদৃশ্য ছিলো আংশিক এবং অবশ্যই অপরিপূর্ণ। নতুবা তাঁর অপরূপ দেহসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য পরিপূর্ণরূপে অন্যত্র পরিদৃশ্যমান হওয়া কি সম্ভব? তাই কবি বলেছেন, তাঁর রূপবৈভবের মধ্যে অন্য কারো অংশগ্রহণ থেকে তিনি পবিত্র। তিনি ছিলেন অতুলনীয় ও অবিভাজ্য সুষমার অধিকারী।

হজরত আব্বাসকে লক্ষ্য করে রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! কোনো মানুষের হৃদয়ে ওই সময় পর্যন্ত ইমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মহব্বতে আপনাকে মহব্বত না করে। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই পিতৃব্যকে কষ্ট দিলো সে আমাকেই কষ্ট দিলো। আর এটা নিঃসন্দেহ যে পিতৃব্য পিতারই স্থলাভিষিক্ত। হজরত আব্বাসকে লক্ষ্য করে তিনি স. একবার বলেছিলেন, হে সম্মানিত পিতৃব্য! আপনার সন্তানের কাছে আসুন। তারপর তাঁর পবিত্র চাদর দ্বারা তাঁকে আবৃত করে দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আব্বাস ও তাঁর বংশধরদেরকে প্রকাশ্য ও গোপন ক্ষমা দান করুন। হে আল্লাহ্! আপনি তাঁকে তাঁর আওলাদগণের মধ্যে নিরাপদ রাখুন।

বর্ণিত হয়েছে, ফজল, আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ, কাসেম, মা'বাদ, আব্দুর রহমান– এই ছ'জন সম্পর্কে রসুল পাক স. বলেছেন, এঁরা হচ্ছেন আমার চাচা– আমার পিতার স্থলবর্তী। এঁরাই আমার আহলে বাইত এবং পূর্বপুরুষ। হে আল্লাহ্! আপনি এঁদেরকে নরকাগ্নি থেকে নিরাপদ রাখুন। এমনভাবে আচ্ছাদিত করুন যেমন আচ্ছাদিত করে রয়েছি আমি। রসুল পাক স. যখন এই দোয়া করেছিলেন তখন গৃহের সকল আসবাবপত্র বলে উঠেছিলো– আমিন, আমিন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক বলেছেন, রসুল আকরম স. এর সকল নিকটাত্মীয়কেই আমি ভালোবাসি। তিনি স. একবার হজরত উম্মে সালমাকে বলেছিলেন, আয়েশার ব্যাপারে আমকে কষ্ট দিও না। আরেকবার হজরত ফাতেমাকে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে আমার আয়েশাকেও মহব্বত কোরো। হজরত আবু বকর সিদ্দিক শিশু ইমামদ্বয়কে স্কন্ধদেশে উঠিয়ে নিয়ে বলতেন এঁরা আমার রসুলের আকৃতি বিশিষ্ট, আলীর সঙ্গে এদের মিল নেই। হজরত আলী একথা শুনে মৃদু হাসতেন।

আব্দুল্লাহ বিন হজরত আলী বলেছেন, আমি একবার এক প্রয়োজনে খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শরণাপন্ন হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, আপনি আহলে বাইত হয়ে আমার নিকট প্রার্থী হলে আমি বড়ই লজ্জাবোধ করি।

শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত ছিলেন ওহী লিপিবদ্ধকারী সাহাবী। তাঁর মাতার ইন্তেকালের পর তিনি ইমাম হয়ে জানাযার নামাজ পড়ালেন। এরপর জানাযা ওঠানো হলো একটি উটের পিঠে। হজরত জায়েদও আরেকটি উটের পিঠে উঠে বসলেন। সেই উটের রশি ধরে হজরত ইবনে আব্বাস এগিয়ে চললেন কবরস্থানের দিকে। হজরত জায়েদ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুলের পিতৃব্যপুত্র! এভাবে আমাকে লজ্জা দিবেন না। উটের রশি ছেড়ে দিন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, আমাকে এরকমই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেনো আলেমের সম্মান করি। একথা শুনে হজরত জায়েদ উট থেকে নেমে পড়লেন এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হস্ত চুম্বন করে বললেন, আমাকেও এরকম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেনো আমি আহলে বাইতের প্রতি সম্মান করি।

ইমাম আওযায়ী বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত বিনতে উসামা ইবনে জায়েদ কতিপয় গোলামসহ উপস্থিত হলেন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের দরবারে। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন খলিফা এবং তাঁকে এনে নিজের কাছে বসালেন। পূর্ণ আদব প্রদর্শনসহ জেনে নিলেন তাঁর প্রয়োজন এবং যথা সমাদরের পর তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব তাঁর খেলাফতের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের মাসিক ভাতা নির্ধারণ করলেন তিন হাজার দেরহাম এবং হজরত উসামা বিন জায়েদের জন্য নির্ধারণ করলেন তিন হাজার পাঁচশ। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, আপনি আমার চেয়ে উসামাকে প্রাধান্য দিলেন কেনো? কোনো জেহাদেই তো তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন না। আমিরুল মুমিনিন বললেন, হে প্রিয় পুত্র! উসামার পিতা জায়েদ ছিলেন রসুলুল্লাহ স. এর একান্ত প্রিয়পাত্র। আর তাঁর পুত্র উসামাও ছিলো তোমার চেয়ে রসুলুল্লাহ স. এর অধিক প্রিয়। তাই আমি রসুলুল্লাহ স. এর প্রিয়পাত্রকে আমার প্রিয়পাত্রের উপরে প্রাধান্য দিয়েছি। কথিত আছে, জাফর বিন সুলায়মান ইমাম মালেককে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে ফেলেছিলেন। এক সময় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বললেন, জাফর ইবনে সুলায়মানের আচরণে আমি দুঃখিত নই। আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছি। লোকেরা বললো, এতো কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও আপনি তাঁকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন কি কারণে? ইমাম বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, মৃত্যুর পর যখন আমি রসুলুল্লাহ স. এর সকাশে হাজির হবো তখন হয়তো দেখবো, আমার কারণে জাফর ইবনে সুলায়মান শাস্তি ভোগ করছে। আমি তখন রসুলেপাক স. এর এই বংশধরের শাস্তি সহ্য করতে পারবো না। রসুলুল্লাহ স. এর সম্মুখে আমার তখন লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকবে না। আলেমগণ বলেছেন, তৎকালীন খলিফা মনসুর যখন ইমাম মালেকের উপর অত্যাচারের কারণে জাফর ইবনে সুলায়মানকে শাস্তি দিতে চাইলেন, তখন ইমাম মালেক বললেন, আল্লাহ্‌পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করি,

আল্লাহ্‌র কসম জাফর আমার উপর বেত্র উত্তোলন করার আগেই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি– কারণ তিনি রসুলে করীম স. এর বংশসম্পৃক্ত।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ ছিলেন স্বনামধন্য আলেম। তিনি বলেছেন, আমার নিকট যদি কোনো প্রয়োজনে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত আলী আসেন, তবে আমি সর্বপ্রথম প্রয়োজন পূরণ করবো হজরত আলীর। কারণ, তিনি রসুল পাক স. এর নিকটজন। তিনি আরও বলেছেন, আমি যদি আকাশ থেকে গড়াতে গড়াতে জমিনে এসে পড়ি, তবুও আমি হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের মহব্বত অপেক্ষা হজরত আলীর মহব্বতকেই গুরুত্ব দান করবো।

হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ উম্মত জননীদের খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁদের নিকট পৌঁছে দিতেন বিভিন্ন লোকের সম্মানী (হাদিয়া) এবং উপহার (তোহ্‌ফা)। এ সকল খেদমতের মাধ্যমে তিনি কামনা করতেন তাঁদের সন্তোষ ও প্রসন্নতা। হজরত আব্দুর রহমান তনয়কে লক্ষ্য করে জননী আয়েশা বলতেন, তোমার পিতা জান্নাতের সালসাবিল নামক স্রোতস্বিনী থেকে পানিপান করে পরিতৃপ্ত হবেন।

রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর সম্মান প্রদর্শনের জন্য হজরত উম্মে আরমানের নিকট গমন করতেন। কারণ, তিনি ছিলেন রসুল আকরম স. এর ক্রীতদাসী।

রসুলুল্লাহ স. এর দুগ্ধমাতা ছিলেন হালিমা সা'দীয়া। রসুল স. এর দরবারে এলে তিনি তাঁকে আপন উত্তরীয় বিছিয়ে বসতে দিতেন এবং সানন্দে তাঁর প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করে দিতেন। রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর তিনি হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের নিকট আসা যাওয়া করতেন। তাঁরা তাঁকে ওইরূপ সম্মান প্রদর্শন করতেন, যেরূপ প্রদর্শন করতে দেখেছিলেন রসুলুল্লাহ স. কে।

সাহাবী মান্যতা

রসুল আকরম স. এর প্রতি আদব সম্মান প্রদর্শনের অঙ্গ হিসেবে সাহাবীগণের প্রতিও প্রদর্শন করতে হবে যথাবিহিত সম্মান। তাঁদের অধিকার নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে। জেনে নিতে হবে উম্মতের উপর রয়েছে তাঁদের কী বিশাল অনুগ্রহ। তাঁদের যথা অনুসরণ উম্মতের জন্য অপরিহার্য। সাহাবা কেরামের রসুল আনুগত্যের গভীরতা পরিমাপ করা সহজ নয়। তাই সকল অবস্থায় তাঁদের প্রশংসা করতে হবে। দোয়া ও ইসতেগফারের সময় তাঁদেরকে স্মরণ রাখতে হবে। এটা উম্মতের উপর সাহাবীগণের হক। আল্লাহ্‌পাক সকল সাহাবীর প্রশংসা করেছেন এবং সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁদের প্রতি তিনি প্রসন্ন। তাই তাঁরা পরবর্তী উম্মতের প্রশংসা ও দোয়া পাওয়ার হকদার। জননী আয়েশা বলেছেন,

মুসলমানদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন রসুলে করীম স. এর সকল সাহাবীদের জন্য ইসতেগফার করে। কিন্তু কিছু সংখ্যক অভিশপ্তরা ক্রমাগত তাঁদেরকে অপবাদ দিয়ে চলেছে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কটু বাক্য প্রয়োগ করা এবং তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা কুফরী। কারণ এই অসদাচরণ কোরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলিলের পরিপন্থী। জননী আয়েশার প্রতি অপবাদ দান করা এবং অন্য কোনো সাহাবীকে অপবাদ দেয়া একই ধরনের অপরাধ। এমতোকর্ম কোনো ইমানদার কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এই নিন্দার্হ কর্মটি বেদাত এবং ফাসেকী। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে এরকমই বলা হয়েছে।

সাহাবীগণের পারস্পরিক মতভিন্নতা ও যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে সতর্ক মন্তব্য করতে হবে। পক্ষপাতদুষ্টতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না কিছুতেই। ঐতিহাসিকদের অতিরঞ্জন, হাদিস শরীফের নামে মূর্খজনোচিত বর্ণনা, শিয়াদের কটু বাক্যবর্ষণ এবং বেদাতীদের উক্তি থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ এ সকল সূত্রে প্রাপ্ত সাহাবা কেরামের ভুল-ভ্রান্তির বর্ণনাগুলো অধিকাংশই মিথ্যা ও স্বকপোলকল্পিত। কেবল তাঁদেরকে অপবাদ প্রদানই এসকল বর্ণনার উদ্দেশ্য।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তাঁদের উত্তম দিকগুলোকে বিবেচনায় এনে তাঁদের সকলকেই সত্যানুসারী ও ন্যায়পরায়ণ জানা বিশ্বাসীদের জন্য অপরিহার্য। তাঁদের দোষচর্চা করা যাবে না কিছুতেই। তাঁদের চরিত্রমাধুর্য, গুণবত্তা ও অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে তুলে ধরতে হবে। অন্য সকল বিষয়ে থাকতে হবে নীরব। কেননা, তাঁরা ছিলেন আমাদের প্রিয়তম রসুলের ভালোবাসা ও সান্নিধ্যধন্য। রসুল পাক স. নিজে তাঁদেরকে ভালোবেসেছেন। কেবল একারণেই তাঁরা চিরকালের জন্য আমাদের ভক্তি ও ভালোবাসার পাত্র। তাঁদের কেউ যদি আহলে বাইতের যথাঅধিকার প্রতিপালন করে না থাকেন, তবুও তাঁরা অব্যহতি লাভ করবেন বলে আশা করা যায়। কারণ রসুল আকরম স. এর শাফায়াতের প্রথম হকদার তাঁরাই। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। আর এ বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস। এতে সন্দেহ মাত্র নেই।

আকায়েদের বিভিন্ন গ্রন্থে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের উত্তম দিকগুলোই কেবল আলোচনা করতে হবে। হাদিস শরীফে সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে বর্ণিত তাঁদের ফযীলতসমূহকেই মূল্য দিতে হবে। বিশ্বাসীদের জন্য কোরআন ও হাদিসই যথেষ্ট। ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে সন্দেহ, পক্ষপাতিত্ব। সুতরাং ইতিহাসমনস্কতা ইমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে না।

তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন, 'মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল আর তার সাথীরা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে মমতাময়।' আরও এরশাদ করেছেন, 'মোহাজির এবং আনসারগণের মধ্য থেকে তারা ইমানে

অগ্রগামী।' আরও বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্বাসীগণের (সাহাবীগণের) প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন যখন তাঁরা বৃক্ষতলে আপনার নিকট অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূরণে সত্যানুসারী ছিলো।' আরও এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্ পাক কখনও লাঞ্ছিত করবেন না তাঁর নবীকে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে।'

রসুল আকরম স. বলেছেন, 'আমার সাথীরা নক্ষত্রতুল্য। তোমরা তাঁদের যে কোনো একজনকে অনুসরণ করলে হেদায়েত পেয়ে যাবে।' হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীগণ লবণের মতো, লবণ ব্যতীত কোনো আহার্যই আস্বাদ্য নয়। তিনি আরো বলেছেন, সাবধান! আমার সহচরবৃন্দ প্রসঙ্গে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আমার তিরোধানের পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল কোরো না। তাদেরকে যারা ভালোবাসবে তারা আমার ভালোবাসার কারণেই ভালোবাসবে। আর তাঁদেরকে যারা হিংসা করবে তারা আমার প্রতি হিংসা করে বলেই ওরকম করবে। তিনি স. আরো বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবগণকে গালি দিয়ো না। তোমাদের উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণদানও তাঁদের এক মুদ যব দানের সমান নয়। আরো বলেছেন, যারা আমার সঙ্গীগণকে গালি দেয় তাদের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার, ফেরেস্তাবৃন্দের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। আরো এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীগণ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে রসনাকে সংযত রেখো। হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. বলেছেন, নিশ্চয়ই নবী ও রসুলগণের পরে আল্লাহ্‌পাক আমার সাহাবীগণকে অন্য সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আর আল্লাহ্‌তায়ালা আমার সহচর হিসাবে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীকে। সাহাবীগণের মধ্যে তাঁরাই সর্বোত্তম। আর আমার সকল সাহাবীই কল্যাণের আধার (রেদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম)।

বর্ণিত হাদিসে বিশেষ সাহাবী হিসাবে চারজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য হাদিসে বিশেষ সাহাবী হিসাবে রয়েছে দশ জনের নাম। এই বর্ণনা ভিন্নতাদৃষ্টে কেউ যেনো এরকম মনে না করে যে, বর্ণনাকারীগণ হাদিসের নামে আপন আপন অভিমতকে তুলে ধরেছেন। এরকম ধারণা মোহাদ্দেছগণ কখনই হাদিসের নামে ব্যক্তিগত ধারণার প্রচার করেননি। তবে হ্যাঁ, কোনো কোনো হাদিসে বিশেষ সাহাবীর তালিকায় হজরত ওসমানের পূর্বে রয়েছে হজরত আলীর নাম। রসুল পাক স. আরো বলেছেন, যে ওমরকে ভালোবাসে সে আমাকেও ভালোবাসে। আর যে ওমরের প্রতি বিদ্বিষ্ট সে আমার প্রতি বিদ্বিষ্ট। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এরকম ফযীলতের বর্ণনা রয়েছে অনেক।

ইমাম মালেক বলেছেন, যে লোক সাহাবীগণের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাঁদেরকে গাল-মন্দ করে সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। গনিমত

প্রাপ্তির অধিকার তাদের নেই। ইমাম মালেক এই মাসআলাটি প্রমাণ করেছেন সুরা হাশরের একটি আয়াত থেকে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি রসুল পাক স. এর সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং রাগান্বিত হয় তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, লি ইয়াগিজু-বিহিমুল কুফফার (কাফেরেরাই সাহাবীগণের প্রতি রুষ্ট)। আলেমগণ বলেছেন, সুরা ফাতাহ এর শেষোক্ত তিনটি আয়াতে মুসলমানদেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে– ১. মোহাজির ২. আনসার ৩. পরবর্তী মুসলমান। এই তিন শ্রেণীর মুসলমানের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলীও বর্ণিত হয়েছে ওই তিন আয়াতে। বলা হয়েছে, 'তারা আল্লাহ্পাকের দরবারে দোওয়া করবে এভাবে– হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং ক্ষমা করে দিন আমাদের ওই সকল ভ্রাতৃবৃন্দকে যারা ইমানে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী। আমাদের অন্তঃকরণে আপনি ইমানদারদের প্রতি বিদ্বেষের অপবিত্রতা ঢেলে দেবেন না।' শিয়া ও রাফেজীরা বর্ণিত তিন প্রকারের কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম মোহাম্মদ বাকের বলেছেন, একবার ইরাক থেকে আগত কতিপয় লোক আমার সম্মুখেই হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর সম্পর্কে কিছু অশোভনীয় উক্তি করলো। তারপর দুর্নাম শুরু করলো হজরত ওসমানের। আমি বললাম, 'হে হতভাগ্যের দল, শুনে নাও, আল্লাহ্পাক মোহাজিরদের সম্পর্কে এরশাদ করছেন, নিঃসম্বল মোহাজিরগণ, যাদেরকে তাদের গৃহাঙ্গণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে– এই আয়াত আমি শেষ পর্যন্ত (উলায়িকা হুমুস্সাদেকুন পর্যন্ত) পাঠ করলাম। ইরাকবাসীরা বললো, আমরা স্বীকার করছি যে, আমরা মোহাজির শ্রেণীভুক্ত নই। আমি বললাম, তবে কি তোমরা আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত– যাঁদের বিষয়ে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, যারা আপন আপন গৃহে মোহাজিরগণকে আশ্রয় দিয়েছে এবং ইমানকে আশ্রয় করেছে– এই আয়াত আমি পড়লাম– 'উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন' (তারাই সফলতা লাভ করেছে) পর্যন্ত। ইরাকের লোকেরা বললো, না আমরা আনসার সম্প্রদায়ভুক্তও নই। আমি তখন বললাম, আমি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, তোমরা ওই দলের লোকও নও যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, "মোহাজির ও আনসার (সাহাবীগণ) এর পরে যারা পৃথিবীতে আগমন করবে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং ক্ষমা করে দিন আমাদের সেই সকল ভ্রাতৃবৃন্দকে যারা ইমানে আমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী।" এরপর আমি বললাম, তোমরা মুসলমানদের তিনটি দলের কোনো একটি দলের মধ্যে পড়ো না। আমার সামনে থেকে সরে যাও কারণ তোমরা মুসলমানই নও।

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেছেন, দু'টি নন্দিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরা পরিত্রাণ পাবে। বৈশিষ্ট্য দু'টি হচ্ছে, রসুলে আকরম স. এর সাহাবীগণের প্রতি সৎ

বিশ্বাস ও ভালোবাসা। আইয়্যুব সখতিয়ানী বলেছেন, যে ব্যক্তি হজরত আবু বকর সিদ্দিককে ভালোবাসে নিশ্চয়ই সে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তারপর সমুজ্জ্বল সে, যে ভালোবাসে হজরত ওমরকে। হজরত ওসমানের প্রতি মহব্বত পোষণকারীরা আল্লাহ্র আলোয় আলোকিত। হজরত আলীকে ভালোবাসে যারা, তারা ধারণ করেছে উরওয়াতুল উছকা (সুদৃঢ় রজ্জু)। যে ব্যক্তি সকল সাহাবীকে সততার সঙ্গে স্মরণ করে সে নেফাক (অপবিত্রতা) থেকে মুক্ত। কোনো একজন সাহাবীর প্রতিও খারাপ ধারণা পোষণ করা যাবে না। যে তাঁদের কোনো একজনের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে সে বেদাতী, মুনাফিক এবং সলফে সালেহীনের তরিকার শত্রু। আমি আশংকা করি এরকম ব্যক্তির আমল আসমানের উপর উঠবে না।

হজরত খালেদ বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, বিদায় হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মদীনার মসজিদে ভাষণ দিলেন রসুল আকরম, স.। বললেন, হে জনতা! আমি আবু বকরের প্রতি প্রসন্ন, একথাটি ভালো করে জেনে নাও। হে জনমণ্ডলী! আমি ওমর, আলী, ওসমান, তালহা, জোবায়ের, সাঈদ এবং আব্দুর রহমান ইবনে আউফের প্রতিও প্রসন্ন। এ কথাটিও মনে রেখো। এই হাদিসটি আশারা মোবাশ্শারা সম্পর্কিত হাদিসের অনুরূপ। তবে এখানে হজরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ এর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

আমীরুল মুমিনিন হজরত ওমর ফারুক তাঁর মজলিশে সুরায় বলেছিলেন, পৃথিবী পরিত্যাগের প্রাক্কালেও রসুল পাক স. ওই ব্যক্তিবর্গের প্রতি প্রীত ছিলেন। তিনি তখন একথাও বলেছিলেন, হে উপস্থিত জনতা! শুনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা বদর ও হুদাইবিয়া যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমার সাহাবা, আমার শ্বশুর, আমার জামাতা এবং আমার প্রিয়জনদেরকে মান্য করো। তাঁদের প্রতি যারা অত্যাচার করবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। যারা তাঁদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্পাকও তাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আর যে তাদের সম্পর্কে আমার নির্দেশনাকে রক্ষা করে চলবে, আল্লাহ্পাক তাকে ক্ষমা করে দিয়ে পুলসিরাত অতিক্রমের সৌভাগ্য দান করবেন। আর যে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তাকে অতিসত্বর আল্লাহ্পাক শাস্তিতে নিপতিত করবেন। তিনি স. আরো বলেছেন, যে আমার সাহাবীগণের হেফাজত করবে, সে আমার হাউজে কাওছারের নিকটে আসতে পারবে। আর যে এরকম করবে না, সে হাউজে কাওছারের সন্নিকটবর্তী হতে পারবে না। তারা আমার সন্নিধান থেকে থাকবে অনেক দূরে।

রসুল আকরম স. গভীর নিশীথে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে গমন করতেন। সেখানে সমাহিত সাহাবীগণের জন্য তিনি দোয়া ও ইস্তেগফার করতেন। আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে তিনি এ বিষয়ে ছিলেন নির্দেশপ্রাপ্ত।

হজরত কা'ব বলেছেন, এমন কোনো সাহাবী নেই যাকে নবী করীম স. শাফাআতের অধিকার দেননি। সহল তসতরী বলেছেন, সাহাবীগণের প্রতি যার ভক্তি ও ভালোবাসা নেই তার রসুল স. এর প্রতিও ইমান নেই। কারণ রসুল করীম স. এর নির্দেশের তোয়াক্কাই সে করে না। বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল পাক স. এর সামনে এক লোকের জানাযা উপস্থিত করা হলো। তিনি স. জানাযার নামাজ পড়ালেন না। বললেন, এই লোকটি ছিলো ওসমানের প্রতি বিদ্বিষ্ট। ওসমানকে শত্রু মনে করতো সে। তাই আল্লাহ্‌পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

সাহাবায়ে কেরামের ফযীলত সম্পর্কে বহুসংখ্যক হাদিস বিদ্যমান। সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি সুদীর্ঘ বিবরণসমৃদ্ধ। বিশেষ করে মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে এই প্রসঙ্গটির সুবিস্তৃত আলোচানা পরিদৃষ্ট হয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সুবিবেচনার দাবীকে অক্ষুণ্ণ রেখে ওই সকল গ্রন্থাবলী এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিভিন্ন কিতাব থেকে আমি এতক্ষণ ধরে বিবরণ দিয়ে গেলাম। ওয়াবিল্লাহি তাওফিক ওয়াহুয়া আ'লাম।

রসুলের স্পর্শধন্য স্থান ও বস্তুনিচয়ের মর্যাদা

রসুল আকরম স. এর হাত কিংবা শরীরের স্পর্শ লেগেছে এরকম স্থানের সম্মান করাও মুসলমানদের জন্য একটি অপরিহার্য কর্তব্য। হজরত আবু মাহজুরার মাথার চুল ছিলো অনেক লম্বা। তিনি কোথাও উপবেশন করলে তার মাথার চুল মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যেত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করতো আপনি আপনার মাথার চুল এতো লম্বা রেখেছেন কেনো? তিনি বলতেন, রসুল আকরম স. আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শধন্য চুলগুলো আমি রক্ষা করে চলেছি।

হজরত খালিদ বিন ওলিদের টুপির মধ্যে রক্ষিত ছিলো রসুল পাক স. এর কয়েকটি পবিত্র চুল। কাফেরদের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় তাঁর ওই টুপি মাটিতে পড়ে গেলো। তিনি ওই টুপিটি হস্তগত করার জন্য তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। কাফের বাহিনীও প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করলো। তাদের অস্ত্রাঘাতে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করলেন। পরে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, সামান্য একটি টুপি উদ্ধারের জন্য আপনি এতো ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করলেন কেনো? তিনি বললেন, এ যুদ্ধ কেবল টুপি উদ্ধারের যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ করা হয়েছে রসুল আকরম স. এর পবিত্র কেশের সম্মান রক্ষার্থে, যা রক্ষিত ছিলো ওই টুপির মধ্যে।

কাফেরদের অপবিত্র স্পর্শে ওই কেশের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতো। তাই প্রিয়তম রসুলের পবিত্র কেশ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধের বিকল্প আর কিছু ছিলো না।

রসুল পাক স. যে স্থানে উপবেশন করতেন সে স্থানে হাত বুলিয়ে সেই হাত দিয়ে আপন মুখমণ্ডল মুছতেন হজরত ওমর ফারুক। বরকত লাভের জন্যই এরকম করতেন তিনি।

ইমাম মালেক মদীনা মুনাওয়ারার সীমানায় কোনো জানোয়ারের উপর সওয়ার হতেন না। তিনি বলতেন, এখানকার মাটিতে আল্লাহ্র হাবিব পদচারণা করেছেন, কোথাও শয়ন করেছেন, কোথাও বা করেছেন উপবেশন। আর এখানকার মাটিতে আমি অশ্বারোহী হয়ে পথ চলবো— একথা ভাবতেও আমি ভীত ও লজ্জিত হই। তিনি তাঁর ঘোড়াগুলোকে ইমাম শাফেয়ীর হাওলা করে দিয়েছিলেন। ইমাম শাফেয়ী তখন বলেছিলেন, আপনার ব্যবহারের জন্য অন্ততঃ একটি ঘোড়া রেখে দিন। ঠিক তখনই ইমাম মালেক করেছিলেন উপরোক্ত মন্তব্যটি।

আহম্মদ ইবনে ফজলুবিয়া জাহেদ ছিলেন একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ। বিখ্যাত তীরন্দাজ ছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন, আমি যখন জানতে পারলাম, আমার হাতের এই ধনুকটি কোনো একদিন স্পর্শ করেছিলেন রসুল আকরম স.। তখন থেকে এই ধনুকটি আমি অজু ছাড়া স্পর্শ করিনি।

মদীনা শরীফের অধিবাসী এক বিখ্যাত ব্যক্তি একবার বললো, মদীনার মাটি ভালো নয়। ইমাম মালেক তখন বলেছিলেন, তাকে তিনটি বেত্রাঘাত করতে হবে। কী বিস্ময়কর ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি ছিলো লোকটির! আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন, সে তো আসলেই হয়ে গিয়েছিলো মৃত্যুদণ্ড লাভের উপযুক্ত। মদীনার এক নাম তাবা বা তাইয়্যেবা— যার অর্থ পবিত্র। শিরিকের অপবিত্রতা থেকে ওই মাটি চির পবিত্র। রসুল প্রেমে সুবাসিত ওই মাটি বিশ্বাসীদের একান্ত প্রিয়। বিশুদ্ধচিত্ত মানুষেরা মদীনার গৃহাঙ্গণ, পথ ও প্রান্তর থেকে লাভ করেন অপার্থিব সুরভি— যার কোনো উপমা কিংবা তুলনা নেই। অন্য কোথাও ওই বেহেশতি সুরভি লাভ করা অসম্ভব। আবু আব্দুল্লাহ আত্তার তাই বলেছেন, আল্লাহ্র রসুলের সৌগন্ধে মদীনা মুনাওয়ারার সমীরণ মাতোয়ারা। সেই সুবাসের সামনে অবনত মস্তক হয়ে থাকে মেশক, কাফুর ও তাজা চন্দন।

উসাইলী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আরেফ (আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য)। তিনি বলতেন, মদীনা তাইয়্যেবার মৃত্তিকায় রয়েছে এক বিশেষ সুঘ্রাণ যা মেশক আম্বরের মধ্যেও নেই। একথা শুনে এক লোক বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, সত্যি কি তাই! ওই ব্যক্তি ছিলো নিতান্তই অজ্ঞ। নতুবা সে বুঝতে পারতো এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। মদীনার মাটিতো অপার্থিব সুরভিসম্পন্ন হওয়াই উচিত।

কথিত রয়েছে, একবার হজরত ওসমানের নিকটে রক্ষিত রসুল আকরম স. এর পবিত্র লাঠিখানি নিয়ে জাহজাহা গিফারী নামের এক লোক তার রানের উপর লাঠিটি স্থাপন করে ভেঙে ফেলতে উদ্যত হলো। যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা একযোগে ওই লোকটিকে এই অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করলেন। অল্প কিছুদিন

পরেই তার উরু দেশে দেখা দিলো একটি ফোঁড়া। তারপর তার পা পচতে শুরু করলো। পচন থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্তে তার ওই পা-টি কেটেও ফেলতে হলো। এভাবে অপদস্থ হয়ে সে আলিঙ্গণ করলো মৃত্যুকে।

রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, আমার এই মিম্বরে বসে যদি কেউ মিথ্যা কসম করে, তবে নিঃসন্দেহে তার গন্তব্যস্থল হবে জাহান্নাম। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, আমার কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম বাগান।

রসুলে করীম স. এর ফযীলত, কামালিয়াত, বৈশিষ্ট্যাবলী, তাঁর প্রিয় শহর মদীনা তাইয়্যেবা ও অন্যান্য পবিত্র স্থান এবং সেখানকার বাসিন্দাদেরকে কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, কী নিয়মে সেগুলোর আদব রক্ষা করে চলতে হবে সে সকল বিষয়ের বিবরণ আমি দিয়েছি আমার 'জজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' নামক গ্রন্থে। অতীব আগ্রহী ব্যক্তিগণ ওই গ্রন্থটি পাঠ করে দেখতে পারেন।

সালাত ও সালামের ফযীলত

এই পরিচ্ছেদে নবী করীম স. এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশের বিধান, অবস্থা, সময়, ফজীলত ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নাবিয়্যী, ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আ'মানু সল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা (নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতাবৃন্দ তাঁর নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করে থাকেন। হে ইমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর সালাত ও সালাম পেশ করো)। এই পবিত্র আয়াত থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সালাত প্রেরণের কাজটিকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিজের সঙ্গে এবং তাঁর ফেরেশতাবৃন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন এবং বিশ্বাসীদেরকেও এই কর্ম সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

'সালাত' শব্দের অর্থ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী আবুল আলীয়া বলেছেন, নবীর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার সালাত প্রেরণের তাৎপর্যটি এরকম– তিনি তাঁর ফেরেশতাকুলের সামনে নবীপাক স. এর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। আর ফেরেশতাবৃন্দের সালাত প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, ফেরেশতারা তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকেন। তাঁরা দোয়া করতে থাকেন রসুলে করীম স. এর মহিমা ও মর্যাদার উত্তরোত্তর সমুন্নতির জন্য। ইমানদারদেরকেও ফেরেশতাদের মতো প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। এটাই হচ্ছে ইমানদারদের সালাত প্রেরণের অর্থ ও উদ্দেশ্য।

মুকাতিল বলেছেন, সালাতুল্লাহ অর্থ মাগফিরাত বা ক্ষমা। সালাতে মালায়েকা অর্থ ইসতেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। জুহাক বলেছেন, সালাতুল্লাহ অর্থ রহমত বর্ষণ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ক্ষমা বর্ষণ। আর সালাতে মালায়েকা অর্থ মাগফিরাত ও রহমত লাভের জন্য প্রার্থনা। অবশ্য বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করাই

ফেরেশতাদের কাজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, "তারা ইমানদারদের জন্য ইসতেগফার করে থাকে।" নামাজ সমাপনান্তে পরবর্তী নামাজের প্রতীক্ষারতদের সম্পর্কে ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকেন এরকম– হে আল্লাহ্। আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্! আপনি তাদেরকে রহম করুন।

মোবাররদ বলেছেন, সালাতুল্লাহ মানে আল্লাহ্তায়ালার রহমত। আর সালাতে মালায়েকা মানে ওই নম্রতা ও বিনয়– যা রহমত লাভের কারণ। ওলামা কেরাম বলেছেন, সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র সালাত কখনও বিশেষ। কখনও সাধারণ। বিশেষ সালাতুল্লাহ লাভের সৌভাগ্যধারীরা হচ্ছেন নবী ও রসুল। আর আমাদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোস্তফা স. এর উপর বর্ষিত সালাতুল্লাহ বিশেষতম। আর সর্বসাধারণের উপর সালাতুল্লাহ বা আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয় সাধারণভাবে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, আমার রহমত সকল কিছুতে পরিব্যপ্ত। সুতরাং আল্লাহ্পাকের রহমত বর্ষণের সাধারণ ও বিশেষ অবস্থাটি সুস্পষ্ট। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নাবিয়্যী এবং হুয়াল্লাজি ইউসল্লি আলাইকুম ওয়া মালায়িকাতাহু এসকল আয়াত বিশেষভাবে রসুল আকরম স. এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই তিনি আল্লাহ্পাকের বিশেষ রহমতের প্রতিভু এবং অবিকল রহমত। এ সকল আয়াতের মাধ্যমে তাঁর উচ্চতম ও মহত্তম অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

তাঁর প্রতি সালাত এবং সালাম প্রেরণ করা বিশ্বাসীদের একটি অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্পাক মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। তাই এরশাদ হয়েছে, ইউখরিজুকুম মিনাজ্জুলুমাতি ইলান্ নূর। হালিমি বলেছেন, নবীর প্রতি সালাত প্রেরণের অর্থ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। দরূদ শরীফ পাঠকালে আমরা বলি, আল্লাহুম্মা সল্লিআলা মোহাম্মাদ, এরকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে তাঁর পবিত্র নামের সম্মানজনক উচ্চারণ, তাঁর আনীত শরীয়তের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা। উম্মতের সওয়াব প্রাপ্তি, শাফায়াত কামনা এবং তাঁর মাকামে মাহমুদ এর সর্বোচ্চ সৌভাগ্য লাভের স্তুতি, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, এ সমস্ত বিষয়ও দরূদ শরীফ পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সালাত প্রেরণের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা জানাও। তাঁর মাধ্যমে তাঁর পরিবার পরিজন এবং পবিত্র বংশধরগণের উপরও দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। অবশ্যই এ বিষয়টিতে মতানৈক্য রয়েছে যে, নবী রসুল ছাড়া অন্যদের প্রতি দরূদ পাঠ করা সমীচীন কি না। কিন্তু যেহেতু তাঁরা নবী ও রসুলগণের একনিষ্ঠ অনুগামী তাই তাঁদের প্রতি দরূদ পাঠ করাও জায়েয। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, রসুলে করীম স. এর উম্মতের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্পাকের নৈকট্য অর্জন, তাঁর নির্দেশাদির যথা বাস্তবায়ন এবং উম্মতের প্রতি আরোপিত নবীয়ে করীম স. এর অধিকারসমূহ পরিপূরণের নিমিত্তে সাহায্য প্রার্থনা।

শায়েখ ইয়াযুদ্দীন আব্দুস সালাম তাঁর শিজরাতুল মা'আরীফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুলে করীম স. এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করার অর্থ এই নয় যে, আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট তাঁর নবী সম্পর্কে সুপারিশ করছি। সেরকম যোগ্যতার অধিকারী আমরা নই। এরকম চিন্তা চরম ধৃষ্টতারই নামান্তর। কিন্তু আল্লাহ্পাক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তে নিতান্ত অনুগ্রহবশতঃ সালাত ও সালাম প্রেরণের সুযোগ দানে আমাদেরকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন। যাতে করে 'আমরা অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ' এই অপরিহার্য কর্তব্যটি প্রতিপালনের সুযোগ পাই। রসুল আকরম স. আমাদেরকে যে সকল নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোই আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহের বিনিময় প্রদানের কোনোই যোগ্যতা আমাদের নেই। তাই আল্লাহ্পাক দয়া করে তাঁরই দরবারে আমাদেরকে বিনিময় প্রদানের প্রার্থনা জানাতে বলেছেন। আমরা তাই প্রার্থী মাত্র। তাই আমরা প্রার্থনা জানাই, আল্লাহ্পাক যেনো আমাদের প্রিয়তম রসুলকে ওই সকল সম্মান ও মর্যাদা দান করেন– এককভাবে যিনি এই সকলের উপযোগী। এটাই তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠের তাৎপর্য।

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেছেন, রসুল পাক স. এর প্রতি সালাত ও সালাম এর উপকার মূলতঃ পাঠকারীর দিকেই ফিরে আসে। তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ প্রকৃত প্রস্তাবে দৃঢ় বিশ্বাস, বিশুদ্ধচিত্ততা, ভালোবাসা, আনুগত্য ও মারেফাতের নিদর্শন। এটা মূলতঃ ওই মধ্যস্থতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন– যে মধ্যস্থতা রসুল পাক স. এর পবিত্র সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধিত। তাঁর জন্য দোয়া করা এবং ফয়েজ ও খায়ের বরকতের জন্য প্রার্থনা করা, আসলে সমগ্র সৃষ্টির জন্য কল্যাণ কামনা করা। সমুদ্রের পানি যেমন বাষ্প হয়ে আকাশে সৃষ্টি করে মেঘপুঞ্জ, বৃষ্টিতে মৃত্তিকা সিক্ত হয়, তারপর নদী হয়ে পুনরায় মিশে যায় সাগরে। দরূদ ও সালাম পাঠের বিষয়টিও তেমনি– যা প্রেরিত হয় বটে, কিন্তু ফিরে আসে প্রেরণস্থলেই। আর এই রহমত প্রবাহে সিক্ত হতে থাকে সমগ্র সৃষ্টি।

রসুলে করীম স. এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ ফরজ না মোস্তাহাব সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। একে একে সেগুলোর বিবরণ দেয়া হচ্ছে। ১. সালাত ও সালাম পাঠ ফরজ। কেননা সল্লু ও সাল্লিমু শব্দ দু'টি আদেশসূচক। এই আদেশটি সাধারণ। তাই সাধারণভাবে সকলের প্রতি এই আদেশটি সমভাবে প্রযোজ্য। জীবনে অন্ততঃ একটিবার এই ফরজটিকে আদায় করতে হবে। রসুলপাক স. এর নবুয়ত ও রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান করা যেমন ফরজ, তেমনি ফরজ দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা। এই ফরজ সংখ্যাবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করা যায় না। এই অভিমতটি সর্বাপেক্ষা উত্তম। ২. কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সালাত ও সালামকে সংখ্যাবদ্ধ করা যাবে না। অগণিত ও অধিক মাত্রায় সালাত ও সালাম পাঠ করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্পাক দরূদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার সংখ্যা নির্দেশ করেননি। এতে

করে প্রতীয়মান হয় যে, যত বেশী সম্ভব সালাত ও সালাম পাঠ করা ওয়াজিব। কোনো মুহূর্তেই গাফেল থাকা উচিত নয়। ৩. যতবার রসুল পাক স. এর পবিত্র নাম উচ্চারিত হবে ততবার তাঁর প্রতি সালাম ও সালাত পেশ করা ওয়াজিব। যেখানে তাঁর নাম মোবারক উচ্চারিত হবে, সেখানেই এই আমল করতে হবে। একদল আলেম বলেছেন, এটাই উত্তম অভিমত। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, এই মতটির সমর্থনে রয়েছেন ইমাম তাহাবী, ইমাম আবু হানিফার অনুসারী একটি দল, হালিমী এবং ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী একটি দল। কাযী আবু বকর ইবনে আলী বলেছেন, এই অভিমতটির মধ্যে রয়েছে অধিকতর সাবধানতা। তাই এই মতটি উত্তম মত। যমখশরীরও এই অভিমতের সমর্থক। এঁরা সকলেই এ মতের সমর্থনে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, কারো সামনে আমার নাম উচ্চারিত হলে সে যদি আমার প্রতি দরূদ পাঠ না করে এবং এরকম অবস্থায় যদি তার মৃত্যু ঘটে তবে সে দোজখে প্রবিষ্ট হবে। ইবনে হাব্বান এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু হোরায়রা থেকে। তাঁর নিকট থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. বলেন, ওই ব্যক্তির নাসিকা ধূলিধুসরিত হোক যে আমার নাম শোনে অথচ আমার উপর দরূদ পাঠ করে না। হাকেম বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। এ সম্পর্কে আরেকটি দলিল হচ্ছে এই, রসুলে করীম স. বলেন, ওই ব্যক্তি হতভাগ্য, যে আমার নাম শোনা সত্ত্বেও আমার উপর দরূদ পড়ে না। হজরত জাবের থেকে তিবরানী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যে আমল বর্জন ভৎর্সনাযোগ্য সেই আমল ওয়াজিব। সুতরাং বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে পবিত্র নাম শোনার সাথে সাথে দরূদ পাঠ করা যে ওয়াজিব তা প্রমাণিত হলো। তাছাড়া নবীপাক স. এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে 'অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ' (হাল জাযাউল ইহসানি ইল্লাল ইহসান)। উম্মতের উপর তার ইহসান নিরবচ্ছিন্ন। তাই যখনই তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারিত হবে তখনই তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। এই মতের প্রবক্তরা কোরআন মজীদের এই আয়াতকে এ প্রসঙ্গের দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ্পাক বলেন, "তোমরা একে অপরকে যে রকমভাবে ডাকো, রসুল স.কে সেভাবে ডেকো না।" সুতরাং তাঁর নাম উচ্চারণকালে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ না করলে বিষয়টি হয়ে যায় সাধারণ মানুষের নাম উচ্চারণের মতো। কারণ সালাম প্রেরণের বিষয়টি সাধারণ জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

এক স্থানে একাধিকবার তাঁর নাম উচ্চারিত হলে প্রথমবার সালাত ও সালাম পেশ করা ওয়াজিব। এই অভিমতের প্রবক্ত যাঁরা– তাঁরা বলেছেন, যতবার নামোচ্চারণ ততবার দরূদ পাঠ– এরকম আমল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে ছিলো না। তাঁরা প্রতি উচ্চারণে সালাত পাঠ করেননি। কাজেই নাম শুনলেই দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব– এ মতটি নব আবিষ্কৃত। আর এই অভিমতটি স্বাভাবিকতা

বিরোধীও। একথাটি মেনে নিলে মোয়াজ্জিন, আযানের শ্রোতা, কোরআন তেলাওয়াতকারী সকলেই মহাবিপাকে পড়ে যাবেন। কলেমা শাহাদত উচ্চারণ-কারীরাও বার বার হোঁচট খাবেন বিশেষ করে নবদীক্ষিত মুসলমানেরা। অভিমতটি অত্যন্ত কঠোর। যা আমাদের পবিত্র শরিয়তের স্বাভাবিক বিধানকে ক্ষুণ্ন করে। তাছাড়া আল্লাহ্তায়ালার নাম শুনলে বা বললে সাথে সাথে হামদ ও ছানা বর্ণনা করা ওয়াজিব নয়। অথচ এই ওয়াজিবটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত ছিলো। কিন্তু এরকম কথা কেউই বলেননি।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা বলেছেন, হানাফী ফেকার কিতাব কুদুরীতে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুলে করীম স. এর নাম উচ্চারণ করলে সাথে সাথে তাঁর উপর সালাত ও সালাম পেশ করা ওয়াজিব। অথচ এই বক্তব্যটি পূর্ববর্তী উম্মতের ঐকমত্যবিরোধী। কোনো সাহাবীই এরকম আমল করতেন না। তাঁরা রসুলে করীম স. কে ইয়া রসুলাল্লাহ বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু সাথে সাথে সালাত ও সালাম নিবেদন করতেন না। সুতরাং নাম শোনার সাথে সাথে দরূদ শরীফ পাঠ করা প্রসঙ্গে যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো দরূদ শরীফ পাঠকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তোলা। যারা সালাত ও সালাম বিষয়ে অমনোযোগী, তাদেরকে তাগিদ দেয়াই ছিলো ওই হাদিসগুলোর উদ্দেশ্য।

এক মজলিশে একাধিকবার রসুলে করীম স. এর নাম উচ্চারণ করলে প্রতিবার দরূদ শরীফ পড়তে হবে– এই অভিমতটি আসলে ঠিক নয়। তবে কেউ কেউ বলেছেন, মজলিশে অন্তত– একবার সালাত ও সালাম পাঠ করা ওয়াজিব জানতে হবে। যমখশরীও এরকম বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দোয়ার মধ্যে দরূদ ও সালাম পাঠ করা ওয়াজিব, কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেছেন মোস্তাহাব। যে সকল আয়াত ও হাদিসে এ সম্পর্কে আদেশসূচক ক্রিয়া এসেছে, সে সকল আদেশ হবে মোস্তাহাব প্রকৃতির, ওয়াজিব প্রকৃতির নয়।

বান্দা মিসকিন (গ্রন্থকার) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম যদি এরকম বলতেন– একবার পাঠ করা ফরজ, একাধিকবার পাঠ করা ওয়াজিব এবং প্রতিবার পাঠ করা মোস্তাহাব, তবে বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো বলে মনে হয়। আর এরকম বললে মহব্বতের বিষয়টিও গুরুত্ব লাভ করতো। যারা প্রকৃত রসুল প্রেমিক তারা তখন মোস্তাহাবকে অপরিহার্য করে নিতেন এবং অন্যরাও বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকতো। সালাত ও সালামের অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর পুনঃপুন দরূদ ও সালাম পেশ করা থেকে বিরত থাকা রসুলপ্রেমের দৃষ্টিতে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে।

কেউ কেউ বলেছেন, নামাজে যে কোনো সময় সালাত ও সালাম পাঠ করে নেয়া ওয়াজিব। ইমাম আবু জাফর মোহাম্মদ বাকের এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাশাহহুদ এর সময় সালাত ও সালাম পাঠ করা ওয়াজিব।

ইমাম শা'বী ও ইসহাক ইবনে রাহবিয়া এই মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা নবী করীম স. এর প্রতি দরূদপাঠ করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। আর দরূদ সালাম পাঠ করার জন্য নামাজের চেয়ে উত্তম স্থান আর নেই। হাদিস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে, তাশাহহুদের মধ্যে নবী করীম স. এর উপর দরূদ সালাম পাঠ করতে হবে। সুতরাং এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না যে, নামাজে তাশাহহুদ পাঠ ওয়াজিব অথচ দরূদ সালাম পাঠ ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমতটি অবশ্য অন্য ইমামগণ মেনে নেননি। তাঁরা বলেছেন, সলফে সালেহীনদের মধ্যে কেউই এরকম বলতেন না। এ প্রসঙ্গে এমন কোনো হাদিসও নেই যার অনুসরণ করা যেতে পারে। ইমাম শাফেয়ীর পূর্ববর্তী আলেমগণ অবশ্য এ ব্যাপারে একমত যে, নামাজের মধ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী কোনো কোনো আলেম– যেমন ইমাম খাত্তাবী এ মতটিকে গ্রহণ করেননি। তাঁরা বলেছেন, যে সকল হাদিস দ্বারা নামাজে দরূদ পাঠ ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে সে হাদিসগুলো দুর্বল। তাঁরা আরো বলেছেন, রসুল পাক স. যে রকম গুরুত্ব সহকারে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করাতেন, সেরূপ গুরুত্ব সহকারে সাহাবীগণকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও তাশাহহুদের সঙ্গে দরূদ শরীফের উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমতটির বিভিন্ন দিক ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা বিস্তারিত আলোচানা উপস্থাপন করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তাশাহ্হুদের সময় দরূদ শরীফ পাঠ

তাশাহ্হুদের সময় দরূদ শরীফ পাঠের অবস্থা সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিসে উল্লেখিত দরূদ শরীফের বাণীও বিভিন্ন রকম। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করলে যথেষ্ট হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلي الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلي سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلي الِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلي الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلي سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلي الِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

কোনো কোনো মাশায়েখ থেকে বর্ণিত হয়েছে, উক্ত দরূদ শরীফের প্রথমাংশে ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ এর পূর্বে ওয়া সল্লি আলাইনা মা'আহুম এবং দ্বিতীয়াংশে ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ এর পূর্বে ওয়াবারিক আলাইনা মা'আহুম বলা উত্তম।

সবচেয়ে উত্তম দরূদ শরীফ কোনটি সে সম্পর্কে আলেমগণের মতদ্বৈধতা রয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশের অভিমত হচ্ছে, নামাজে যে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় সে দরূদ শরীফই সর্বোত্তম। কেননা নামাজের অবস্থাই হচ্ছে সর্বোত্তম অবস্থা। কেউ যদি এরকম মান্নত করে বলে যে, আমি সর্বোত্তম দরূদ শরীফ পাঠ করবো তবে নামাজে পঠিতব্য দরূদ শরীফ পাঠ করলে তার মান্নত আদায় হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, অধিক শব্দ সম্বলিত দরূদ শরীফই উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উত্তম দরূদ হচ্ছে, আল্লাহুম্মা সল্লিআলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মদ কামা হুয়া আহলুহু ওয়া মুস্তাহাককুহু– এই ধরনের অনেক দরূদ শরীফের বর্ণনা এসেছে। যার আলোচনা করা হয়েছে রেসালায়ে সালাতিয়া এর মধ্যে। আল্লাহ্পাকই তওফিক দাতা।

দরূদ ও সালাম পাঠের স্থান

যে সকল স্থানে ও সময়ে দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে তন্মধ্যে একটি বিশেষ স্থান হচ্ছে নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠের সময়। এ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ইমাম শাফেয়ীর মতানুসারে এ সময়ে দরূদ পাঠ ফরজ। কতিপয় আলেম এবং জমহুরের মতে তাশাহহুদের পর এবং দোয়া মাসুরার পূর্বে দরূদ পাঠ করা মোস্তাহাব। প্রথম তাশাহহুদের সময় দরূদ পাঠ ওয়াজিব হওয়া না হওয়া সম্পর্কে দু'টি মত পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সুস্পষ্ট মতটি হচ্ছে ওয়াজিব নয়। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল পাক স. প্রথম তাশাহ্হুদের পর অতি দ্রুত এমনভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন– যাতে মনে হতো তিনি কোনো উত্তপ্ত পাথর থেকে ওঠে দাঁড়াচ্ছেন। প্রথম তাশাহ্হুদে রসুল পাক স. এর বংশধরদের প্রতি দরূদ পাঠ করা মোস্তাহাব হওয়া না হওয়া সম্পর্কেও দু'টি মত রয়েছে। আর শেষ তাশাহ্হুদে দরূদ পাঠ ওয়াজিব হওয়া না হওয়া সম্পর্কেও রয়েছে দু'টি মত। তবে বিশুদ্ধতর মতটি হচ্ছে, উক্ত সময়ে দরূদ পাঠ সুন্নত। অর্থাৎ নবী করীম স. এর অনুসরণে তাঁর বংশধরগণের উপরও দরূদ পাঠ করতে হবে। উদ্ধৃত সকল অভিমতই ইমাম শাফেয়ী সমর্থিত। ইমাম আবু হানিফার অনুসারীগণের নিকট শেষের তাশাহ্হুদরে পর দরূদ পাঠ করা সুন্নত। যদি এই দরূদ কেউ প্রথম তাশাহহুদে ভুলবশতঃ পাঠ করে থাকে তবে তার উপর সোহ সেজদা ওয়াজিব হবে। কারণ তাশাহ্হুদের পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে যাওয়া (কেয়াম করা) ফরজ ছিলো। সেই ফরজ বিলম্বিত হওয়ায় ওয়াজিব বিঘ্নিত হয়েছে (নামাজে

এক বা একাধিক ওয়াজিব বাদ পড়লে সোহ সেজদা ওয়াজিব হয়)। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এই– প্রথম তাশাহহুদের পর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদেনা মোহাম্মাদ পর্যন্ত পড়ে ফেললে সোহ সেজদা ওয়াজিব হবে। কারণ এটাই দরূদ শরীফের সংক্ষিপ্ততম রূপ। আর তাঁর বংশধরগণের উপর দরূদ শরীফ পাঠের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়িদিনা মোহাম্মাদিন ওয়া আলিহি। কেফায়া গ্রন্থে রয়েছে, দরূদ শরীফে 'আলা' (উপরে) শব্দটি থাকতেই হবে।

হজরত ফুজালা ইবনে উবায়দা থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল করীম স. একবার এক লোকের নামাজ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি দেখলেন, দরূদ পাঠ ব্যতিরেকেই সে তার নামাজ শেষ করলো। রসুল পাক স. বললেন, লোকটি তাড়াহুড়া করে নামাজ শেষ করেছে। এরপর তিনি তাকে কাছে ডেকে অন্যদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা নামাজ পাঠকালে তাশাহহুদ শুরু করবে আল্লাহ্তায়ালার হামদ দ্বারা। অপর বর্ণনায় রয়েছে তামজিদ ও ছানা দ্বারা। এরপর তোমাদের নবীর উপর দরূদ পাঠ করা উচিত। তারপর যেমন খুশী দোয়া করতে পারো।

হজরত ওমর ফারুক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যতক্ষণ না দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, ততক্ষণ নামাজ ও দোয়া জমিন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। হজরত আলী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, দোয়ার সময় দরূদ পড়তে হবে, সে দোয়া নামাজের ভিতরে হোক অথবা বাহিরে। দোয়ার পূর্বে দরূদ পাঠ করা দোয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী আদব ও রোকন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা যখন আল্লাহ্তায়ালার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে, তখন তোমাদের পক্ষে উচিত হবে সর্বাগ্রে আল্লাহ্তায়ালার হামদ ও ছানা পাঠ করা, তারপর নবী করীম স. এর প্রতি দরূদ পাঠ করা, তারপর প্রার্থনা করা। এটা হচ্ছে প্রয়োজনপূরণ ও উদ্দেশ্য অর্জনের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। তাছাড়া দোয়ার প্রথমে, মাঝখানে ও শেষে দরূদ পাঠ করা উচিত। হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এরকম বলা হয়েছে। হজরত, ইবনে আতা বলেছেন, দোয়ার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকা জরুরী– বাজু, আসবাব এবং আওকাত। দোয়ার মধ্যে এই তিনটি রোকন থাকলে তা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে গৃহীত হয়। দোয়ার বাজু বা ডানা যদি শক্তিশালী হয়, তবে তা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ হয়। আওকাত যথোপযুক্ত হলে তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল হয়। আর আসবাব উপযোগী হলে দোয়া অতিদ্রুত পৌঁছে যায় তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। দোয়ার আরকান হচ্ছে একাগ্রচিত্ততা, ক্রন্দন ও বিনয়। দোয়ার সময় চক্ষু বন্ধ রাখলে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে সৃষ্টি হয় অন্তরের সম্পৃক্ততা। সকল কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থী হতে হয়। দোয়ার বাজু হচ্ছে সত্যবাদিতা, আওকাত হচ্ছে শেষ রাত্রি আর আসবাব হচ্ছে নবী করীম স. এর উপরে দরূদ পাঠ। হাদিস শরীফে

এসেছে, দোয়ার প্রথমে ও শেষে দরূদ সংযোজিত হলে সে দোয়া কখনও বিফল হয় না। অন্য এক হাদিসে এসেছে, নবী পাক স. এরশাদ করেন, প্রতিটি প্রার্থনা আকাশের নিচে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। যখন আমার নামে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তখন ওই দোয়া আকাশের উপর উঠে যায়। কুনুতে নাজেলার দোয়াকে গ্রহণযোগ্য দোয়া হিসাবে মান্য করার জন্য খুব বেশী তাগিদ এসেছে। নবী করীম স. কুনুতে নাজেলার আমল শিক্ষা দিয়েছিলেন ইমাম হাসান ইবনে আলীকে। এই দোয়া শুরু হয়েছে 'আল্লাহুম্মা' বাক্য দ্বারা আর শেষ হয়েছে সল্লাল্লাহু আলান্নাবী মোহাম্মদ দরূদ শরীফ দ্বারা। ইমাম শাফেয়ীর মতে এটাই দোয়ায়ে কুনুত। সালাত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ্।

জুমার খুতবা পাঠের সময়ও দরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। এই দরূদ খতিব তাঁর খুতবার অংশ হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন। কেননা জুমার দিন খুতবা একটি ইবাদত। আর সে খুতবায় আল্লাহ্র জিকির থাকা একটি শর্ত। খুতবায় রসুল পাক স. এর আলোচনা থাকাও ওয়াজিব, যেমন থাকে আযানে ও নামাজে। দরূদ শরীফ ব্যতিরেকে জুমার খুতবা বিশুদ্ধ হবে না। একথা বলেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ।

মোয়াজ্জিনের আযানের জবাব দেয়ার সময়ও দরূদ পাঠ করতে হয়। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, রসুল করীম স. বলেন, মোয়াজ্জিন আযানে যে সকল বাক্য উচ্চারণ করে, সেসকল বাক্য উচ্চারণ করেই আযানের জবাব দিও এবং আমার উপর দরূদ পাঠ কোরো। আমার উপর যে একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। আযানের পর আমার অসিলা করে প্রার্থনা কোরো। ইনশাআল্লাহ্ আযান অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে।

কোনো কোনো কিতাবে রয়েছে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়, আযান ও ইকামতের জবাব দানকালে এবং দুই ঈদের তকবির পাঠের সময় দরূদ পাঠ করতে হবে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবেও এ কথা বলা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছিলেন, মসজিদে প্রবেশকালে এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দরূদ পাঠ করতে হবে। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে হজরত ফাতেমা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস পেশ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, রসুল করীম স. মসজিদে প্রবেশের সময় নিজের উপর দরূদ পাঠ করতেন, তারপর বলতেন 'আল্লাহুম্মাগফিরলি যুনুবী ওয়াফ তাহলী আবওয়াবা রহমাতিক'। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ও তিনি নিজের উপর দরূদ পাঠ করতেন, তার পর বলতেন 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যুনুবী ওয়াফ তাহলী আবওয়াবা ফাদলিক'। আবু বকর ইবনে আমর ইবনে হাজমও এরকম বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক শায়বানী বলেছেন, যে মসজিদে প্রবেশ করবে তার জন্য উচিত হবে দরূদ শরীফ পাঠ করা, রহমতপ্রার্থী হওয়া এবং রসুল পাক স. এর বংশধরদের উপর শান্তি ও বরকত প্রার্থনা করা।

আমর ইবনে দিনার 'তোমরা যখন গৃহে প্রবেশ করবে, তখন গৃহবাসীদের প্রতি সালাম পেশ করবে'— এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, ঘরে কেউ না থাকলে বলতে হবে আস সালামু আলান্নাবী ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ঘর বলে বুঝানো হয়েছে মসজিদকে। ইমাম নাখয়ী বলেছেন, মসজিদে কেউ উপস্থিত না থাকলে বলতে হবে 'আস্সালামু আলা রসূলিল্লাহ' আর কেউ উপস্থিত থাকলে বলতে হবে— 'আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলেহীন'। আলকামা বলেছেন, আমি যখন মসজিদে প্রবেশ করি তখন বলি, আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান্নাবীয়ু ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকতুহু ওয়া সল্লাল্লাহু ওয়া মালায়িকাতিহি আলা মোহাম্মদ। হজরত কা'ব থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। তিনি মসজিদে থেকে বের হওয়ার সময়ও এভাবে দরূদ, সালাম পাঠ করতেন। তবে জানাযা নামাজের সময় দরূদ পাঠ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া প্রণেতা বলেছেন, জানাযার নামাজে প্রথম তকবির বলার পর সুরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। দ্বিতীয় তকবির বরার পর পাঠ করতে হবে দরূদ শরীফ। তৃতীয় তকবিরের পর যার জানাযা পড়া হচ্ছে তার জন্য দোয়া করতে হবে এবং চতুর্থ তকবির বলার পর পড়তে হবে اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা। জানাযার নামাজ পাঠের এই নিয়মটি গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী। আমাদের মাজহাব কিন্তু জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করার নিয়ম নেই। অবশ্য এক বর্ণনানুসারে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, দোয়া হিসাবে সুরা ফাতিহা পাঠ করা যায়, ক্বেরাত হিসাবে নয়। সুরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও আমাদের মাজহাবে দরূদ শরীফ পাঠ করার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। দ্বিতীয় তকবিরের পর দরূদ শরীফ পাঠ করার বিধান আমাদের মাযহাবে রয়েছে।

হজ ও ওমরার তালবিয়া পাঠের সময়ও দরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে আরোহণের সময়ও দরূদ শরীফ পাঠের নিয়ম রয়েছে। হজরত ওমর ফারুকের এক হাদিসে রয়েছে রসুলে আকরম স. বলেছেন, মক্কা শরীফে উপস্থিত হলে তোমরা সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করবে। এরপর মাকামে ইব্রাহিমে দুই রাকাত নামাজ আদায়ের পর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করবে এবং খানায়ে কাবার দিকে মুখ করে তকবির ধ্বনি উচ্চারণের পর পাঠ করবে আল্লাহ্তায়ালার হামদ ও ছানা। এরপর পাঠ করবে নবী করীম স. এর প্রতি দরূদ ও সালাম। তারপর লিপ্ত হবে আপন প্রার্থনায়। মারওয়া পাহাড়ে আরোহণের পরেও এরকম আমল করবে।

ধর্মীয় মহফিলও দরূদ ও সালাম পাঠের আরেকটি স্থান। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুলে মকবুল স. বলেন, আল্লাহ্তায়ালার আলোচনা

এবং রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয় না– এরকম মজলিশে কেউ যেনো না বসে। এরকম মজলিশে উপবেশনকারীরা কিয়ামতের দিন আক্ষেপ ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতে থাকবে। আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন কিংবা শাস্তি দিবেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুল মকবুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠ না করে কেউ যদি কোনো সমাবেশ থেকে উঠে যায়, তবে কিয়ামতের দিন আফসোস করা ভিন্ন তার কোনো উপায় থাকবে না। দরূদ শরীফ পাঠের পুরস্কার স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে সেদিন তার অনুশোচনার সীমা পরিসীমা থাকবে না।

সকাল ও সন্ধ্যা এই দু'টি সময়ও দরূদ শরীফ পাঠ করার সময়। তিবরানীতে হজরত আবু দারদা থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, রসুল মকবুল স. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রত্যুষে দশবার এবং সায়াহ্নে দশ বার দরূদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত তাকে খুঁজে পাবেই।

ওজুর সময়ও দরূদ পাঠের আরেকটি মোক্ষম সময়। হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ওজুর সময় রসুলে মকবুল স. প্রতি দরূদ পাঠ করে না, তার ওজু পরিপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ ওজুর প্রাক্কালে মাঝে মধ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। কোনো কোনো কিতাবে রয়েছে, ওজু ও তায়াম্মুমের পর এবং দুই শাহাদাত আদায় করার সময় (আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু) পড়ার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। ওজুর অঙ্গসমূহ ধৌত করার সময়ও দরূদ শরীফ পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়েছে হাদিস শরীফে। এই গ্রন্থের লেখকও এরকম আমল করে থাকেন। হঠাৎ কানে তালা লাগলে দরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। হজরত আবু রাফে কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, হঠাৎ কারো শ্রবণ শক্তি স্তব্ধ হয়ে গেলে, সে যেন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার উপর দরূদ পাঠ করে। তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে কল্যাণের সঙ্গে স্মরণ করে, আল্লাহ্পাক তাকে কল্যাণের সঙ্গে স্মরণ করেন। এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরাম বলেন, কান তালা লাগা কল্যাণের সঙ্গে স্মরণ করার আলামত।

কোনো কিছু ভুলে গেলে দরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। দরূদ শরীফ স্মৃতি বিভ্রমকে দূর করে দেয়। দরূদের বরকতে ভুলে যাওয়া কথা স্মরণে আসে। এই আমলটি বহু পরীক্ষিত। হজরত আনাস থেকে আবু মুসা মদিনী কর্তৃক বর্ণিত একটি মারফু বর্ণনায় রয়েছে, রসুলে করীম স. বলেন, কোনো কিছু ভুলে গেলে তোমরা আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ কোরো। ইনশাআল্লাহ্ বিস্মৃত বিষয় মনে পড়ে যাবে।

পিপাসার্ত অবস্থাও দরূদ শরীফ পাঠ করার একটি উৎকৃষ্ট সময়। আলেমদের একটি দল রয়েছে এই অভিমতের পক্ষে এবং অন্য একটি দল রয়েছে বিপক্ষে। বিপক্ষ দলের বক্তব্য হচ্ছে, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কেবল আল্লাহ্পাককেই স্মরণ করতে

হবে। যেমন, পানাহার, স্ত্রীসঙ্গম ইত্যাদি করতে হয় আল্লাহ্র নাম নিয়ে। হজরত নাফে থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে রয়েছে, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে ওমরের সামনে হাঁচি দিলো এবং পাঠ করলো 'আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ'– এ কথা শুনে হজরত ইবনে ওমর বললেন, আমিও হাঁচির সময় এরকম বলি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে রসুল পাক স. এরকম শিক্ষা দান করেননি। কাজেই আমার বলা উচিত আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লিহাল (সকল অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালারই প্রশংসা)।

মোট কথা দরূদ শরীফ পাঠের বিষয়টি প্রশ্নাতীতরূপে মাননীয়। কিন্তু রসুল আকরম স. আমাদেরকে যেখানে যেরকম করতে বলেছেন, তাই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তিনি স. প্রতিটি আমলের জন্য বিভিন্ন স্থান ও সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর নির্ধারণকেই নির্বিবাদে মান্য করতে হবে। নতুবা তা হবে অসঙ্গত ও অন্যায়। যেমন রুকু অবস্থায় বলতে হয় সুবহানা রব্বিয়াল আজিম। ওই সময় কেউ যদি কোরআন পাঠ করে তবে নিশ্চয়ই তা সুসঙ্গত বলে বিবেচিত হবে না। এরকম বলা হয়েছে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায়।

আশশিফা গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইবনে হাবিব বলেছেন, পশু জবেহ করার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা মাকরূহ। ইবনে মামুন মালিকি বলেছেন, বিস্ময় প্রকাশকালে দরূদ শরীফ পাঠ করা মাকরূহ। এরকম বর্ণিত হয়েছে যে, গোনাহ্ বর্জন এবং সওয়াব প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে না। ইবনুল কাসেম থেকে আসবাগ বর্ণনা করেছেন, দু'টি স্থান রয়েছে এমন– যেখানে আল্লাহ্তায়ালার জিকির ব্যতীত অন্য কিছু করা যাবে না। সে দুটি স্থান হচ্ছে ১. জবেহ, ২. হাঁচি। আশহাব বলেছেন এই দু'টো স্থানে দরূদ শরীফ পাঠকে সুন্নত মনে করা যাবে না এবং এতে অভ্যস্ত হওয়াও যাবে না। কেউ কেউ আযানের সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পর মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ বলে, গ্রন্থকার বলেছেন, এটাও সুন্নত নয়। তাই পরিত্যাজ্য।

দরূদ শরীফ পাঠের আরেকটি উৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে, রসুল পাক স. এর রওজা শরীফ জিয়ারতের সময়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, যখন কেউ আমার নিকট সালাম প্রেরণ করে, তখন আল্লাহ্তায়ালা আমার রূহকে আমার শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন এবং আমি তার সালামের জবাব দিয়ে থাকি। এই হাদিসে রয়েছে হায়াতুন নবী স. এর স্বীকৃতি। তারিখে মদীনা কিতাবে এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইবনে আসাকের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. বলেছেন, কেউ আমার রওজা শরীফের নিকটে দাঁড়িয়ে সালাম দিলে আমি তা শুনতে পাই।

তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ ও লিপিবদ্ধ করার সময়টি হচ্ছে দরূদ শরীফ পাঠের প্রকৃষ্ট সময়। হাদিস শরীফে এসেছে, ওই ব্যক্তির নাক ধূলা মলিন হোক যে আমার নাম শুনেও দরূদ পাঠ করে না। এক হাদিসে এসেছে, সেই ব্যক্তি একেবারেই বখিল (কৃপণ)।

দরূদ শরীফ পাঠের স্থান ও সময় সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা হলো, সেগুলো উম্মতের আমল দ্বারা প্রমাণিত। কোনো অনুচ্ছেদেই এর ব্যতিক্রম কিছু লেখা হয়নি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এর সঙ্গে দরূদ শরীফ লেখার নিয়মটি প্রচলিত হয়েছিলো বনী হাশেমদের প্রথম দিককার শাসন আমলে। পরে এই নিয়মটি সারা পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে। কোনো রচনা লেখার কাজ শেষ হলে কেউ কেউ দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকেন। কেউ কেউ পাঠ করেন রচনার শুরুতে এবং শেষে। এক হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, কেউ যদি তার রচিত গ্রন্থে দরূদ শরীফ লিপিবদ্ধ করে, তবে যতদিন সেখানে আমার নাম লিখিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ফেরেশতাবৃন্দ লেখকের জন্য ইসতেগফার করতে থাকবে। দরূদ শরীফ প্রসঙ্গে এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা করা হলো সেগুলো শিফা ও মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থ দু'টিতেও রয়েছে। ফাকেহী নামক পুস্তিকার জিয়ারত অধ্যায়েও প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। সেখানে আরো বেশী স্থান ও সময়ের উল্লেখ রয়েছে। সেখান থেকেও কিছু তথ্য এনে বক্ষমান রচনায় সংযোজন করা হয়েছে। এই অধম (গ্রন্থকার) প্রতিটি নামাজের পরেই দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে। কাদেরীয়া সিলসিলার মাশায়েখগণ আমাকে এই এজাজত দিয়েছেন যে, আমি যেনো ফরজ, নফল সকল নামাজের শেষে তিনবার দরূদ পাঠ করি।

তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর, তাহাজ্জুদ নামাজ শেষে জুমার দিনে ও রাতে, বিশেষ করে জুমার নামাজের পর, বৃহস্পতিবার রাতে এবং শনি ও রবিবার দিনে দরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে হাদিস শরীফে। দরূদ শরীফ পাঠের অন্যান্য সময় হচ্ছে, সেহরীর সময়, কাবা শরীফ দর্শনকালে, হাজারে আসওয়াদ চুম্বনকালে, কাবা শরীফ তাওয়াফের সময়, হজের বিভিন্ন অবস্থানে, (আরাফায়, মিনায়, মুজদালিফায়), রসুল স. এর স্মৃতি চিহ্নসমূহ দেখার সময়, মসজিদে কোবা, বদর প্রান্তর, উহুদ পর্বত– এ সকল পবিত্র স্থানে উপস্থিত হলে, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রাক্কালে, ওসিয়তনামা লেখার সময়, সফরের সংকল্প করলে, যানবাহনে আরোহণের সময়, যাত্রা বিরতিকালে, বাজারে গমনের সময়, বাজারে উপনীত হওয়ার পর, অতিব্যস্ততা ও উদাসীনতার সময়, নিমন্ত্রণ স্থানে হাজির হলে, নিমন্ত্রণ থেকে প্রস্থানকালে, গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্তের সময়, কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে, ভয়-ভীতি ও অভাব-অনটনের সময়, গৃহপালিত পশু বা প্রাণী হারিয়ে গেলে, ক্রীতদাস পালিয়ে গেলে। এমনকি যে কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে,

দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদ দেখা দিলে, প্লেগের সময়, পানিতে ডোবা থেকে রক্ষা পেলে, পায়ে কাঁটা বিঁধলে এবং মুলা খাওয়ার সময়, মুলার ঢেকুর থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে দরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ রয়েছে। পাত্র থেকে পানি পান করার সময়েও দরূদ পাঠের নির্দেশ রয়েছে। গাধার আওয়াজ শুনলেও পাঠ করতে বলা হয়েছে দরূদ শরীফ। তবে সে সময় দরূদ পাঠের সাথে আউজুবিল্লাহ পাঠেরও হুকুম রয়েছে পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে গেলেও দরূদ পাঠ করতে হবে। যাতে ওই দরূদ পাপের ক্ষতিপূরণ হিসাবে গৃহীত হয়। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এবং তাদের সাথে কর সম্মিলনের (মোসাফেহা) করার সময়ও রয়েছে দরূদ পাঠের বিধান। ধর্মীয় সমাবেশেও দরূদ পাঠ করতে হবে। আরো দরূদ পাঠ করতে হবে কোরআন মজীদ পাঠ শেষে, কোরআন স্মৃতিবদ্ধ (হেফজ) করার নিমিত্তে উচ্চারিত দোয়ার সময়, যে কোনো বৈধ কর্মের শুরুতে, ধর্মীয় শিক্ষা দানের সময়, বিশেষ করে হাদিস শরীফের পাঠ দানের সময় দরূদ শরীফ পাঠের বিধান দেয়া হয়েছে। ধর্ম প্রচারকালে, হাদিস শরীফ পাঠের শুরুতে ও শেষে এবং কাম্যবস্তু হস্তগত হলে দরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। তবে কোনো কোনো আলেম কোরবানী করার সময় এবং বিস্ময়াবিষ্ট হলে দরূদ শরীফ পাঠ করাকে মাকরূহ মনে করেছেন। সালাত পেশ করার সময় সালামকেও মিলিয়ে নিতে হবে। সালাত ও সালাম লেখায় ও উচ্চারণে সম্মিলিত থাকাই সমীচীন এবং উত্তম। ইমাম নববী বলেছেন, সালাম ব্যতীত সালাত পাঠ করা মাকরূহ। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশে রয়েছে সালাত ও সালামের কথা। ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, সালাম ছাড়া সালাত পাঠ মাকরূহ। তবে প্রথমে সালাত সম্পন্ন করার পর বিরতি না দিয়ে সালাম উচ্চারণ করলে কোনো দোষ হবে না। এরকম বলা হয়েছে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায়।

ইমাম মোহাম্মদ জুয়েনী বলেছেন, নবী ছাড়া অন্যদের নিকট কেবল সালাত পেশ করা যাবে, যদি তিনি অনুপস্থিত হন। সামনাসামনি হলে তাকেও সালাম দেওয়া যাবে। আর সালাত ও সালামের ক্ষেত্রে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

রসুলে করীম স. এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করা সকল সময়ের জন্যই মোস্তাহাব ও মোস্তাহসান। বিশেষ করে জুমার দিবসে ও রজনীতে। কারণ জুমার দিবস ও রাত্রি সপ্তাহের অন্য দিনগুলোর চেয়ে উত্তম। হাদিস শরীফে জুমার দিবসে অধিক দরূদ ও সালাম পাঠের হুকুম রয়েছে। ওই দরূদ ও সালাম রসুল পাক স. এর দরবারে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এবং তা কবুলও করা হয়। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেন, তোমরা জুমার দিবসে ও নিশিতে আমার উপর অধিক দরূদ পাঠ করো। জুমার দিন ও রাত উজ্জ্বলতর। অনেক হাদিসে একথা বলা হয়েছে। উম্মতের দরূদ ও সালাম অবশ্য রসুল স. এর পবিত্র দরবারে সব সময়েই উপস্থিত করা হয়। তৎসত্ত্বেও শুক্রবারের

রাত ও দিনের দরূদ উপস্থাপন করা হয় বিশেষরূপে। আল্লাহ্পাকের সাইয়াহীন নামক ফেরেশতারা উম্মতের দরূদ ও সালাম রসুল পাক স. এর দরবারে পৌঁছে দেন। কিন্তু জুমার রাত ও দিনের দরূদ তাদের মাধ্যম ব্যতিরেকেই পৌঁছে যায় তাঁর পবিত্র দরবারে। হাদিস শরীফে এসেছে, তোমাদের দিনসূহের মধ্যে সর্বোত্তম শুক্রবারের দিন। ওই দিন সৃষ্টি করা হয়েছিলো হজরত আদমকে, ওই দিনই সাঙ্গ করা হয়েছে তাঁর পৃথিবীর জীবন। শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে ওই দিনেই। সুতরাং তোমরাও ওই দিন আমার প্রতি বেশী করে সালাত পাঠ করো।

জুমার দিন বেশী করে দরূদ পাঠ করার নির্দেশের মধ্যে রয়েছে এই তথ্যটি– ওই দিন দরূদ ও সালাম নিঃসন্দেহে কবুল করা হয়ে থাকে এবং ওই দিনের দরূদ হয় তাঁর স. বিশেষ সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা ইবনে কাইয়ুমের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, জুমার দিনের দরূদ ও সালামের বিশেষ মর্যাদার কারণ হচ্ছে, জুমার দিন শ্রেষ্ঠ দিন (সাইয়্যেদুল আইয়াম) আর রসুল পাক স. হচ্ছেন, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (সাইয়্যেদুন নাস)। উভয় শ্রেষ্ঠত্বের সংযোগের কারণে জুমার দিনের দরূদ ও সালাম সর্বোত্তম। এর মধ্যে রয়েছে আরেকটি হেকমত– উম্মতেরা তাঁর স. এর মাধ্যমেই কল্যাণ লাভ করেছেন। আর এই কল্যাণ দানের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছে শুক্রবারকে। আর আখেরাতে শুক্রবারেই বিশ্বাসীরা লাভ করবে হুর, বালাখানা, জান্নাত, অন্যান্য নেয়ামত এবং আল্লাহ্পাকের পবিত্র দীদার। আর আখেরাতে শুক্রবারের নাম দেয়া হবে 'ইয়াওমুল মাজিদ'। এরকম নামকরণের কারণ হচ্ছে, বেহেশতিদেরকে ওই দিনই দেয়া হবে বিপুল অনুগ্রহসম্ভার এবং কাঙ্খিত দীদারে এলাহী। পৃথিবীতে এই দিনটি হচ্ছে ঈদের দিন। আর আখেরাতের ঈদের দিন হচ্ছে ইয়াওমুল মাজিদ। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে রোজে আজলে সকল মানুষকে (মানুষের আত্মাকে) একত্র করা হয়েছিলো ওই জুমার দিনেই। আল্লাহ্পাক দয়া করে ওই দিনেই সৃষ্টির প্রয়োজন, কামনা বাসনা পূর্ণ করে থাকেন। ওই দিনের প্রার্থনাকারীরা বিফল হন না। তাদের সকল প্রার্থনাই কবুল করা হয়। রসুল আকরম স. এর মাধ্যম ছাড়া মানুষ কখনোই আল্লাহ্পাকের অমূল্য নেয়ামতরাজির কথা জানতে পারতো না। কখনই পেতো না প্রকৃত পথের সন্ধান। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জুমার দিনে তাঁর প্রতি অধিক দরূদ ও সালাম প্রেরণের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা।

দরূদ ও সালামের ফযীলত

রসুলে আকরম স. এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের ফযীলত ও বরকত অসীম। এর পরিণাম ও ফলাফল বর্ণনার অতীত। এর মধ্যে যেনো রয়েছে দুনিয়া

ও আখেরাতের সকল বরকত ও কল্যাণ। এই আমলটি আল্লাহ্‌তায়ালার আমলের অনুরূপ। ফেরেশতাদের আমলের অনুসরণও রয়েছে এর মধ্যে। আর এই আমলটি পালনের জন্য সরাসরি হুকুম এসেছে আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে। বলা হয়েছে ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নাবিয়্যী, ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু সল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা (নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন, হে বিশ্বাসীরা! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করো)। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্‌পাক তার উপর দশবার রহমত নাজিল করবেন। কতইনা সৌভাগ্য ওই ব্যক্তির, যার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত নাজিল করেন।

আল্লাহ্‌পাকের বিধান এরকমই। তিনি বান্দার কাজের কমপক্ষে দশগুণ বিনিময় দান করেন। তাই একবার দরূদ শরীফের বিনিময়ে দশ বার রহমতের কথা বলা হয়েছে। একথা শুনে এরকম মনে করা সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালাও মাত্র একবার তাঁর রসুলের প্রতি দরূদ পাঠ করে থাকেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু প্রতিপালক। তিনি ইচ্ছাময়। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনই করেন। এতে কারোরই কিছু বলার অধিকার নেই। সুতরাং তিনি তাঁর রসুলের উপর কতবার দরূদ পাঠ করেন, তা কেবল জানেন তিনিই। মানুষেরা সালাত ও সালাম পাঠের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। আর সকল নির্দেশ তাঁর অধীন। তাই তিনি যে সালাত ও সালাম পাঠ করেন তা তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই করেন। তাঁর নির্দেশ পালন করতে যেয়ে তাঁর বান্দারা যে দরূদ পাঠ করেন তার অর্থ যেনো এরকম, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার এই নির্দেশের যথামান্যতা রক্ষা করতে অক্ষম। সুতরাং আমাদের এই দিনহীনতাকে ক্ষমা করে দিয়ে তুমিই বরং তোমার রসুলের প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে তাঁর অনন্য সৌভাগ্যকে উত্তরোত্তর সমুন্নত করতে থাকো। আল্লাহ্‌পাকই দাতা। তাই তিনি তাঁর পরিপূর্ণ রহমত ও মেহেরবানি তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন রসুলে মকবুল স.এর প্রতি বর্ষণ করেন। আল্লাহ্‌পাকের সালাত ও সালাম প্রেরণের অর্থ এটাই।

এ প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাকের একবার সালাত ও সালাম প্রেরণ মানুষের লক্ষ কোটি সালাত ও সালাম পাঠের চেয়েও উত্তম। সুতরাং আল্লাহ্‌র স্বাধীন কর্মের সঙ্গে বান্দার বাধ্যগত কর্মের কোনো তুলনা হতে পারে না। বুঝবার সুবিধার জন্য তুলনা উপস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলে সে তুলনাটি হবে এরকম, যেনো একটি ক্ষুদ্র মুক্তাখণ্ড যা লক্ষ লক্ষ মুদ্রার চেয়েও উত্তম।

হজরত আবু তালহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল পাক স. অত্যন্ত আনন্দচিত্তে তাঁর গৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আনন্দের অসংখ্য নক্ষত্র যেনো জ্বল জ্বল করে জ্বলছিলো তাঁর পবিত্র অবয়বে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আজ আপনি এতো আনন্দিত কেনো? তিনি স. বললেন, এইমাত্র

আমাকে জিব্‌রাইল বলে গেলেন– আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি দশবার সালাত ও সালাম প্রেরণ করবো। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে রসুল স. এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করবে, আল্লাহ্‌তায়ালাও তার উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করবেন। এই হাদিসে একবার এবং দশবার কথা– দু'টোর উল্লেখ নেই। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, যতক্ষণ কেউ আমার উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে থাকে, আল্লাহ্‌তায়ালাও ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করতে থাকেন। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্‌পাক ও তাঁর ফেরেশতাবৃন্দ ওই ব্যক্তির উপর সত্তর গুণ বেশী সালাত ও সালাম প্রেরণ করে থাকেন। বান্দা মিসকিন (গ্রন্থকার) বলেন, বিষয়টি সবসময় সত্তরের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রকৃত প্রেমিক ও বিশুদ্ধ চিত্তধারীদের ক্ষেত্রে সাতশ' গুণ– এমনকি তার চেয়েও অধিক বিনিময় লাভ হয়ে থাকে। তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত উবাই ইবনে কা'ব বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আমার প্রার্থনার প্রাক্কালে আপনার উপর দরূদ পাঠ করতে ইচ্ছা করি। এখন আমি জানতে ইচ্ছুক যে, কি পরিমাণ দরূদ আমি পাঠ করবো। তিনি স. বললেন, তুমি যেমন ইচ্ছা করো। যত বেশী করবে, ততই লাভবান হবে। আমি বললাম, প্রার্থনার অর্ধেক সময় যদি দরূদ পাঠের কাজে লাগাই। তিনি স. বললেন, তুমি যেমন ইচ্ছা করো। তবে যত বেশী করবে ততই মঙ্গল। আমি বললাম, যদি দুই তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় করি। তিনি স. বললেন, তুমি যেমন করতে চাও। কিন্তু যত বেশী করবে ততই কল্যাণ। আমি বললাম, আমি যদি আমার দোয়ায় কেবল দরূদ শরীফ পাঠ করেই ক্ষান্ত হই। তিনি স. বললেন. তবে তো তুমি তোমার সকল আশাই পূর্ণ করে নিলে এবং নিজেকে পাপমুক্ত করে ফেললে।

এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি অবতীর্ণ করবেন দশটি রহমত। ক্ষমা করে দেবেন তার দশটি গোনাহ্ এবং দান করবেন তাকে দশটি মর্যাদা। দশটি গোনাহ্ মাফ হওয়া এবং দশটি মর্তবা বুলন্দ হওয়া কেবল দরূদ শরীফের আমলের জন্যই বিশিষ্ট। অন্য কোনো আমলের ক্ষেত্রে এরকম বলা হয়নি। অন্য আমলের ক্ষেত্রে অবশ্য কয়েকগুণ সওয়াব বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পাপের ক্ষমা ও মর্যাদার সমুন্নতি সম্পর্কে সেগুলোর মধ্যে কিছু বলা হয়নি।

রসুলপাক স. এরশাদ করেন, মানকৃলা আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মদ ওয়া আনজালাহুল মুনজিলিল কারিম। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, যে আমার নামে এই দরূদ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আমার নিকট ওই ব্যক্তি অধিকতর নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে। অন্য এক হাদিসে এসেছে, ভয়াবহ কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি পরিত্রাণ পাবে, যে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে। হজরত আবু

বকর সিদ্দিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, গোনাহ্ ধৌত করার জন্য এবং নরকানলকে নির্বাপিত করার জন্য দরূদ শরীফ পাঠ তুল্য অন্য কোনো আমল নেই। আর রসুল পাক স. কে সালাম পেশ করা ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়ে অধিকতর উত্তম আমল। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, নবী পাক স. এর ওপর দরূদ পাঠ রহমত অবতীর্ণ হওয়াকে অপরিহার্য্য করে দেয়। সুতরাং একথাটি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত যে, যত বেশী দরূদ পাঠ করা যাবে, তত বেশী আল্লাহ্র রহমত ও ফয়েজ লাভ হবে। তবে এ প্রাপ্তির তারতম্য নির্ণিত হবে পাঠকারীর অবস্থা ও যোগ্যতানুসারে। মোটকথা নবী পাক স. এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা অর্থ নূর ও বরকতের প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দেওয়া। এতে করে সকল কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত হয়। আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণ রসুল প্রেমে বিভোর থাকেন বলে দরূদ পাঠের মাধ্যমে তাঁরা লাভ করেন আল্লাহ্পাকের অপার দান ও অনুগ্রহ। কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, কারো যদি শায়েখে কামেল ও মোর্শেদে মোকাম্মেল লাভ হয়, তবে তার কর্তব্য হবে রসুলে করীম স. এর উপর দরূদ পাঠ করাকে অপরিহার্য করে নেয়া। এভাবেই সে আল্লাহ্পাকের মিলন লাভ করতে সক্ষম হবে। দরূদ ও সালাম প্রেরণকারীর প্রতি পতিত হয় নবী পাক স. এর বিশেষ তাওয়াজ্জোহ। তখন সে আধ্যাত্মিকভাবে প্রতিপালিত হতে থাকে আদবে নববী ও আখলাকে মোহাম্মদী দ্বারা এবং শেষে লাভ করতে সক্ষম হয় কামালিয়াতের অত্যুচ্চ মর্যাদা এবং আল্লাহ্পাকের নৈকট্যের বিশেষ মাকাম। সাথে সাথে রসুলে করীম স. এর নৈকট্য লাভেও সে ধন্য হয়ে যায়।

কোনো কোনো পীর মাশায়েখ অধিক পরিমাণে সুরা এখলাস এবং দরূদ শরীফ পাঠ করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন সুরা এখলাসের মধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার মারেফত অর্জিত হয় এবং দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে অর্জিত হয় রসুল পাক স. এর আত্মিক নৈকট্য। যে রসুল পাক স. এর উপর অত্যধিক দরূদ পাঠ করবে সে নিশ্চয়ই রসুল স. এর দর্শন লাভে ধন্য হবে। এই দর্শন জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে কিংবা স্বপ্নযোগে। শায়েখ ইমাম আলী মোত্তাকী তাঁর আল-হিকামুল কবির গ্রন্থে শায়েখ আহম্মদ ইবনে মুসা আল মাশরু থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। শাজালিয়া তরিকার কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, সুলুকের পথে আল্লাহ্র মারেফাত ও নৈকট্য অর্জনের অসিলা স্বরূপ কোনো পীর আউলিয়া না পাওয়া গেলে কর্তব্য হবে জাহেরী শরিয়তের উপর আমল করা এবং রসুল পাক স. এর উপর অধিক মাত্রায় দরূদ পাঠ করা। এরকম আমল তখন আত্মিক ক্ষমতাধর মোর্শেদে কামেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। অত্যধিক দরূদ শরীফ পাঠ অন্তর্জগতে এমন নূরের সৃষ্টি করে যা সুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করাতে সক্ষম। এভাবে রসুল পাক স. এর নিকট থেকে রূহানী ফয়েজ ও মদদ লাভ করা সম্ভব। এভাবে কোনো কোনো মাশায়েখ জিকিরের চেয়ে দরূদ পাঠকে

অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যদিও আল্লাহ্‌র জিকিরই স্বয়ংপূর্ণ এবং সর্বোত্তম। রসুলপাক স. এর পবিত্র দরবার থেকে ফয়েজ প্রাপ্তির বিষয়টিই শাজালিয়া তরিকার প্রধান বিষয়। পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং রসুল প্রেমে সদাবিভোর থাকতে পারলেই কেবল এরকম বিশেষ আত্মিক সম্পর্ক অর্জন করা সম্ভব।

শায়েখ আজাল্ল কুতুবুল ওয়াকত আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী বলেছেন, দরূদ পাঠকারীকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, সে রহমতের কোনো জলধিতে অবগাহন করছে। নিমজ্জিত হচ্ছে কোন সমুদ্রের অতলে। দরূদ পাঠক যখন আল্লাহুম্মা বলে তখন আল্লাহ্‌র রহমতের সাগরে ডুব দেয়। তিনি বলেছেন, হজরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন বান্দা আল্লাহুম্মা বলে তখন যেনো আল্লাহ্‌র সকল নাম ধরে ডাক দেয়। আর সে যখন বলে সল্লিয়ালা সাইয়্যেদেনা, তখন ডুবে যায় রসুলে করীম স. এর ফজল ও অনুগ্রহের অকুল দরিয়ায়। তারপর যখন বলে ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি তখন ঘটে তাঁর ফযীলত ও কামালাতের মধ্যে পূর্ণ নিমজ্জন। সে তখন অসীম সমুদ্রের ডুবুরী ও সন্তরণকারী। এর পরে বঞ্চনা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে কি?

গ্রন্থকার (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেছেন, শায়েখ আজাল্ল আব্দুল ওয়াহাব মুত্তাকী এই ফকিরকে মদীনা মনোয়ারা সফরের অনুমতিদানকালে বলেছিলেন, মনে রেখো, এই সফরে ফরজসমূহ আদায় করার পর নবীয়ে করীম স. এর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ নেই। প্রতিদিন কতবার দরূদ পাঠ করতে হবে একথা জানতে চাইলে তিনি বললেন, সংখ্যা নির্ধারণের কোনো প্রয়োজন নেই। যত বেশী সম্ভব তত বেশী পাঠ করা উচিত। সালাত ও সালাম উচ্চারণের মাধ্যমে রসনাকে রাখা উচিত সদাসিক্ত। চেষ্টা করা উচিত যেনো সর্বক্ষণ তাঁরই রঙে রঞ্জিত থাকা যায়। মদীনা যাত্রী নয়, এমন তালেবকে তিনি প্রতিদিন এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ দিতেন। কারো পক্ষে এমন করা সম্ভব না হলে প্রতি ওয়াক্তের নামাজের পর একশ’ বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করতে বলতেন।প্রতি ওয়াক্তের নামাজ শেষে তিনি নিজে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন তিনশ’ বার করে। রাতে শয্যা গ্রহণের পর নিদ্রাভিভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি একাধারে দরূদ পাঠ করে যেতেন। তিনি বলতেন, দরূদ পাঠের মাধ্যমে রেসালাতের মঞ্জিল পর্যন্ত উপনীত হওয়া যায়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেন, কেউ আমার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করলে আল্লাহ্‌পাক আমার রূহকে আমার শরীরের সঙ্গে সম্মিলিত করে দেন। তখন আমি সালামের প্রত্যুত্তর দেই। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত অপর এক হাদিসে রয়েছে, নবী পাক স. বলেন, আমার রওজা শরীফের সন্নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তির দরূদ ও সালাম আমি শুনতে পাই আর দূরবর্তীদের দরূদ ও সালাম আমার নিকটে পৌঁছে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দরূদবাহী ফেরেশতারা সেই দরূদ ও সালাম আমার কাছে নিয়ে আসে। হজরত ইবনে

মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবীপাক স. বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা আমার উম্মতের দরূদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে একদল ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে এবং দরূদ ও সালাম অনুসন্ধান করে ফেরে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, রসুল পাক স. এর নিকট দরূদ ও সালাম পৌঁছানো হয় পাঠকারীর নাম ও তার পিতার নাম সহযোগে। ফেরেশতারা বলে, ইয়া রসুলুল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার দরবারে এই সালাম প্রেরণ করেছেন। একথা বলে তাঁরা দরূদ ও সালাম উপস্থাপন করেন ওই পবিত্র দরবারে।

দরূদ ও সালাম প্রেরণের উপকারিতাসমূহের মধ্য থেকে একটি অন্যতম উপকার এই যে, এতে করে পাঠকারীর চরিত্রে বিকশিত হয় নবীয়ে করীম স.এর চারিত্রিক সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছায়া। চোখের সামনে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর পবিত্র অবয়ব। রসুল পাক স. এর তাওয়াজ্জোহের বরকতেই এই দুর্লভ সম্পর্কটি লাভ হয়। জনৈক কবি বলেছেন, আমার হৃদয় যদি বিদীর্ণ করা হয়, তবে হে রসুল আপনি সেখানে দেখতে পাবেন কেবল তৌহিদের বাণী এবং আপনার পবিত্র নাম।

দরূদ পাঠকারী দশটি গোলাম আযাদ করার এবং দশটি জেহাদে অংশগ্রহণ করার সমান সওয়াব লাভ করে থাকেন এবং তাঁর দোয়া কবুল করা হয়। সে অর্জন করে রসুল পাক স. এর শাফায়াত, সাক্ষ্য ও নৈকট্য। রসুল পাক স. নিজে দরূদ পাঠকারীর জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেবেন এবং সে তাঁর স. সঙ্গে অন্য সকলের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিয়ামত দিবসের সকল মুসিবত থেকে দরূদ পাঠকারীকে রক্ষা করার জন্য তিনিই স. যথেষ্ট। তার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য তিনিই স. উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভুল ভ্রান্তি মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এই বিশাল সফলতা কেবল দরূদ শরীফের বরকতেই লাভ করা সম্ভব।

কেউ কেউ বলেছেন, ফরজ হুকুমসমূহ পালন করতে যেয়ে যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে তবে দরূদ শরীফই তার ক্ষতিপূরণ। বরং দরূদ শরীফ ক্ষতিপূরণ (কাফফারা) ও দানের (সদকার) চেয়ে উত্তম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দরূদ শরীফ পাঠের আরো অনেক উপকার রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ, মৃত্যুকষ্ট থেকে অব্যাহতি, পার্থিব ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা লাভ, দুরাবস্থা থেকে মুক্তি, স্মৃতির পুনরুদ্ধার, দারিদ্র থেকে মুক্তি, কার্পণ্য ও কঠোরতা থেকে অব্যাহতি, কারো বদদোয়া থেকে হেফাজত, ধর্মীয় মজলিশে পবিত্রতা ও কল্যাণ লাভ, রহমতের বেষ্টন, পুলসিরাত অতিক্রমকালে আলোপ্রাপ্তি, চোখের পলকে পুলসিরাত অতিক্রম, পুলসিরাতের অন্ধকার থেকে মুক্তি, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের ভালোবাসা লাভ, রসুলে মকবুল স. এর প্রতি অটুট ভালোবাসা, কিয়ামতের দিন রসুলে মকবুল স. এর সঙ্গে কর সম্মিলনের (মোসাফেহার)

সৌভাগ্য লাভ, স্বপ্নযোগে রসুল দর্শন, ফেরেশতাদের ভালোবাসা প্রাপ্তি, তাঁদের অভিনন্দন (মারহাবা) লাভ, পঠিত দরূদ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সোনার কলম দ্বারা চাঁদির কাগজে লিপিবদ্ধ হওয়া, ফেরেশতাদের কল্যাণ কামনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা লাভ।

বর্ণিত ফযীলতগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ফযীলত হচ্ছে সালামের জবাব পেয়ে সম্মানিত হওয়া। কেননা সালামের জবাব প্রদান একটি অত্যাবশ্যকীয় সুন্নত। বরং ফরজ। রসুলে মকবুল স. দরূদ পাঠকারীর শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করে থাকেন। এই সৌভাগ্যের চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে। সারা জীবনে যদি একবারও এই সৌভাগ্য লাভ করা যায় তবে তা হবে সহস্র কারামত ও বরকতের চেয়ে অধিক মূল্যবান।

এমন অনেক রসুল প্রেমিক রয়েছেন যারা সালাম পাঠের পূর্বেই সালামের জবাব পেয়ে থাকেন। কেননা সর্বাগ্রে সালাম দেয়া ছিলো রসুলে মকবুল স. এর পবিত্র আচরণগুলোর একটি। আবার এমন অনেক বুজুর্গ রয়েছেন যারা সালাম দেয়ার সাথে সাথে রসুলে মকবুল স. এর জবাবী সালাম স্বকর্ণে শুনে ধন্য হয়েছেন।

সালাত ও সালাম প্রেরণের আরো অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন, পাপ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তিনদিন পর্যন্ত একবার সালাত ও সালাম প্রেরণকারীর পাপ লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেন এবং মানুষকেও তার দোষচর্চা থেকে বিরত রাখা হয়। কিয়ামতের দিন দরূদ পাঠকারী আরশের ছায়া লাভ করে ধন্য হবে। দরূদ ও সালাম পুণ্যের পাল্লাকে ভারী করে দেয়। ক্ষুধা ও পিপাসা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। দরূদ ও সালাম পাঠকারী হবে বেহেশতের অনেক রমণীর পতি। লাভ করতে পারবে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয়ে সঠিকতম সিদ্ধান্ত। দরূদ ও সালাম পাঠের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার জিকিরও রয়েছে। দরূদ ও সালামের মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং লাভ হয় আল্লাহ্পাকের মারেফাত। এই ফযীলতগুলোর কথা আল্লামা ফাকেহী তাঁর আদাবে জিয়ারত নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আমার লেখা 'জজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' পুস্তকেও এই তত্ত্বগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। সেখানে রয়েছে আরো অনেক ঘটনার বিবরণ। তার মধ্যে থেকে দু'একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো। একটি ঘটনা সংকলিত হয়েছে শায়েখ আহমদ ইবনে আবু বকর মোহাম্মদ জাওয়াদ সুফী রচিত পুস্তক থেকে। শায়েখ মজদুদদীন ফিরোজাবাদী ঘটনাটির বর্ণনাকারী। আশা করা যায় সত্যান্বেষীগণ একে দরূদ শরীফের ওজিফা হিসাবে আমল করবেন। ঘটনাটি এই–

শায়েখ আবু বকর মুজাহিদ ছিলেন তাঁর সময়ের স্বনামধন্য ইমাম এবং তৎকালীন আলেমগণের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। বিখ্যাত বুজুর্গ শায়েখ শিবলী একদিন তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। শায়েখ আবু বকর তাঁকে স্বাগতম

জানালেন, তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থলে চুম্বন দান করলেন। দরবারে উপস্থিত লোকেরা বিস্মিত হয়ে বললো, হে সম্মানিত শায়েখ! আপনি শিবলীকে এতো সমাদর করছেন অথচ বাগদাদবাসীরা তাকে পাগল বলে থাকে। শায়েখ আবু বকর বললেন, আমি নিজের ইচ্ছায় এরকম করিনি। আমি রসুলুল্লাহ স. কে যে রকম করতে দেখেছি সেরকমই করেছি। আমি স্বপ্নে দেখেছি নবী করীম স. এর দরবারে শিবলী আগমন করলেন। তিনি স. তখন উঠে গিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থলে চুম্বন দান করলেন। আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! শিবলীর প্রতি আপনার এমতো ভালোবাসা প্রদর্শনের কারণ কি? তিনি স. বললেন, শিবলী আমাকে ভালোবাসে। সে প্রতি নামাজ শেষে লাক্বদ জায়াকুম রসুলুমমিন আনফুসিকুম এই আয়াত পাঠ করে, তারপর পাঠ করে আমার প্রতি দরূদ ও সালাম।

হারামাইন শরীফাইন এর যে সমস্ত বুজুর্গ মিলাদ শরীফের মহফিল করে থাকেন, তাঁরা বর্ণিত আয়াতটি দরূদ শরীফ পাঠ করার পূর্বে আবৃত্তি করে থাকেন। ওই আয়াতের পর তাঁরা এই আয়াতটিও পড়ে থাকেন– ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসল্লুনা আলা ন্নাবী। তারপর পড়েন দরূদ শরীফ– আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আলিহি.....।

দরূদ শরীফ পাঠ না করার পরিণাম

দরূদ শরীফ পাঠকারীরা যেমন অশেষ কল্যাণের অধিকারী, দরূদ বিমুখেরাও তেমনি ক্ষতি ও অকল্যাণের উপযোগী। এটাই স্বাভাবিক। যে কাজ করলে সওয়াব পাওয়া যায় সে কাজের অবমাননা করলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। একথাটি স্বতঃসিদ্ধ। হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে করীম স. বলেছেন, নিঃসন্দেহে দরূদ শরীফ বর্জনকারীরা কৃপণদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কৃপণ। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রকৃত কৃপণ ওই ব্যক্তি, যে আমার নাম শোনে অথচ আমার উপর দরূদ পাঠ করে না। জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাটি প্রচলিত যে, যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কুণ্ঠিত সেই ব্যক্তিই কৃপণ। কিন্তু প্রকৃত কৃপণ হচ্ছে দরূদ বর্জনকারীরা। সে রসুল পাক স. এর মহব্বত এবং তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এতটুকু সময়ও ব্যয় করতে রাজী নয়। সে তার রসনা ব্যবহারেও কুণ্ঠিত। সুতরাং সেতো কৃপণই। সম্পদ ব্যয় এবং গোলাম আযাদের চেয়েও দরূদ শরীফ পাঠের সওয়াব অনেক বেশী এবং তা পাঠ করাও সহজ। অথচ সে এই সহজ আমলটি করতে রাজী নয়।

ইমাম জাফর সাদেক তাঁর সম্মানিত পিতা ইমাম মোহাম্মদ বাকের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ স. বলেন, আমার নাম উচ্চারণকালে যে দরূদ পাঠ করলো না

সে ভুলে গেলো বেহেশতের পথ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করতে ভুলে গেলো, সে ভুলে গেলো বেহেশতের পথ। কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে মকবুল স. বলেছেন, আমার নামের উচ্চারণ শুনে যে দরূদ পাঠ করলো না, সে আমার উপর জুলুম করলো। হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. বলেছেন, আমার প্রতি দরূদ পাঠ না করেই যদি কোনো মজলিশ সমাপ্ত করা হয় তবে বুঝতে হবে মজলিশে উপবেশনকারীরা যেনো এতক্ষণ বসেছিলো একটি মৃত লাশের পাশে। যেনো লাশের দুর্গন্ধ অত্যধিক হয়েছে বলে তারা সে মজলিশ ছেড়ে চলে গেলো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ স. বলেন, কোনো মজলিশে যদি দরূদ শরীফ পাঠ না করা হয়, তবে মজলিশে উপবেশনকারীরা কিয়ামতের দিন আক্ষেপ করতে থাকবেন, যদিও তাঁরা বেহেশতবাসী হন। অর্থাৎ বেহেশতে প্রবেশ করলেও দরূদশরীফ পাঠের বিশাল পুণ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তাঁরা আক্ষেপে পতিত হবেন।

একটি হাদিসে এসেছে, দরূদ শরীফের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র জিকির ও দরূদ উভয়টি সম্পাদিত হয়। অপর এক হাদিসে এসেছে, রসুল পাক স. বলেন, ওই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক যে আমার নাম শোনা সত্ত্বেও আমার প্রতি দরূদ পাঠ করলো না। আর ওই ব্যক্তিও অপদস্থ হোক, যে রমজান মাস পাওয়া সত্ত্বেও পাপমুক্ত হতে পারলো না। কেননা রমজান হচ্ছে মাগফিরাতের মৌসুম। এই মাস গনিমততুল্য। আর ওই ব্যক্তিও অপমানিত হোক, যে মাতা-পিতাকে পেলো অথবা দু'জনের একজনকে পেলো অথচ তাঁদের খেদমত করে জান্নাত অর্জন করে নিতে পারলো না। অপর একটি হাদিসে রয়েছে, একদিন রসুল পাক স. মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মিম্বরে গিয়ে বসে বললেন, আমিন। আবার তিনি বের হয়ে গেলেন পুনরায় এসে মিম্বরে বসে বললেন, আমিন। হজরত মু'য়াজ ইবনে জাবাল নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার এরকম করার কারণ কী? রসুল পাক স. বললেন, হজরত জিব্‌রাইল এসে আমাকে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার নামের উচ্চারণ শুনে যদি কেউ দরূদ পাঠ না করে তবে আল্লাহ্‌পাক তাকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন এবং আল্লাহ্‌পাক তাকে তাঁর রহমতের দরবার থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। আপনি এই কথার উপরে আমিন বলুন। তাই আমি মিম্বরে বসে আমিন বলেছি। তারপর পুনরায় হজরত জিব্‌রাইল বললেন, যে আপন পিতা-মাতাকে জীবদ্দশায় পেয়েও তাদের সেবা যত্ন করে পুণ্য অর্জন করে নিতে পারলো না আল্লাহ্‌পাক তাকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন। তাই পুনরায় আমি মিম্বরে বসে বলেছি আমিন। আরেকটি হাদিসে এসেছে, কোনো মজলিশে যদি দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় তবে ওই মজলিশে কোনো পাপ সংঘটিত হলেও দরূদ শরীফের অসিলায় আল্লাহ্‌ সে পাপকে ক্ষমা করে দেবেন।

নবী ও রসুল ছাড়া অন্যদের প্রতি দরূদ পাঠ

নবী ও রসুল ব্যতিরেকে, অন্য কারো প্রতি দরূদ পাঠ করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণের মতভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। এ সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে। ১. একদল আলেম বলেন, রসুলে করীম স. ছাড়া অন্য কারো উপর সালাত শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে না। আশশিফা কিতাবে রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. ছাড়া অন্য কারো প্রতি সালাত পেশ করা জায়েয নয়। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থেও এই বিবরণটি রয়েছে। ইবনে আবী শায়বা ওসমান থেকে তিনি হজরত ইকরামা থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই বর্ণনাটি উপস্থাপনা করেছেন। সেখানে আরো বলা হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমি জানি না, নবী করীম স. ছাড়া অন্য কেউ সালাত পাওয়ার উপযুক্ত কিনা। এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. ছাড়া অন্য কোনো নবীর প্রতি সালাত পেশ করা জায়েয নয়। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ থেকেও এ ধরনের বিবরণ রয়েছে। তবে আলেমগণ বলেছেন এ কথাটিই প্রসিদ্ধ যে, অভিমতটি ইমাম মালেকের নয়। বরং আল মাবসুত গ্রন্থে তিনি বলেছেন, আমি মনে করি আম্বিয়া কেরাম ছাড়া অন্য কারো উপর সালত পেশ করা মাকরূহ। তিনি আরও বলেছেন, আমাদেরকে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে সে হুকুম লংঘনের অধিকার আমাদের নেই। আর আমরা এর উপযোগীও নই।

২. দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে সালাত শব্দটি কেবল রসুলে করীম স. এর জন্য সুনির্দিষ্ট নয়। কেননা হাদিস শরীফে এসেছে, তোমরা আমার পূর্ববর্তী নবীগণকে সালাত পেশ করো। আল্লাহ্পাক আমাকে যেমন প্রেরণ করেছেন তেমনি তাঁদেরকেও প্রেরণ করেছেন। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সালাত কেবল নবীগণের জন্য নির্ধারিত, অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং অন্য কারো প্রতি সালাত প্রেরণ বৈধ নয়। এরকম বলেছেন, ইমাম সুফিয়ান সওরী। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে প্রাপ্ত আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, নবী ছাড়া অন্য কারো প্রতি সালাত পাঠ সমীচীন নয়।

৩. তৃতীয় অভিমতের প্রবক্তরা বলেন, সালাত অর্থ আল্লাহ্তায়ালার নিকট রহমত প্রার্থনা করা। অর্থাৎ এরকম দোয়া করা যেনো আল্লাহ্পাক রহমত প্রদান করেন। আর এই নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। এই সাধারণ নির্দেশটির বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ কোনো হাদিস নেই। এ ব্যাপারে কোনো ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, "ওই আল্লাহ্ যিনি তাঁর ফেরেশতাবৃন্দসহ তোমাদের উপর সালাত পেশ করছেন।" ধৈর্যশীলদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক একস্থানে এরশাদ করেছেন, 'উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মিররব্বিহিম ওয়া

রহমাহ্' (ধৈর্য্যধারণকারীরা এরকম, যাদের উপর তাদের প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাত ও রহমত বর্ষিত হয়)। সদকা প্রদানকারীদের সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, "হে রসুল! মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের সদকার সম্পদ গ্রহণ করুন এবং তার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করে দিন এবং তাদের উপর সালাত পেশ করুন।" এই আয়াতের নির্দেশের প্রেক্ষিতেই সদকার মাল নিয়ে তাঁর নিকট আগমনকারীদের জন্য তিনি সালাত পাঠ করতেন। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, রসুলে পাক স. একবার তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, হে আমার আল্লাহ্! আপনি আবু আউফার বংশধরদের উপর সালাত (রহমত) অবতীর্ণ করুন এবং অমুক অমুক ব্যক্তির উপর সালাত নাজিল করুন। এক হাদিসে এসেছে, রসুলে করীম স. এই মর্মে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমর ইবনুল আ'সের উপর সালাত বর্ষণ করুন। রসুল স. বলেছেন, আমর ইবনুল আস আমার নিকটে অত্যধিক সদকার মাল নিয়ে আসে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল পাক স. সালাত পাঠের শিক্ষাও দিয়েছেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রসুলে আকরম স., হজরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হজরত ওমর ফারুকের উপর সালাত পেশ করতেন। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে ওয়াহাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস বলেছেন, আমরা আমাদের অনুপস্থিত সঙ্গী সাথীদের জন্য দোয়া করতাম এভাবে, হে আল্লাহ্! অমুকের উপর, ওই পুণ্যবানদের পুণ্যের সমপরিমাণ সালাত নাজিল করুন, যে পুণ্যবানেরা রাত্রিতে নামাজ পাঠ করে এবং দিনে রোজা রাখে।

কাযী আয়ায বলেছেন, সত্যানুসারী আলেমগণ বলেন, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে যে কথা বলা হয়েছে, যা জমহুর ওলামার গ্রহণযোগ্য নীতি এবং অনেক ফকিহ্ ও কালাম শাস্ত্রবিদ যে মতের উপরে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন, সেই অভিমতই সঠিক। অভিমতটি এই যে, নবীপাক স. ছাড়া অন্য কারো উপর আলাদা করে সালাত পেশ করা জায়েয নয়। কেননা সালাত কেবল আম্বিয়া কেরামের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং আবু বকর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আলী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এরকম বলা যাবে না। যদিও শব্দগত ও অর্থগতভাবে এরকম বলা শুদ্ধ। যেমন আল্লাহ্পাকের জন্য নির্ধারিত শব্দাবলী অন্য কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেউ যদি বলে ক্বলা মোহাম্মাদ আযযা ওয়া জাল্লাহ– তাহলে তা বৈধ হবে না, যদিও অর্থগত দিক দিয়ে আজিজ ও জলিল শব্দ দু'টি রসুল পাক স. এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সালাত ও সালামকে রসুল পাক স. ও অন্য নবীগণের জন্য সুনির্ধারিত করা ওয়াজিব। তবে কোরআনুল করীম এবং হাদিস শরীফের মধ্যে যেসকল স্থানে সালাত শব্দটি এসেছে, বুঝতে হবে সেখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দোয়ার উদ্দেশ্যে। নবী ও রসুলদের বিশেষ সম্মানের নিদর্শন হিসাবে ওই সকল

স্থানে সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সল্লিয়ালা আবী আউফা (আবি আউফার প্রতি সালাত নাযিল করুন)– এখানে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সালাত শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। ব্যবহার করা হয়েছে দোয়া হিসেবে। আম্বিয়া কেরাম ছাড়া অন্যদের বেলায় ব্যবহার করতে হবে গুফরান অথবা রেদোয়ান। যেমন কোরআন মজীদে এসেছে, 'রদ্বিআল্লাহু আনহুম ওয়া রেদওয়ানা, রব্বানাগফিরলানা ওয়াল ইয়াখওয়া নিনা আল্লাজিনা সাবা কুনা বিল ইমান।'

আলেমগণ বলেছেন, আম্বিয়া কেরাম ছাড়া অন্যদের বেলায় সালাত ব্যবহারের রীতি ইসলামের প্রথম যুগে ছিলো না। পরে বেদাতীরা তাদের ইমামগণকে রসুল করীম স. এর সমতুল্য মনে করে নিয়ে এরকম শব্দ ব্যবহারে প্রণোদিত হয়েছিল। সুতরাং এই কদর্য রীতি থেকে আমাদের দূরে থাকাই সমীচীন।

রসুল পাক স. এর পরিবার পরিজন ও বংশধরদের উপর সালাত পাঠ করা বৈধ। অতি সম্পৃক্ততা ও অতিঘনিষ্ঠতাই এই বৈধতার কারণ। যেহেতু তাঁরা রসুল স. এর অতি নিকট জন ও অতিনৈকট্যের বৃত্তভূত তাই তাঁদের প্রতি সালাত পেশ করার ব্যাপারে কারো কোনো মতানৈক্য নেই। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, "রসুলের দোয়াকে তোমাদের মধ্যস্থিত একে অপরের দোয়ার মতো কোরো না।" এই আয়াত থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুলে করীম স. এর জন্য দোয়া এবং অন্যদের জন্য দোয়ার মধ্যে পার্থক্য থাকা ওয়াজিব। এই অভিমতটি নিরাপদ।

ইমামুল হারামাইনের পিতা শায়েখ আবু মোহাম্মদ জুয়েনী বলেছেন, সালাম শব্দটিও সালাতের সমঅর্থসম্পন্ন। তাই অনুপস্থিত ব্যক্তির বেলায় সালাত শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না এবং আলাদা করেও কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। তবে যারা উপস্থিত তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ যারা উপস্থিত তাদেরকে বলা যাবে সালামুন আলাইকুম অথবা ওয়াআলাইকুমুস সালাম। রসুল পাক স. এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এটাই নিকটতম পদ্ধতি। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আম্বিয়া কেরাম ছাড়া অন্যদের উপর সালাত ও সালাম পেশ করা সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। যারা এরকম করা যাবে না বলেছেন, তাঁদের এই নিষিদ্ধতার ধরন নির্ণীত হওয়া উচিত। নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, নিষিদ্ধতাটি হারাম না মকরূহে তানযিহী। না দু'টার একটাও নয়। ইমাম নববী তাঁর কিতাবুল আশকারে এ বিষয়ে লিখেছেন। তিনি বলেছেন, নবী রসুল ছাড়া অন্যদের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করার আমলটি মাকরূহে তানযিহী। কেননা এই আমলটি বেদাতীদের রীতি। আল্লাহ্‌তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

বর্ণিত আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, এই প্রসঙ্গটি ইসলামের প্রথম যুগের আলোচ্য বিষয় ছিলো না। তখন সকল মুসলমান কেবল নবী করীম স. এর উপর সালাত ও সালাম পেশ করতেন এবং অন্য নবী রসুলদের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করতেন– এই হাদিসের প্রেক্ষিতে সল্লু আলাল আম্বিয়ায়ি ক্বলি ফাইন উলায়িকা বায়াছা হুম কামা বায়াছানি। (তোমরা অন্য নবীদের প্রতিও সালাত ও সালাম পেশ করো যেমন পেশ করো আমার উপর, কারণ আল্লাহ্পাক যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন তেমনি প্রেরণ করেছেন তাঁদেরকে)। এই রীতি পরবর্তীতে প্রথম ভঙ্গ করে শীয়া সম্প্রদায়। তারা আহলে বাইতের উপর আলাদা করে সালাত ও সালাম প্রদানের প্রচলন করে। সুতরাং এটা তাদের নব আবিষ্কৃত রীতি। তাই এ ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু রসুলে পাক স. এর সঙ্গে সম্মিলিত অবস্থায় আহলে বাইতের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করার ব্যাপারে কোনোই মতানৈক্য নেই।

পরবর্তী যুগের আলেমগণের মধ্যে সালাত ও সালামের সুন্দর পরিভাষার প্রচলন হয়েছে। আরবদেশসমূহের মাশায়েখগণের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়েছে রদ্বিআল্লাহ্ আনহু এবং রহমতুল্লাহি আলাইহি। প্রসিদ্ধ ফেকাহ গ্রন্থের প্রণেতা তাঁর নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন ক্বলা রদ্বি আল্লাহ্ আনহু। সুফিয়ানে কেরামের তরিকার পীর মোর্শেদগণের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়েছে ক্বদ্দা সিররুহুল আযিয অথবা ক্বদ্দাসাসিররুহ। অবশ্য বুজুর্গ ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে এরকম শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ বুজুর্গ ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন রহমতুল্লাহি আলাইহি।

আবার কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী। অবশ্য শেষোক্ত কথাটি ব্যকরণসম্মত নয়। কেউ কেউ আম্বিয়া কেরামের উপর দরূদ পাঠ করেন এভাবে– সল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা আলাইহি ওয়া আলাইহিম। এই নিয়মটি অধিকাংশ আরবদেশে প্রচলিত। মনে রাখতে হবে নবী করীম স. এর প্রতি দরূদ পাঠের নির্দেশ এবং অন্য নবীগণের প্রতি দরূদ পাঠের নির্দেশ একই রকম। অধিকাংশ অনারব দেশে রসুল পাক স. এর নামের সঙ্গে আলাইহিস সালাম বলার রেওয়াজ রয়েছে। তবে উত্তম হলো আলাইহিস সালাতু ওয়াস্সালাম বলা। আর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্সালাম বলা দরূদ শরীফের একটি অতি সংক্ষিপ্ত, সঠিক ও নিরাপদ রীতি।

দশম অধ্যায়

রসুল আকরম স. এর ইবাদত

ইবাদতের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্পাক সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করেছেন। এ কথা আল্লাহ্পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন এভাবে– 'ওমা খলাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়া'বুদূন' (আমি জ্বিন ও ইনসানকে আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি)। ইবাদতের মাধ্যমেই আল্লাহ্পাকের নৈকট্যভাজন হওয়া যায়। আল্লাহ্পাক ঘোষণা দিয়েছেন– ইন্নাল্লহা রব্বি ও রব্বিকুম ফা'বুদু-হাযা সিরাতিম মুসতাক্বিম (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। তোমরা তাঁর ইবাদত করো। এটাই সরল সঠিক পথ)। আল্লাহ্পাক আরও এরশাদ করেছেন, "আমি নিশ্চিত জানি যে, অবিশ্বাসীরা যা বলে তাতে আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়ে যায় সুতরাং (তাদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে) আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আপনি চিরন্তনবিধান (মৃত্যু) পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের ইবাদতে মগ্ন থাকুন)।" এই আয়াতে উল্লেখিত একিন শব্দটির অর্থ মৃত্যু। কেননা মৃত্যু সকল সংকীর্ণতা, অপ্রসন্নতা ও দুশ্চিন্তার ইতি টেনে দেয়। তাই মৃত্যু একিনি বা সুদৃঢ় বিষয়। অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে, দৃঢ় একিন বা বিশ্বাস লাভের জন্য ইবাদতে মগ্ন থাকুন। মৃত্যু যেমন সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটায়, তেমনি ইবাদতের মাধ্যমে সকল সংকীর্ণতা ও দুশ্চিন্তা অপসারিত হওয়া সম্ভব। সম্ভব এভাবে যে, মানুষ ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলে তার সম্মুখে উন্মোচিত হয় বিশাল সৃষ্টি রহস্য। সীমাবদ্ধতার যবনিকা উন্মোচিত হয়ে তখন এই বিশাল সৃষ্টিকেও মনে হতে থাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট। তখন সৃষ্টি জগতের প্রভাব তার হৃদয় থেকে মুছে যায়। অন্তরের অস্থিরতা প্রশমিত হয়। পার্থিব লাভ ও ক্ষতি তার নিকটে হয়ে পড়ে সমার্থক। আর ঠিক তখনই বিক্ষিপ্ত চিন্তারাজি থেকে মুক্তি লাভ করে তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় সুদৃঢ় একিন বা বিশ্বাস। আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দাদের উপর বিপদাপদ আপতিত হলে সে ইবাদতের প্রতি আরো অধিক মগ্ন হয়ে পড়ে। তার অভিব্যক্তিতে তখন একথাটি ফুটে উঠে, হে আল্লাহ্! তোমার ইবাদত করা আমার উপর ওয়াজিব, তাই আমি তোমার ইবাদতে মগ্ন থাকতে চাই। তারপর তোমার ইচ্ছা তুমি আমাকে কীভাবে রাখবে। বিপদে না শান্তিতে। এরকম অবস্থায় আল্লাহ্পাক তাঁর বান্দাকে বিপদ মুসবিতের

কথা ভুলিয়ে দেন। দান করেন নৈরাশ্যবিরোধী অন্তর। বার বার তার স্মরণ পথে মুদ্রিত করে দেন এই কথাটি "তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁরই ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত থাকো।"

একটি সম্প্রদায়ের ধারণা– আল্লাহ্ পাকের মহব্বত ও নৈকট্য লাভ করার পর প্রকাশ্য ইবাদতের প্রয়োজন আর থাকে না। নৈকট্যভাজন ব্যক্তি তখন ইবাদতের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যায় অর্থাৎ তার উপরে তখন আর শরিয়তের বাধ্যবাধকতা থাকে না। কিন্তু এই ধারণাটি ভুল এবং পথভ্রষ্টতার নামান্তর।

কেননা বান্দা আমৃত্যু আল্লাহ্পাকের দরবারের দিকে পথ পরিক্রমরত, পৃথিবীর জীবনে বন্দী থাকা পর্যন্ত তার এই পরিক্রমণ শেষ হবার নয়। পথ অতিক্রমের সময় পথচারী কখনও পাথেয় এবং প্রয়োজন থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। পথের সামান পথিকের একটি অতি আবশ্যকীয় প্রয়োজন। আর এই সামান বা পাথেয় হচ্ছে ইবাদত। যতই নৈকট্য লাভ হোক না কেনো ইবাদতের প্রয়োজন থেকে আবেদ কখনও অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। এক ব্যক্তি একবার জুনায়েদ বাগদাদীর মজলিসে বসে নৈকট্যশীলদের শরিয়তের দায়িত্ব না থাকার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলো। জুনায়েদ বাগদাদী তখন তাকে বলেছিলেন, আমি মনে করি তোমার ওই অলিক কল্পনা ব্যভিচার ও মদ্যপান করার চেয়েও নিকৃষ্ট।

নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে রসুল আকদাস স. এর ইবাদতের প্রকৃতি সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, তিনি তখন তাঁর পূর্ববর্তী কোনো শরিয়ত অনুযায়ী ইবাদত বন্দেগী করতেন। কিন্তু জমহুরের মত হচ্ছে তিনি পূর্ববর্তী কোনো শরিয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন না। বরং তাঁর হৃদয়ে উদ্ভাসিত ইবাদত সম্পর্কিত ধারণার অনুগামী হতেন এবং বুদ্ধি বিবেককেও পরিচালিত করতেন সেই রীতিতে। কেউ কেউ অবশ্য এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। তখন তাঁর ইবাদত জিকিরের মাধ্যমে হতো, না কি ফিকিরের মাধ্যমে– সে সম্পর্কেও মতপৃথকতা রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে উত্তম মত হচ্ছে, তিনি তখন ইবাদত করতেন জিকিরের (আল্লাহ্র স্মরণের) মাধ্যমে। জিকির (আল্লাহ্র স্মরণ) ও ফিকির (আল্লাহ্ সম্পর্কিত চিন্তা গবেষণা) উভয়টির মাধ্যমে তাঁর তখনকার ইবাদত সম্পাদিত হতো– এরকমও বলা যেতে পারে। কেননা জিকিরের নূরের মাধ্যমে ফিকিরের পরিচ্ছন্নতা লাভ হয় এবং মহামহিম আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় মর্যাদার রহস্য উন্মোচিত হয়। আল্লাহ্পাকই অধিক অবহিত। জিকিরের মর্যাদাই উচ্চতর। কেননা জিকির বিনা মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্যকে নিশ্চিত করে। জিকিরের উৎসারণ ঘটে হৃদয় থেকে– যে হৃদয় বিশ্বাস ও প্রেমের আধার। আর আল্লাহ্পাকের ফয়েজ বর্ষণের মূল কেন্দ্রও হৃদয় বা অন্তঃকরণ। পক্ষান্তরে ফিকির

উত্থিত হয় নফস বা প্রবৃত্তি থেকে। বোধ ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এই ফিকিরের।

আগেই বলা হয়েছে, কোনো কোনো আলেম মত প্রকাশ করেছেন নবুয়ত পূর্ব সময়ে তিনি স. পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়ত অনুযায়ী ইবাদত করতেন। বিশেষ করে তিনি অনুসরণ করতেন হজরত ইব্রাহিমের শরিয়তের। কোরআনুল করীমে উদ্ধৃত হয়েছে, "পূর্ববর্তী নবীগণকে আল্লাহ্তায়ালা হেদায়েত দান করেছেন। সুতরাং (হে রসুল) আপনি তাদের হেদায়েত অনুসরণ করুন।" আরো উদ্ধৃত হয়েছে, "অতঃপর আমি আপনার কাছে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম যে, আপনি মিল্লাতে ইব্রাহিমের অনুসরণ করুন।" এই আয়াতগুলোকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন ওই সকল আলেম, যারা বলে থাকেন নবুয়তপূর্ব সময়ে তিনি স. পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের এমতো অভিমত সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বর্ণিত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত হেদায়েতের অর্থ হবে ইমান ও তৌহিদ (বিশ্বাস ও আল্লাহ্পাকের এককত্ব)। এই ইমান ও তৌহিদই ধর্মের মৌলিক বিষয়। ওই মৌলিক বিষয়টিকেই বর্ণিত আয়াতগুলোতে হেদায়েত শব্দটির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধর্মের শাখা প্রশাখা যা শরিয়তের বিষয়বস্তু, তাকে হেদায়েত বলা হয়নি। শরিয়তের হুকুম আহকাম বিভিন্ন নবীদের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক বিষয়ের পরিবর্তন অকল্পনীয়। তাই যা পরিবর্তিত হয়, তা হেদায়েত নামে অভিহিত হতে পারে না। অতএব বর্ণিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি স. পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসারী ছিলেন। তবে হ্যাঁ, এরকম সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি স. পূর্বের কোনো না কোনো শরিয়তকে অনুমোদন করেছেন এবং সেই হিসেবে মেনেছেন। আর সে শরিয়ত হজরত ইব্রাহিমের শরিয়ত হলেও হতে পারে। কেননা তিনি হচ্ছেন এই মিল্লাতের (মুসলিম সম্প্রদায়ের) পিতা। আর সেই শরিয়ত হজরত ঈসার শরিয়ত হলেও হতে পারে। কেননা তিনি ছিলেন তাঁর স. নিকটতর সময়ের শরিয়ত প্রবর্তক। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

যদি বলা হয় তিনি স. যদি পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়ত মেনেছেন তাহলে তাঁর রসুল শ্রেষ্ঠ হওয়ার মর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ হয় নাকি? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, রসুল পাক স. এর কামালিয়তেরই আংশিক বিকাশ ঘটেছিলো পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে। তাই তিনি স. প্রকারন্তরে তাঁর নিজের কামালিয়তের বিকাশকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই স্বীকৃতিকেই মান্য করেছেন বলা হয়েছে। আবার কখনও বলা হয়েছে, অনুসরণ করেছিলেন। এই ব্যাখ্যাটিকে মেনে নিলে তাঁর স. মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার বিষয়টি আর প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে না।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া রচয়িতা রসুল পাক স. এর ইবাদত রীতিকে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। আমিও উক্ত সাতটি ধরন একে একে উপস্থাপন করতে চাই– যার ক্রমধারা হবে এরকম ১। পবিত্রতা ২। নামাজ ৩। জাকাত ৪। রোজা ৫। হজ ৬। দোয়া এবং ৭। তেলাওয়াত।

১। পবিত্রতা

এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে– ওজু, মেসওয়াক, ওজুর পানির প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং ওজুর সৌন্দর্য্য ও বিধিবিধান সম্পর্কে। ওজু শব্দের প্রথম অক্ষরটি (ওয়াও) 'পেশ' সহযোগে পড়লে শব্দটির উচ্চারণ হবে উজু এবং অর্থ হবে ওজু করা। আর যদি ওয়াও বর্ণটি 'যবর' সহযোগে পাঠ করা হয় তবে শব্দটির উচ্চারণ হবে ওয়াজু এবং অর্থ হবে ওজুর পানি। কেউ কেউ বলেছেন, দুটি উচ্চারণই সমঅর্থবোধক। অর্থাৎ উজু উচ্চারণ করলে যেমন অর্থ হবে ওজু করা অথবা ওজুর পানি, তেমনি ওয়াজু উচ্চারণ করলেও অর্থ হবে ওজুর পানি অথবা ওজু করা।

ওজুর বিধান কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিলো সে সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ওজুর বিধান অবতীর্ণ হয়েছে মদীনা মনোয়ারায়। এই আয়াতের মাধ্যমে "যখন তোমরা নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করো, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করে নাও"। আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা মায়েদার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত জিব্‌রাইল রসুল করীম স. কে নামাজ ও ওজুর বিধান শিক্ষা দিয়েছিলেন নবুয়তের প্রথম পর্যায়ে মক্কায়। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– একবার নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমা রসুলে করীম স. এর নিকট কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন, কুরায়েশেরা আপনাকে হত্যা করার অঙ্গীকার করেছে। রসুলে পাক স. বললেন, ওজুর পানি নিয়ে এসো। ওজুর পানি আনা হলো। তিনি স. ওজু করলেন। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো মক্কায়। ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন, মোফাসসিরগণের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, মদীনায় আগমনের পূর্বে মক্কা শরীফেই রসুলে করীম স. এর উপর জানাবাতের গোসলের বিধান দেওয়া হয়েছিলো। নামাজও ফরজ করা হয়েছিলো মক্কায়। আর ওজু ব্যতিরেকে তো নামাজ পাঠ করা যায় না। ইবনে আবদুল বার একথা বলেছেন যে, বিষয়টি কোনো আলেমের কাছেই অজানা নয়। শায়েখ ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হিজরতের পূর্বে ওজুর বিধান ছিলো না– একথা যারা বলেন তাদের যুক্তি অসার। তবে ওজুর বিধান ফরজ করা হয়েছে সুরা মায়েদার ওই আয়াতের মাধ্যমেই। সুতরাং হিজরতের পূর্বে ওজুর বিধান ছিলো বটে, কিন্তু বিধানটি ছিলো মোস্তাহাব প্রকৃতির, ফরজ প্রকৃতির নয়। একথা মেনে নিলে আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমস্যাটি হচ্ছে, তবে কি তখন মক্কায় ওজু ছাড়া নামাজ পাঠ বৈধ ছিলো? এরকম কথাতো কল্পনাই করা যায় না। তাহলে এমনটি হওয়া সম্ভব যে,

সুরা মায়েদার ওই আয়াতের মাধ্যমে নামাজের ওজুকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেছেন, নামাজ পাঠের পূর্ব মুহূর্তে ওজু করা ফরজ, আগে থেকে ওজু থাকলেও। পরবর্তীতে এই বিধান রহিত হয়েছে (অর্থাৎ আগে থেকে ওজু অবস্থায় থাকলে নামাজের সময় নতুন করে ওজু করতে হবে না।)। আর মক্কায় অবস্থানের সময়ে যে ওজুর কথা বলা হয়েছে, সে ওজু ছিলো কেবল ওজুবিহীন অবস্থার জন্য। নামাজ পড়তে চাইলে ওজু করে নাও– সূরা মায়েদার এই বিধানটি রহিত হওয়া সম্পর্কেও অবশ্য মতভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।

রসুল আকদাস স. প্রতিটি নামাজের জন্য ওজু করতেন। আবার কখনও কখনও এক ওজু দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতেন। হজরত বুরায়দা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে– রসুল আকদাস স. প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য ওজু করে নিতেন। আবার মক্কা বিজয়ের দিন তিনি স. এক ওজু দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামাজও আদায় করেছেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি স. এক ওজুতে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজও আদায় করেছেন। তাঁকে এরকম করতে দেখে হজরত ওমর বলেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ স.! আপনি আজ যা করলেন তা ইতোপূর্বে কখনও করেননি। রসুল আকদাস স. বললেন, হে ওমর! আমি আপন ইচ্ছায় এরকম করিনি। এক ওজু দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামাজ পাঠের বৈধতা প্রমাণ করার জন্য তিনি স. এরকম করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মানুষ যেনো একথাটি জেনে নেয় যে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজ পাঠের জন্য নতুন করে ওজু করা ফরজ নয় (যদি ওজু অটুট থাকে)। হজরত আনাস থেকে বোখারী, আবু দাউদ এবং তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে ওজু করতেন। এ সম্পর্কে হজরত আনাস প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, এক ওজু দ্বারা নামাজ পাঠ করাকে আমি ওই সময় পর্যন্ত যথেষ্ট মনে করি যতক্ষণ ওজু ভেঙে না যায়। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন ওজু করা রসুল আকদাস স. এর বৈশিষ্ট্য ছিলো না। তবে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকদাস স. এর প্রতি নির্দেশ ছিলো, প্রতিটি ওয়াক্তের নামাজ পাঠের পূর্বে ওজু করে নিতে হবে। পরে ওই আমলটি তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে যাওয়াতে নতুন নতুন ওজু করার বিধানটি উঠিয়ে নেয়া হয়। তখন দেয়া হয় কেবল মেসওয়াকের হুকুম। তবে ওজু ভঙ্গ অবস্থায় নামাজের সময় এলে তিনি স. অবশ্যই ওজু করে নিতেন।

মেসওয়াকঃ মেসওয়াক শব্দটি এসেছে সেওয়াক শব্দ থেকে। সেওয়াক অর্থ মর্দনকরা (মুখগহ্বর মর্দন করা)। মেসওয়াক শব্দের 'সিন' বর্ণটিতে 'যের' দিয়ে পড়লে শব্দটির উচ্চারণ হবে মিসিওয়াক এবং তার অর্থ হবে দন্তপরিষ্কারক কাষ্ঠ। এই মিসিওয়াক শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে মেসওয়াক।

মেসওয়াকের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। রসুল আকদাস স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের কষ্টের চিন্তা যদি আমি না করতাম তবে প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করাকে ওয়াজিব করে দিতাম। আরো এরশাদ করেছেন, মেসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতার মাধ্যম এবং আল্লাহ্পাকের সন্তোষ লাভের উপায়। আরো বলেছেন, হজরত জিব্রাইল আমার কাছে এলেই মেসওয়াক করার তাগিদ দেন। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তিনটি বিষয় আমার উপর ফরজ কিন্তু আমার উম্মতের জন্য সুন্নত। সেগুলো হচ্ছে বিতির নামাজ, তাহাজ্জুদের নামাজ এবং মেসওয়াক। এক হাদিসে এসেছে, রসুল আকদাস স. বলেছেন, আমাকে মেসওয়াক করার ব্যাপারে এত বেশী তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, আমার আশংকা হচ্ছিলো হয়তো মেসওয়াক করাকে ফরজ করে দেওয়া হবে। এ ব্যাপার উম্মতের ঐকমত্য এই যে, মেসওয়াক ওয়াজিব নয় বরং সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এ সিদ্ধান্তটিও ঐকমত্যসম্ভূত যে, ওজুর সময় মেসওয়াক করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, নামাজের সময় এবং নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার পর মেসওয়াক করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত হোযায়ফা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকদাস স. যখন রাতে গাত্রোত্থান করতেন তখন মেসওয়াক করতেন।

তিনি স. কোরআন পাঠের সময় এবং শয্যাগ্রহণের সময়েও মেসওয়াক করতেন। মুখে গন্ধ থাকুক বা না থাকুক, দাঁতের রং পরিবর্তন হোক অথবা না হোক। গৃহে প্রবেশের সময়ও তাঁর মেসওয়াক করার অভ্যাস ছিলো। জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকদাস স. ঘরে এলে প্রথমেই মেসওয়াক করে নিতেন। বলা বাহুল্য যে, ওজু ও নামাজের সময়ও তিনি মেসওয়াক করতে অভ্যস্ত ছিলেন। বোখারী শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে, রসুল আকদাস স. যখন মেসওয়াক করতেন, তখন তাঁর মুখ থেকে উ উ শব্দ বের হতো। মনে হতো যেনো বমি হয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তিনি তখন উগ উগ জাতীয় শব্দ করতেন। নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর মুখে তখন উচ্চারিত হতো আআ আআ জাতীয় শব্দ। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে আহ্ আহ্। অন্য বর্ণনায় রয়েছে উখ্ উখ্।

পিলু কাঠের দাঁতন দ্বারা মেসওয়াক করা মোস্তাহাব। রসুল আকদাস স. এরকম করতেন এবং অন্যদেরকেও করার নির্দেশ দিতেন। হাতের আঙ্গুল দিয়ে মেসওয়াক করলেও মেসওয়াকের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। নিজের আঙ্গুল দ্বারা হোক অথবা অন্যের আঙ্গুল দ্বারা। মোটা শক্ত কাপড় দ্বারাও মেসওয়াক করা যায়। শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীরা বলে থাকেন, নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করতেই হবে। তাঁরা মেসওয়াক করে থাকেন মোটা শক্ত কাপড় দ্বারা। আবু নাঈম ও

বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল আকদাস স. মেসওয়াক করতেন ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে– উপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে উপরে নয়। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে বলা হয়েছে, মেসওয়াক করতে হবে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, বাহনে আরোহণ, জুতা পরিধান, ওজু ও মেসওয়াক ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত। সুতরাং মেসওয়াক ডান হাত দিয়েই করতে হবে। এটাই মোস্তাহাব রীতি। মেসওয়াককে পরিচ্ছন্ন কিংবা অপরিচ্ছন্ন দুই ভাবেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। পরিচ্ছন্ন কাজের অন্তর্ভক্ত করা হলে ডান হাত দিয়ে মেসওয়াক করাই মোস্তাহাব হবে। আর যদি অপরিচ্ছন্ন কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে বাম হাত দিয়ে মেসওয়াক করাই হবে মোস্তাহাব। কেননা জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকদাস স. ওজু ও আহারের সময় ডান হাত ব্যবহার করতেন। আর বাম হাতকে ব্যবহার করতেন অপবিত্রতা দূর করার কাজে এবং ইস্তেঞ্জার সময়। এই হাদিসটি বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ।

কোনো কোনো হাদিস ব্যাখ্যাতা বলেছেন, মেসওয়াক শুরু করতে হবে ডান দিক থেকে। যেমন জুতা পরিধানের ব্যাপারটি ডান পা দিয়ে শুরু করতে হয়। কিন্তু তাদের এই অভিমতটি গ্রহণীয় নয়। কারণ জুতা পরিধান ও মেসওয়াক পৃথক দু'টি বিষয়। একটির হুকুম অপরটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, মেসওয়াক করার কাজটি অপবিত্রতা দূর করার কাজের মতো, যেমন নাক পরিষ্কার করা, শরীর থেকে রক্ত, পুঁজ বা অন্য কোনো ময়লা দূর করা। তাই মেসওয়াক করার কাজটি বাম হাত দিয়ে করাই উত্তম।

ইমাম মালেক বলেছেন, মসজিদের ভিতরে মেসওয়াক করা উচিত নয়। কারণ এ কাজটি অপবিত্রতা দূর করার কাজের মতো।

মেসওয়াক সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাগুলো করা হলো সেগুলো নেয়া হয়েছে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া থেকে। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত মত হচ্ছে– মেসওয়াক ডান হাত দিয়ে করাই শ্রেয়। বাম হাত দিয়েও মেসওয়াক করা যেতে পারে, যদি মেসওয়াক করা হয় দাঁতন বা কাপড় ছাড়া অর্থাৎ মুখ থেকে ময়লা কোনো কিছু বের করার প্রয়োজন দেখা দিলে সেক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করাই উত্তম। যেমন নাক পরিষ্কার করার সময় বাম হাত ব্যবহার করতে হয়। আর মসজিদের অভ্যন্তরে মেসওয়াক করা মকরূহ হবে তখনই যখন মুখ থেকে থুথু নির্গত হওয়ার আশংকা থাকে। দাঁতন বা কাপড়ের মাধ্যমে মেসওয়াক করতে হলে ডান দিক থেকে শুরু করাই মোস্তাহাব।

পানির পরিমাণ

আলেমগণ বলেছেন, রসুলে আকরম স. গোসলের সময় এক সা (পৌনে চার সের) পানি ব্যবহার করতেন, যা ছিলো পাঁচ মুদ এর সমান। আর তিনি ওজু করতেন এক মুদ পানি দিয়ে। অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। দুই রেতেল পানি দিয়ে ওজু করতেন তিনি স.। মুদ ও রেতেল– এগুলো আরবী পরিমাপ। এই পরিমাপগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে গেলে যথেষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে। তাই আমাদের দেশের আলেমরা বলেছেন, হাদিসে উল্লেখিত পরিমাপগুলো দ্বারা কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণকে বুঝানো হয়নি। বরং বর্ণনাগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, স্বল্প পরিমাণ পানিকেই যথেষ্ট মনে করা উচিত। বেঁচে থাকা উচিত অপব্যয় থেকে। তাই বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে কিছু কম বেশী হয়ে গেলে দোষের কিছু নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে কাজ সমাধা হয় এরকম পরিমাণ পানি যেনো ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া রসুল পাক স. ওজু ও গোসলের সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি স. নিজেও কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতেন না। তিনি স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক ওজুর ক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে, তারা পানি অপব্যয় করবে। তিনি স. আরো বলেছেন, ওলেহান নামক এক শয়তান ওজুতে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করার প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তার কুমন্ত্রণা দূর করার উপায় হচ্ছে– উদাসীনতাকে পরিহার করতে হবে এবং পরিত্যাগ করতে হবে সকল সন্দেহ। তার কুমন্ত্রণাকে বিন্দু পরিমাণ প্রশ্রয় না দিয়ে সহজ সরল নিয়তে ওজু সমাপন করতে হবে। তার কুমন্ত্রণাকে কঠিন মনে হলে নিজেকে লক্ষ্য করে বলতে হবে আমার আমলতো ত্রুটিপূর্ণই। আল্লাহ্পাকের দরবারের উপযোগী আমি নই। আর সেই ওলেহান শয়তানকে লক্ষ্য করে বলতে হবে– তুই আমার কাছ থেকে সরে যা। আমি যতটুকু পারছি, করছি। আমার আল্লাহ্ রহমানুর রহীম। তিনি দয়া করে আমার এতটুকু আমলই গ্রহণ করবেন। নামাজ ও অন্যান্য আমলের সময় ওয়াসওয়াসার (কুমন্ত্রণা) সৃষ্টি হলে এই নিয়মেই তার প্রতিকার করতে হবে। শয়তান এই মর্মে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমার আমল অপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। ওই কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে গেলে পড়তে হয় নাউজুবিল্লাহ এবং লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। এটাই শয়তান দূর করার মোক্ষম পন্থা।

মসনদে ইমাম আহমদ ও ইবনে মাযা শরীফে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত হয়েছে– একবার রসুল পাক স. হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে ওজু করতে দেখে বলেছিলেন, পানির অপব্যয় কোরো না।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হে সা'দ! অপব্যয় করছো কেনো? হজরত সা'দ বললেন, পানিও কি অপব্যয় করা যায়। তিনি বললেন, হ্যাঁ। পানির অপব্যয়ও এড়িয়ে চলতে হবে। তুমি যদি প্রবাহমান পানিতেও ওজু করো, তবুও প্রয়োজনের

অধিক পানি ব্যবহার করতে পারবে না। এই হাদিসে পানি অপব্যবহার সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, যেস্থানেই ওজু করা হোক না কেনো পানির অপব্যবহারকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। রসুল আকরম স. নিশ্চয় হজরত সা'দকে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে দেখেছিলেন। তাই সাবধান করে দিয়েছিলেন। অবশ্য এ সম্পর্কে ফেকাহ্‌র মাসআলা এই যে, নদী বা পুকুরে ওজু করার সময় অধিক পানি ব্যবহার করলেও তা অপব্যয় বলে গণ্য হবে না। কারণ ওই সকল ক্ষেত্রে ওজুর পানি নষ্ট হয় না। পানি পুনরায় পতিত হয় নদী অথবা পুকুরে। অপব্যয়ের সুযোগ রয়েছে কেবল গোসলখানায় রক্ষিত তোলা পানির ক্ষেত্রে।

ওজুতে ব্যবহৃত পানি কোনো কিছুকে পবিত্র করতে পারে না । এ বিষয়ে সকলে একমত। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, ওজুতে ব্যবহৃত পানি নাপাক। সুতরাং ওজুতে ব্যবহার করা হয়েছে এমন পানি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তাই ওজুতে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলে অতিরিক্ত পানিটুকু নষ্ট করে দেওয়া হয়। প্রবহমান পানির মধ্যে অবশ্য এই নষ্ট করার ব্যাপারটি নেই। তাই কেউ যদি প্রবহমান পানি সন্নিহিত স্থানে গোসলখানা তৈয়ার করে তবে সে বেশী পানি ব্যবহার করলেও পানি নষ্ট করেছে বলা যাবে না। এতদসত্ত্বেও এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম না করার তাগিদ দিয়েছেন রসুলুল্লাহ স.। আলেমগণ বলেছেন, প্রবাহিত পানি অতিরিক্ত ব্যবহার করলে পানি নষ্ট করা হয় না বটে, তবে সময়ের অপচয় তো অবশ্যই হয়। তাছাড়া শারীরিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শরিয়তের সীমালংঘন করার বিষয়টিও। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

রসুলে আকরম স. কখনও কখনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করে ওজু সম্পাদন করতেন। উম্মতকে শিক্ষাদানের জন্য তিনি এরকম করতেন। এতে করে তিনি একথাটি বুঝাতে চাইতেন যে, ধৌত কার্য্য একবারের চেয়ে কম হলে ফরজ আদায় হবে না। তাই ওজুও বিশুদ্ধ হবে না। মানুষকে দেখিয়ে ওজু করার পর রসুল আকরম স. কখনও কখনও বলতেন, এই হচ্ছে ওজু। এরকমভাবে ওজু করা ছাড়া নামাজ পড়লে সে নামাজ আল্লাহ্ পাক কবুল করবেন না। আবু দাউদ কীভাবে ওজু করতেন সে কথা কি আমি তোমাদের জানাবো না এ কথা বলে তিনি ওজুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করলেন।

রসুলে করীম স. কখনও কখনও ওজুর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন এটা হচ্ছে নূরুন আলা নূর। এতে করে পুণ্যবৃদ্ধি হয়। ওজু সম্পর্কে বর্ণনাকারী সাহাবীগণের অন্যতম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ বলেছেন, রসুল পাক স. ওজুর প্রতিটি অঙ্গ দু'বার করে ধৌত করে বলেছেন এ হচ্ছে নূরুন আলা

নূর। আবার কখনও কখনও তিনি তিনবার করে ধৌত করেছেন। এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যাসীমা। এই সর্বোচ্চ সংখ্যাসীমাকেই হাদিস শরীফে 'এই হলো ওজু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটাই অধিকাংশ আলেমদের অভিমত। এ প্রসঙ্গে অনেক বিশুদ্ধ ও উত্তম হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

দৃঢ়তা ও মর্যাদা রয়েছে তিনবার ধৌত করার মধ্যেই। রসুল পাক স. এবং সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় তিনবারই ধৌত করতে অভ্যস্ত ছিলেন। হজরত ওসমান বলেছেন, রসুলপাক স. ওজুর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করতেন এবং বলতেন, এটাই আমার ওজু এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের ওজু। এক বর্ণনায় রয়েছে, এই হচ্ছে হজরত ইব্রাহিম খলিলের ওজু।

বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করা হয়েছে, একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ ইবনে আসেম আনসারীকে বলা হয়েছিলো, রসুলে করীম স. কীভাবে ওজু করতেন, দেখিয়ে দিন। তিনি ওজুর পানি আনতে বললেন। পানি ভর্তি পাত্র আনা হলে তিনি ওই পাত্র থেকে দুই হাতে পানি ঢাললেন এবং (হাতের কবজি পর্যন্ত) তিনবার করে ধুয়ে ফেললেন। তারপর পাত্র থেকে ডান হাতে পানি উঠিয়ে নিয়ে তিনবার কুলি করলেন এবং পুনরায় পানি উঠিয়ে নিয়ে নাকে তিনবার পানি নিক্ষেপ করলেন। পুনরায় পানি নিয়ে তিনবার ধুয়ে নিলেন তাঁর মুখমণ্ডল। তারপর প্রতিটি হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধৌত করলেন। তারপর মসেহ করলেন মস্তকের সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ। মুয়াত্তা, নাসাঈ এবং তিরমিজি শরীফেও এরকম বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে, পা ধৌত করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার উল্লেখ নেই। নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে রসুল পাক স. তাঁর পবিত্র পদযুগল দুইবার করে ধৌত করেছেন। কোনো কোনো হাদিসে নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ ছাড়াই ওজুর অঙ্গসমূহ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, তিনি অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করেছেন। এমনও হতে পারে যে, অঙ্গ ধৌত করা সম্পর্কে অবহিত করাই ছিলো ওই বর্ণনাকারীর মূল উদ্দেশ্য। তাই তিনি কোনো সংখ্যার কথা বলেননি। কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে, তিনি তিনবারের অধিক অঙ্গ ধৌত করতে নিষেধ করেছেন। তার সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনবারের অধিক অথবা তিনবারের কম ধৌত করবে সে মন্দ কাজ করবে এবং জুলুম করবে। এখানে দেখা যায়, তিনবারের কম ধৌত করার বিষয়টি নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে হাদিসে উল্লেখিত 'মন্দ' শব্দটি তুলনামূলকভাবে মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রকৃত মন্দ অর্থে নয়। অর্থাৎ তিনবার ধৌত করার তুলনায় তিনবারের কম ধৌত করা একটি মন্দ কাজ। সুতরাং কাজটিকে একটি ছোট পাপ (সগিরা গোনাহ) বলা যেতে পারে। আর জুলুম বলা হয়েছে তিনবারের অধিক ধৌত করাকে। নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় 'কম করবে' কথাটির উল্লেখ নেই।

সেখানে বলা হয়েছে, যে তিনবারের অধিক ধৌত করবে সে মন্দ করবে, সীমালংঘন করবে এবং জুলুম করবে। এই বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ। ইবনে খুজাইমা তার সহীহ হাদিস গ্রন্থে বলেছেন, হাদিসে বর্ণিত 'কম করবে' কথাটি বর্ণনাকারী ভ্রমবশতঃ উল্লেখ করেছেন। নতুবা তিনবারের কম ধৌত করা নিন্দনীয় নয়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এই হাদিসে 'মিন ওয়াহদাত' কথাটি উহ্য রয়েছে। কেননা কোনো বর্ণনায় মিন ওয়াহ্দাত (একবারের কম) কথাটি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, যে একবারের কম এবং তিনবারের বেশী ধৌত করলো সে নিঃসন্দেহে ভুল করলো, গোনাহ্ করলো।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তিনবারের অধিক ধৌত করা আমি পছন্দ করি না। তবে কেউ যদি এরকম করে তবে আমি তার কাজকে মাকরূহও মনে করি না। আলেমগণ বলেছেন, ইমাম শাফেয়ীর 'মাকরূহ ও মনে করি না'– কথাটির অর্থ হবে 'হারামও মনে করি না।'

এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, ইমাম শাফেয়ী তিনবারের অধিক ধৌত করাকে মাকরূহ তানজিহি মনে করতেন। ইমাম দারেমী অবশ্য শাফেয়ী মতাবলম্বী একদল আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী তিনবারের অধিক ধৌত করাকে বাতিল বলে গণ্য করতেন। যেমন, নামাজের রাকাত বৃদ্ধি করলে নামাজ বাতিল হয়ে যায়। ইমাম আহমদ বলেছেন, তিনবারের অধিক ধৌত করা নাজায়েয।

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেছেন, আমি এব্যাপারে নিঃসন্দেহ নই যে, তিনবারের অধিক ধৌত করলে গোনাহ হবে না। ফতোয়ায়ে জাহিরিয়ায় আল্লামা শামনী বলেছেন, যে ব্যক্তি ওজুর অঙ্গ একবার ধৌত করাকে যথেষ্ট মনে করবে সে গোনাহ্গার হবে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রসিদ্ধ সুন্নত পরিত্যাগ করার কারণে সে গোনাহ্গার হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, গোনাহ্গার হবে না। কারণ সে ধৌত করার নির্দেশ পালন করেছে। এর সমর্থনে সহি হাদিসের বর্ণনাও রয়েছে। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর মোয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনবার ধৌত করা উত্তম। কিন্তু দু'বার অথবা একবার ধৌত করলেও ওজু হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, ইমাম আবু হানিফাও এই মতের প্রবক্তা। রসুল আকদাস স. কখনও কখনও একবার পানি নিয়ে কুলি করেছেন ও নাকে পানি দিয়েছেন আবার কখনও কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কাজ শেষ করেছেন দু'বার পানি নিয়ে আবার কখনও করেছেন তিনবার পানি নিয়ে। এতে করে বুঝা যায় একবার হাতে পানি নিয়ে সেই পানির অর্ধেক দিয়ে কুলি করেছেন এবং বাকী অর্ধেক নিক্ষেপ করেছেন নাকে। এইভাবে তিনি কখনও একবার কখনও দুইবার এবং কখনও তিনবার যৌথভাবে

কুলি করেছেন ও নাকে পানি দিয়েছেন। এই নিয়মটিকে গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী।

তবে মনে রাখতে হবে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স. বিভিন্ন নিয়মে কুলি করেছেন ও নাকে পানি দিয়েছেন। বিশুদ্ধ মাসআলা এই যে, একবার হাতে পানি নিয়ে কুলি করবে, পরে আরেকবার পানি নিয়ে নাকে পানি দিবে। এভাবে তিনবার করবে। সফরুস সায়াদাত রচয়িতা বলেছেন, কুলি করার পর একবার দু'বার অথবা তিনবার নতুন নতুন পানি নিয়ে নাকে নিক্ষেপ করতে হবে– এরকম কথা হাদিস শারীফে পাওয়া যায় না। হাদিস শরীফসমূহে ওজুর বিভিন্ন নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ হাদিসে রয়েছে প্রথমে দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে হবে। তারপর ধৌত করতে হবে মুখমণ্ডল। এরপর কনুইসহ দুই হাত ধৌত করতে হবে। এ সকল হাদিসে দেখা যায় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কাজটি যৌথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। মেশকাত শরীফে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুলে করীম স. তিনবার পানি নিয়ে তিনবার কুলি করেছেন ও তিনবার নাক ধুয়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, একবার পানি নিয়েই তিনি কুলি করেছেন ও নাক ধুয়ে ফেলেছেন। এই হাদিসের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব। আর ইমাম আবু হানিফার মাজহাবে প্রাধান্য পেয়েছে কিয়াস (বুদ্ধিবাদিতা)।

বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছে এভাবে– নাক ও মুখ সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি অঙ্গ। সুতরাং অঙ্গ দু'টিও ধৌত করতে হবে পৃথকভাবে (যৌথভাবে নয়), যেমন অন্য অঙ্গগুলো আলাদা আলাদা করে ধুয়ে নিতে হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকেন, হানাফী মাজহাবে নসের (কোরআন ও হাদিসের) বিরুদ্ধে কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি সেরকম নয়। কিয়াসকেও সবসময় কোরআন ও হাদিসের অনুকূল হতে হয়। নতুবা তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। ফেকাহ শাস্ত্রের বিধান এরকমই। এখানে হানাফী মাজহাবের কিয়াস যে হাদিসটির সমর্থনপুষ্ট সেই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তিবরানী কিতাবে। বর্ণনাকারী আবু দাউদ। এই প্রসেঙ্গ শামনী বলেছেন, নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী তালহা ইবনে মুশরিফ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে করীম স. ওজু করলেন। ওজুর মধ্যে তিনি তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন এবং প্রতিবারই নতুন পানি ব্যবহার করলেন। শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীরা বলেছেন, এই হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। কেননা এর বর্ণনাকারী তালহা অখ্যাত। তদুপরি তাঁর দাদা রসুলপাক স. এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু জামিয়ুল উসুল কিতাবে

বলা হয়েছে তালহা ইবনে মুশরিফ একজন প্রাজ্ঞ আলেম এবং অন্যতম নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী ছিলেন। তাঁর দাদার নাম ছিলো হজরত কা'ব ইবনে আমর অথবা হজরত আমর ইবনে কা'ব।

শরহে নাকাতিয়া গ্রন্থে শামনী উল্লেখ করেছেন, ইমাম বায়হাকী তাঁর মারেফাত কিতাবে বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে মাহাদী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেছ। মোহাদ্দেছ হিসাবে তিনি ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সমপর্যায়ের। তিনি বলেছেন, তালহার দাদা হজরত আমর ইবনে কা'ব রসুলে করীম স. এর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, মোহাদ্দেছগণের অভিমত এই যে, আমর ইবনে কারীব রসুলপাক স. কে স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু তালহা পরিবারের মত হচ্ছে, স্বচক্ষে দেখেননি। কিন্তু এখানে মোহাদ্দেছগণের অভিমতই গ্রহণীয়। কারণ তাঁরা এই বিষয়ে তালহা পরিবারের চেয়েও অধিক সতর্ক ও অভিজ্ঞ। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত পুস্তকে তালহার দাদা থেকে মসেহ সম্পর্কিত একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তিনি (তালহার দাদা) বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ স. কে এভাবে মসেহ করতে দেখেছি। এ কথার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তালহার দাদা রসুল পাক স. এর সহবত লাভ করেছিলেন। ইবনে হুম্মামও এরকম বলেছেন এবং আল্লামা শামনী একথা ফতোয়ায়ে জাহিরিয়াতে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফার মতে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া মিলিতভাবে করাও জায়েয। ইমাম শাফেয়ীর মতও এরকম। তবে শর্ত হচ্ছে ধৌত করতে হবে নতুন পানি দিয়ে। এরকম বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। জামে তিরমিজিতে বলা হয়েছে, ইমাম শাফেয়ী কাজ দু'টি একসঙ্গে করাকে মাকরূহ মনে করতেন না। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ইমাম আহমদের মতে ফরজ। অন্য তিন ইমামের মতে সুন্নত। রসুলে পাক স. ডান হাত দিয়ে নাকে পানি দিতেন এবং বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করতেন।

মাথা মসেহ্

মাথার কতটুকু অংশ মসেহ্ করতে হবে সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এবং তাঁর অনুসারীরা বলেছেন, যতটুকু মসেহ করলে মসেহ করা হয়েছে বলা যায়, ফরজের পরিমাণ ততটুকুই। অর্থাৎ এক চুল মসেহ করলেও মসেহ করার ফরজ আদায় হয়ে যাবে। এক বর্ণনায় রয়েছে কমপক্ষে তিন চুল পরিমাণ মসেহ করতে হবে। ইমাম মালেক ও তার অনুসারীদের মতে সম্পূর্ণ মাথা মসেহ করা ফরজ। ইমাম আবু হানিফার মতে এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ফরজ এবং সম্পূর্ভ মাথা মসেহ করা সুন্নত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ ব্যাপারে

ইমাম মালেকের অভিমতটিই ন্যয়ানুগ। হেরেম শরীফের মুফতী শায়েখ আলী ইবনে জারুল্লাহ থেকে এরকম বর্ণিত হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সম্পূর্ণ মাথা মসেহ করা সুন্নত। মসেহ করার নিয়ম হচ্ছে দুই হাত মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে, সেখান থেকে পুনরায় পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে, যেখান থেকে মসেহ শুরু করা হয়েছিলো। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একবার মসেহ করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তিন বার করা সুন্নত এবং প্রতিটি মসেহ নতুন পানি দ্বারা হতে হবে। এরকম একটি অভিমত ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কেও পাওয়া যায়। তবে সেখানে বলা হয়েছে একবার পানি নিয়ে তিনবার মসেহ করতে হবে। এরকম উল্লেখিত হয়েছে হেদায়া কিতাবে। হেদায়ার কোনো কোনো ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফার অভিমতটি উত্তম। একবার পানিতে হাত ভিজিয়ে তিনবার মসেহ করাই রীতি সম্মত। বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. বার বার মসেহ করতেন না। মসেহ সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদিসে সংখ্যানির্দেশ নেই। আবার কোথাও কোথাও একবার মসেহ করেছেন, এরকম কথা বলা হয়েছে। হাদিসসম্মত বিশুদ্ধ মাসআলা হচ্ছে মসেহ করতে হবে একবার। তবে কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে দুইবার। দুইবারের অর্থ– একবার মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে পশ্চাৎভাগে এবং পরের বার পশ্চাৎভাগ থেকে সম্মুখভাগে মসেহ করতে হবে। তবে দুইবার মসেহ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো দুর্বল। আর তিনবার মসেহ সম্পর্কিত হাদিসগুলো বিশুদ্ধ হাদিস হিসাবে স্বীকৃত নয়। এ ধরনের হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল পাক স. ওজু করেছেন একবার, দু'বার অথবা তিনবার। ওজু শব্দটি ধৌত করা এবং মসেহ করা উভয়টিকেই বুঝায়। তাই কেউ কেউ বলেনে মসেহও করতে হবে তিনবার। ইমাম শাফেয়ীর মতও এরকম। তিনিও ওজু শব্দটির মধ্যে মসেহ করাকে শামিল করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তিনবার মসেহ করার বিধানটি এহতেমালী (সম্ভাব্য), একিনি (অকাট্য) নয়। ওই হাদিসগুলোই বিশুদ্ধ, যেগুলোতে বারংবার মসেহ না করার কথা বলা হয়েছে। যে হাদিসগুলোতে তিনবারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আসলে মস্তক মসেহ ছাড়া অন্য অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধৌত করার ভিত্তি হচ্ছে মোবালাগা। তাই এসবাগ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ধৌত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর মসেহ এর ভিত্তি হচ্ছে তাখফিফ অর্থাৎ হালকাভাবে আদায় করা। কাজেই তাখফিফকে এমবাতের সঙ্গে তুলনা (কিয়াস) করা যাবে না। এরকম কিয়াসের নাম কিয়াস মায়ালফারেক (অসামঞ্জস্য কিয়াস)। শায়েখ ইবনে হাজার বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সহিহাইনের (বোখারী ও মুসলিম) কোনো সনদেই একাধিকবার মসেহ সম্পর্কে আলোচনা নেই। অধিকাংশ আলেম এই শর্তটিকেই মান্য করেছেন। কেবল ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তিনবার মসেহ করা মোস্তাহাব। আবু দাউদ শরীফে বলা হয়েছে, হজরত ওসমান বর্ণিত সকল হাদিসই বিশুদ্ধ। আর তাঁর সকল বর্ণনাতেই একবার মসেহ করার কথা বলা

হয়েছে। আবু উবায়দা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, ইব্রাহিম তাইমী ব্যতীত সলফে সালেহীনদের অন্য কেউ তিনবার মসেহ করাকে মোস্তাহাব বলেননি।

অবশ্য ইব্রাহিম তাইমীর বক্তব্যও সমালোচিত হয়েছে। কেননা ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনে মুনজির হজরত আনাস এবং হজরত আতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে খুজাইমা প্রমুখ হজরত ওসমানের হাদিসের মাধ্যমে তিনবার মসেহ করাকে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন। জামেয়ুল উসুলে এবং হজরত ওসমানের এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল পাক স. তিনবার মাথা মসেহ করেছেন। শায়েখ ইবনে হুম্মাম বায়হাকী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, একটি অখ্যাত বর্ণনায় দৃষ্ট হয় যে, হজরত ওসমান থেকে একাধিকবার মসেহ করার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু হাদিসটি বিশুদ্ধ হাদিস সমূহের পরিপন্থী বিধায় আলেমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। তিরমিজি শরীফে ওয়ায়েল ইবনে হাজার থেকে বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর রসুল পাক স. তিনবার মাথা মসেহ করলেন এবং তিনবার দুই কান মসেহ করলেন। তিনবার মাথা মসেহ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো যদি বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েও যায়, তবে বুঝতে হবে একবার পানি নিয়েই তিনবার মসেহ করতে হবে। প্রতি মসেহের জন্য নতুন করে পানি নিতে হবে না। এরকম বলা হয়েছে হেদায়া গ্রন্থে।

কান মসেহ্

রসুলে আকরম স. কানের বাহির এবং ভিতর উভয় দিকে মসেহ করতেন। কানের ছিদ্র মসেহ করতেন, আঙ্গুলের অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে। কান মসেহ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ছাড়া অন্য তিন ইমাম বলেছেন, নতুন পানি দিয়ে কান মাসেহ করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নতুন করে আর পানি নিতে হবে না। মস্তক মসেহ করার পর আঙ্গুলে যে আদ্রতাটুকু লেগে থাকে তাই দিয়েই কান মসেহ করে নিতে হবে। অধিকাংশ হাদিসে এসেছে মাথা ও কান মসেহ করার জন্য নতুন পানি নিতে হবে না। হাদিসমূহের বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে একথাই বুঝা যায় যে, মাথা মসেহ করার পর অবশিষ্ট আর্দ্রতা দ্বারাই কান মসেহ করতে হবে। কান মসেহের জন্য নতুন পানি নিতে হবে একথাটির তাৎপর্য এই যে, মাথা মসেহের পর হাত যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তবে নতুন পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটাই হচ্ছে পরস্পরবিরোধী বর্ণনাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের পদ্ধতি। মোট্ কথা, কান মসেহের জন্য নতুন পানি না নেয়ার বর্ণনা সম্বলিত হাদিসগুলোই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন সনদে অনেক সাহাবী থেকে এরকম বর্ণিত হয়েছে। শায়েখ ইবনে হেমাম এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

পা ধৌত করা

পা ধৌত করার ব্যাপারে অধিকাংশ বর্ণনায় সংখ্যার কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। কোনো ইমামই তিনবার ধৌত করতে হবে এরকম বলেননি। শারহে ইবনে হেমাম গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। নাসাই শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে রসুল পাক স. তাঁর পবিত্র পদযুগল দুইবার ধৌত করেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে তিনবার ধৌত করেছেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে প্রথমে ডান পা ধৌত করেছেন তিনবার এবং পরে বাম পা তিনবার। প্রকাশ্যতঃ মনে হয় এরকম আমল করা হয়েছিলো বিশেষ কোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

দাড়ি খেলাল করা

এ সম্পর্কে হজরত ওসমান এবং হজরত আম্মার থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মোহাদ্দেছগণ অবশ্য হাদিসগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। তবে খেলালের বিষয়টিই প্রধান্য পেয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দাড়ি খেলাল করা সুন্নত। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন উত্তম। অন্য ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব। তাঁরা এরকম বলেছেন হজরত আনাস বর্ণিত একটি হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বলা হয়েছে, ওজু করার সময় তিনি স. হাতের মধ্যে পানি নিয়ে আঙ্গুলের ফাকে পানি প্রবেশ করিয়ে সেই আঙ্গুল দিয়ে পবিত্র দাড়ি খেলাল করতেন এবং বলতেন আমার প্রতিপালক আমাকে এরকম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দাড়ি খেলাল করার নিয়ম হচ্ছে, দাড়ির নিচে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে উপরের দিকে অংগুলি চালনা করতে হবে। এরকম বলেছেন শায়েখ শামনী। এখানে দেখা যায় খেলাল করার জন্য নতুন পানি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, মুখমণ্ডল ধৌত করার পরক্ষণেই ভেজা হাত দিয়েই দাড়ি খেলাল করতে হবে। নতুন পাবি আর নিতে হবে না। তবে ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, ব্যাপারটি ইচ্ছাধীন অর্থাৎ ইচ্ছা করলে নতুন পানি নিতে পারবে নতুবা না নিলেও চলবে। এ ব্যাপারটিও ইচ্ছাধীন যে, মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় দাড়ি খেলাল করতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে মাথা মসেহ করার সময়ও করতে পারবে। আবু দাউদ শরীফে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল করীম স. ওজুর সময় দুই গাল ভালোভাবে মর্দন করতেন। তারপর হাতের আঙ্গুলসমূহ পবিত্র শ্মশ্রুর নিচের দিকে প্রবেশ করাতেন।

হাত ও পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা

কখনও কখনও তিনি স. হাত ও পায়ের আঙ্গুল খেলাল করতেন। এরকম লিপিবদ্ধ রয়েছে সফরুস সায়াদাত গ্রন্থে। ইমামে আজম আবু হানিফা ও ইমাম

শাফেয়ী বলেছেন, হাত-পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা সুন্নত। ইমাত আহমদ বলেছেন, কেবল পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা সুন্নত। দু'টি প্রসিদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে হাতের আঙ্গুল খেলাল করা সুন্নত প্রমাণিত হয়েছে। অপর একটি বর্ণনার মাধ্যমে সন্নিবেশিত যে, খেলাল করার প্রয়োজন পড়ে না। ইমাম মালেক পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। আবার এ কথাও বলেছেন যে, কেউ যদি তা পরিত্যাগ করে তবে তাতে কোনো দোষ হবে না। পবিত্রতা নিশ্চিত করার জন্য খেলালের বিধানটি এসেছে। বলা হয়েছে, কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে খেলাল শুরু করতে হবে। বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দিয়ে ডান পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী থেকে খেলাল শুরু করতে হবে এবং শেষ করতে হবে বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলিতে গিয়ে। কারণ ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু করাই সুন্নত। আর হাতের আঙ্গুল খেলাল করার নিয়ম হচ্ছে, একই সঙ্গে এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গলগুলোর ফাঁকে প্রবেশ করাতে হবে। শায়েখ ইবনুল হেমাম বলেছেন, হাত ও পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার বর্ণিত বিধান কিভাবে সাব্যস্ত হয়েছে তা জানা যায় না।

অঙ্গুরীয় সঞ্চালন

যদি হাতে আংটি থাকে তবে ওজুর সময় তা নড়াচড়া করাতে হবে– এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে একটি দুর্বল বর্ণনার মাধ্যমে। হানাফী মাজহাব এই কাজটিকে মোস্তাহাব বলে গণ্য করেছে। শায়েখ ইবনুল হেমাম তাঁর জাদুল ফিকাহ কিতাবে বলেছেন, ঢিলা অবস্থায় থাকলে আংটি নড়াচড়া করানো সুন্নত। আর শক্তভাবে আঙ্গুলে চেপে থাকলে নড়াচড়া করানো ওয়াজিব।

ঘাড় মসেহ্

এ সম্পর্কে রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাথা মসেহ করার পরক্ষণে ঘাড় মসেহ করবে কিয়ামতের দিন সে ঘাড়ের শিকল বেষ্টন করার বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। হাদিসটি মসনাদুল ফেরদাউস কিতাবে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। শায়েখ শাম্মীও এরকম একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটির সনদ দুর্বল। হানাফী মাজহাবের অভিমত হচ্ছে, ঘাড় মসেহ করা মোস্তাহাব। শাফেয়ী মাজহাবের কোনো কোনো অনুসারীও এরকম বলেছেন। শায়েখ ইবনুল হেমাম এই মোস্তাহাবকে প্রমাণ করেছেন তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত ওয়ায়েল ইবনে হাজারের হাদিসের মাধ্যমে– যেখানে বলা হয়েছে, রসুলে পাক স. মাথা মসেহ করেছেন তিনবার, দুই কান মসেহ করেছেন তিনবার এবং ঘাড় মসেহ করেছেন তিনবার। তিনি এ সম্পর্কে আবু দাউদ থেকে অন্য একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন– সেই হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. মাথার

সঙ্গে ঘাড় মসেহ করেছেন। ইবনুল হেমাম একথাও বলেছেন যে, কারো কারো মতে ঘাড় মসেহ করা বেদাত। হেদায়া কিতাবে ঘাড় মসেহকে সুন্নত কিংবা মোস্তাহাব বলে গণ্য করা হয়নি। তবে গলা মসেহ করা যে বেদাত এব্যাপারে সকলে একমত।

একথাটি সুপ্রমাণিত যে, মুকিম অথবা মুসাফির উভয় অবস্থায় ওজুর সময় রসুলে মকবুল স. এর হাতে ওজুর পানি ঢেলে দেওয়া হতো। সুতরাং এরকম করা বৈধ। কারো নিকট ওজুর পানি চাওয়া বৈধ। তবে একথা বলা যায় না যে, সবসময় এরকম করা যাবে। এরকমও দেখা যায়, কোনো কোনো লোক অন্যের ঢেলে দেয়া পাবি দ্বারা ওজু করলেও পা ধৌত করার বেলায় পানির পাত্র নিজ হাতে নিয়ে নেয়। এরকম আমলের কোনো ভিত্তি নেই। অন্যের হাতে পানি ঢেলে নিলে পানির অপচয় হবে ভেবে যদি এরকম করে তবে সেকথা ভিন্ন।

রসুল আকরম স. ওজুর পর পানি মোছার জন্য আলাদা কোনো বস্ত্র ব্যবহার করতেন না। বরং ধৌত করা অংগসমূহ স্বাভাবিকভাবে শুকিয়ে যেতে দিতেন। তবে পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে নিতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। জননী আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, পানি মোছার জন্য তিনি স. আলাদা রুমাল ব্যবহার করতেন। মোহাদ্দেছগণের নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্ণনাটি দুর্বল। কেউ কেউ বলেছেন এই হাদিসটি যেমন দুর্বল তেমনি পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ দিয়ে চেহারা মোছার হাদিসটিও দুর্বল। তিরমিজি দু'টি হাদিসই উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, দু'টোই দুর্বল। আরো বলেছেন, উল্লেখিত বর্ণনাগুলোর কোনোটিই বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছেনি। সাহাবা, তাবেয়ীন ও পরবর্তী আলেমের একদল বলেছেন, এব্যাপারে অবকাশ (রুখসত) দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ওজুর পানি মোছার জন্য রুমাল ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা ওজুর পানি নূর বৃদ্ধি করে এবং মিযানের পাল্লা ভারী করে দেয়। এরকম বলেছেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং ইমাম জুহুরী। হানাফী ফেকাহর বিতাবে বলা হয়েছে, অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকলে ওজুর পানি মোছার জন্য রুমাল ব্যবহার করা মাকরূহ নয়। মেশকাত শরীফের কোনো কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে, ওজুর পানি না মোছাই মোস্তাহাব তবে কেউ যদি এরূপ করেও তবে তা মাকরূহও হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, হবে।

ওজুর দোয়া

ওজুর দোয়া সম্বলিত হাদিসগুলোর কোনো একটিও বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছেনি এবং মোহাদ্দেছগণ সেগুলোকে মওজু বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে একথা

বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, ওজুর প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করতে হবে। সলফে সালেহীন থেকে এরকম পড়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে– বিসমিল্লাহিল আযিম ওয়াল হামদু লিল্লাহি আলা দ্বিনিল ইসলাম। শায়েখ ইবনুল হেমাম ওজুর প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় শাহাদাতাইন (আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু) পড়াকে মোস্তাহাব বলেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা মোস্তাহাব। ইমাম আহমদের মতে ওজুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব এবং এটা ওজু বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত। কেননা আহমদ ও আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নবী পাক স. বলেছেন, যার ওজু নেই তার নামাজ হবে না এবং বিসমিল্লাহ পাঠ না করলে ওজু হবে না। ওজু শেষে এই দোয়া পাঠ করতে হবে– আশ হাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশ হাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু। সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ওজুর পর যে এই দোয়া পাঠ করবে তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা বেহেশতে প্রবেশ করো। কোনো কোনো হাদিসে এসছে, উপরোক্ত দোয়ার সঙ্গে এই দোয়াটিও পাঠ করতে হবে– আল্লাহুম্মা আজআলনি মিনতাওয়াবিনি ওয়াজআলনি মিনাল মুতাতাহ্হিরীন। হাদিস শরীফে এসেছে, এই দোয়া পাঠ করলে তা একটি কাগজের মধ্যে লেখা হবে এবং তার উপর সিলমোহর করে দেয়া হবে। কিয়ামত পর্যন্ত সেটি আর খোলা হবে না। ওজুর পর সুরা ইন্না আনযালনা পড়ার যে রীতি রয়েছে, তা সুনানুল হুদা কিতাবে দুর্বল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বর্ণনাটি সুপ্রমাণিত নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

শায়েখ ইবনুল হেমাম শরহে হেদায়ায় ওজু এসতেঞ্জার মোস্তাহাবগুলোর তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে– পানির অপচয় না করা, প্রয়োজন অপেক্ষা কম পানি ব্যবহার না করা, ওজুর সময় মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা না বলা, ওজু করার সময় অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করা, এস্তেঞ্জার স্থান কুলুখ বা কাপড় দ্বারা মোছাকে যথেষ্ট না মনে করে কুলুখের পর পানি ব্যবহার করা, ওজুর পানিতে ফুঁ না দেওয়া, এস্তেঞ্জা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সতর ঢেকে ফেলা, এস্তেঞ্জার সমায় আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র রসুলের নামঙ্কিত অঙ্গুরীয় খুলে ফেলা। এস্তেঞ্জার পানি ও ওজুর পানির পাত্র মৃত্তিকা নির্মিত হওয়া, পাত্র বাম পাশে রাখা, তবে পাত্রে ঢাকনি লাগানো থাকলে ডান পাশে রাখা মোস্তাহাব। পানি ব্যবহারের সময় পাত্রের মুখে হাত না রেখে হাতলে হাত রাখা। নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই ওজু করে নেয়া। প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় শাহাদাতাইন পাঠ করা। ওজুর সময় কেবলামুখী হয়ে বসা। ওজুর সময় অন্যমনস্ক না হওয়া। দুই চোখের কোটর ধৌত করার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা। ঘাড় মসেহ করা। আংটি সংলগ্ন স্থান ধৌত করা। প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় দোয়া পাঠ করা। মুখমণ্ডলে সজোরে পানি নিক্ষেপ না করা। ধৌত করা স্থানের উপর পুনরায় হাত বুলানো। ধীর স্থিরভাবে ধৌত

করা। ধৌত করার সময় অঙ্গসমূহ হাত দ্বারা মর্দন করা। বিশেষভাবে শীতকালে এরকম করা। মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করার সময় সীমাকে অতিক্রম করা। ধৌত করার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া। কিছুক্ষণ গড় গড়া করা। ওজুর সময় এই দোয়া পাঠ করা– সুবহানাক্বাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদুআন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু আল্লাহুম্মা আযআলনি মিনাত তাওয়াবিনা ওয়াজআলনি মিনাত তহিরীন। ওজু শেষে ওজুর অতিরিক্ত পানি দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে পান করা (কেউ কেউ বলেন বসে পান করাও জায়েয)। ওজুর পর দুই রাকাত তাহয়িয়াতুল ওজু নামাজ পড়া। পরবর্তী নামাজের জন্য ওজুর পানি প্রস্তুত করে রাখা। ওজুতে ব্যবহৃত পানি থেকে পরিধেয় বস্ত্রকে রক্ষা করা। নাকের ভিতর পানি দেওয়ার সময় বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা (ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা মাকরূহ)।

মাকরূহ বিষয়গুলো হচ্ছে– পানিতে থুথু দেওয়া। অঙ্গসমূহ তিনবারের বেশী ধৌত করা। রৌদ্রতপ্ত পানি দ্বারা ওজু করা। কোনো অঙ্গ ধৌত হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হলে ওজু শেষ হওয়ার আগেই সন্দেহ দূর করে নেয়া। তবে ওজু শুরু করার সময় থেকে যদি সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া যাবে না। ওজু শেষ হওয়ার পরের সন্দেহকেও প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। নিছক সন্দেহের কারণে পুনরায় ওজু করার প্রয়োজনও নেই।

মোজার উপর মসেহ

তিনি স. মুকিম ও মুসাফির উভয় অবস্থাতেই মোজার উপর মসেহ করতেন। সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। হাফেজে হাদিসের একটি দল বলেছেন, সংখ্যাধিক্যের কারণে মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত হাদিসগুলো সর্বজনবিদিত। সুতরাং বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধ। হাদিসগুলোর বর্ণনাকারীদের নাম একত্র করে দেখা গিয়েছে বিষয়টি মোতাওয়াতির স্তরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং দেখা গিয়েছে বর্ণনাকারীদের তালিকায় আশারা মোবাশশারাগণও রয়েছেন।

মোজার উপর মসেহ বিষয়টিতে সলফে সালেহীনগণ একমত। তবে এক বর্ণনায় দেখা যায়, ইমাম মালেক মুকিমের (গৃহবাসীর) জন্য মোজা মসেহকে জায়েয মনে করতেন না। এ ব্যাপারে মালেকী মাজহাবের অনুসারীদের মধ্যে দু'টি অভিমত প্রচলিত। একটি হচ্ছে মোজা মসেহ সাধারণভাবে সকলের জন্য বৈধ, অপরটি হচ্ছে মোজা মসেহ কেবল মুসাফিরের জন্য (মুকিমের জন্য নয়)। শায়েখ ইবনে হাজারও সকলের জন্য মোজা মসেহ জায়েয হওয়ার অভিমতটি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, গৃহবাসী অবস্থায় মোজার উপর মসেহ করার ব্যাপারে ইমাম মালেক কর্তৃক অবলম্বিত মৌনতা ছিলো

তার ব্যক্তিগত একটি ব্যাপার। বিষয়টির বৈধতার ব্যাপারে তিনি মুখ খোলেননি। হজরত আবু আইয়ুব আনসারী সাহাবীও এরকম মনে করতেন। মোট কথা এই যে, ইমাম মালেক গৃহবাসের সময় কখনই মোজার উপর মসেহ করতেন না। এ ব্যাপারে কখনও কষ্ট হলেও তিনি আজিমতকে (দৃঢ়তাকে) আঁকড়ে ধরতেন। কিন্তু মুকিম অবস্থায় মোজা মসেহ জায়েয নয় এরকম কথা তিনি কখনই বলেননি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আলেমগণ বলেছেন, ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফা বলেন, সহিহ্ হাদিসসমূহের মাধ্যমে দিবালোকের মত স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি মোজা মসেহের ব্যাপারে কোনো অভিমত ব্যক্ত করিনি। ইমাম আহমদ বলেছেন, অন্ততঃপক্ষে সাইত্রিশজন সাহাবী মোজা মসেহ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। এক বিবরণে পাওয়া যায় মারফু অথবা মাওকুফ হিসেবে চল্লিশ জন সাহাবী মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। কোরআন মজীদের 'আরজুলাকুম' শব্দটির লাম অক্ষরে যের দিয়ে পড়লে অর্থ হবে পা মসেহ করা। আর যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে পা ধৌত করা। এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য দুর্বল। কারণ কোরআন মজীদে পরক্ষণেই বলা হয়েছে কাবাইন বা দুই টাখনুর কথা। আর মোজার মধ্যে টাখনু বলে কিছু নেই এবং মোজা মসেহ এর মধ্যেও টাখনুর কথা আসে না। সুতরাং এরকম ব্যাখ্যা যুক্তিসম্মত নয়।

ইমাম হাসান বসরী বলেছেন, রসুলে পাক স. থেকে সত্তরজন সাহাবী আমার কাছে মোজা মসেহ করার বিষয়ে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হেদায়া গ্রন্থে রয়েছে মোজার উপর মসেহ সংক্রান্ত হাদিস বহুজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ। এর উপর যার বিশ্বাস নেই সে বেদাতী। ইমাম কুরখী আরো শক্তভাবে বলেছেন, মোজার উপর মসেহ করার বৈধতা সম্পর্কে যার বিশ্বাস নেই তার কাফের হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইমামে আজমও এরকম বলেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এই বিষয়টিকে সর্বন্তকরণে বিশ্বাস করেন। আর এই বিষয়টি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি নিদর্শনও বটে।

মোজার উপর মসেহ করার সময়সীমা

বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুকিম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় তিনি স. মোজার উপর মসেহ করতেন। এই মসেহ কার্য্যকর থাকতো মুকিম অবস্থায় একদিন একরাত এবং মুসাফির অবস্থায় তিনদিন তিনরাত। মুসলিম শরীফে হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত্রি এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত্রি নির্ধারণ করেছেন।

মসেহ করতে হয় পায়ের উপরিভাগে মোজার উপর, তলদেশে নয়। বিশুদ্ধ হাদিসে এরকমই বার্ণিত হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ কিতাবে হজরত আলী থেকে

বর্ণিত হয়েছে, ধর্ম যদি বুদ্ধিনির্ভর হতো তবে পায়ের উপরিভাগে মসেহ করার পরিবর্তে পায়ের তলদেশে মসেহ করার বিধান সাব্যস্ত হতো। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি তিনি স. উপরিভাগে মসেহ করতেন। সফরুস সায়াদাত রচয়িতা বলেছেন, তলদেশে মসেহ করার কথা এসেছে একটি দুর্বল হাদিসে। আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা হজরত মুগীরা ইবনে শোবা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি তবুক যুদ্ধের সময় রসুল পাক স. কে ওজু করাচ্ছিলাম, তিনি তখন মোজার উপরিভাগ এবং তলদেশ মসেহ করেছিলেন। হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ অধিকাংশ সনদে হজরত মুগীরা থেকে সাধারণভাবে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ উপরিভাগ বা নিুভাগ এরকম কথা সেগুলোতে নেই। সেগুলোতে কেবল বলা হয়েছে তিনি স. মোজার উপর মসেহ করেছিলেন। তিরমিজি শরীফের কোনো কোনো সনদে আবু দাউদ শরীফে এবং মসনদে আহমদ কিতাবে বলা হয়েছে উপরিভাগে মসেহ করার কথা। ইমাম আবু হানিফা উপরিভাগে মসেহ করার কথা বলেছেন। ইমাম আহমদের অভিমতও অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের মত হচ্ছে, উপরিভাগে মসেহ করা ফরজ এবং তলদেশে মসেহ করা সুন্নত।

এই বিষয়টির সমাধান হওয়া প্রয়োজন যে, ওজুর সময় মোজা খুলে পা ধৌত করা উত্তম না মোজার উপরে মসেহ করা উত্তম। একদল বলেছেন পা ধৌত করাই উত্তম। কেননা এটা আজিমত (দৃঢ়তা)। আর মসেহ করা হচ্ছে রুখসত (সহজ সাধ্যতা)। সহজসাধ্য আমলের চেয়ে সুদৃঢ় আমলই উত্তম। কারণ পা ধোয়ার মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত একটি সাওয়াব। তাই একথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, পা ধৌত করাই উত্তম। হেদায়া প্রণেতাও এরকম বলেছেন। আরেক দল বলেছেন, খারেজী, রাফেজী ইত্যাদি বেদাতী সম্প্রদায় যেহেতু মোজা মসেহকে অস্বীকার করে তাই মসেহ করাই উত্তম। কারণ এত করে বেদাতীদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। প্রকৃত কথা এই যে, মসেহ করা ও ধৌত করা বিধান দু'টি শরিয়তেরই বিধান। উভয় বিধানই সমমর্যাদা সম্পন্ন। কোনোটির চেয়ে কোনোটি উত্তম নয়। সফরুস সায়াদাত প্রণেতা বলেছেন, রসুল পাক স. দু'টো বিধানকে মান্য করতেন। একটির চেয়ে অন্যটিকে অধিক গুরুত্ববহ মনে করতেন না। ওজুর সময় পদযুগল উন্মুক্ত থাকলে ধুয়ে নিতেন, মোজা পরে নিয়ে তার উপর মসেহ করতেন না। আর পায়ে মোজা পরিহিত অবস্থায় ওজু শুরু করলে মোজা খুলে ফেলে পা ধৌত করতেন না, মোজার উপর মসেহ করতেন। তিনি বলেছেন এটাই উত্তম পন্থা। কেননা এরকম আমলই রসুল পাক স. এর নন্দিত আচরণের অনুকূল।

তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের বিষয়টি কোরআন, সুন্নাহ এবং ঐকমত্যের (এজমার) মাধ্যমে সুসাব্যস্ত। তায়াম্মুম শেষ উম্মতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রসুল পাক স. ইচ্ছা করলে যে কোনো স্থানের মাটির উপর নামাজ আদায় করতেন, সেখানে পাথর, মাটি কিংবা বালি যাই থাকুক না কেনো। আর তিনি স. তায়াম্মুম করতেন যে কোনো স্থানের মাটি দিয়ে। পাথর, মাটি বা বালি যাই হোক না কেনো। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কেবল মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে। বিশুদ্ধ মাটি ছাড়া তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, মাটি ও বালি ছাড়া তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। ইহাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, মাটি, পাথর, বালি এবং মৃত্তিকা জাতীয় সকল কিছু দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে। মৃত্তিকা জাতীয় অর্থ ওই মাটি যা আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়নি এবং ওই পাথর যা ধূলিধূসরিত। এরকম পদার্থ দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে। এটাই ইমাম আবু হানিফার অভিমত। হজরত আবু উসামার হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে আরদ্ব শব্দটি। হজরত হোযায়ফার হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে তুরাব। দু'টি শব্দই সমঅর্থসম্পন্ন।

আমরা বলি, ওজু ও তায়াম্মুমের গুরুত্ব সমান। উভয়টির বিধান একই রকম। যেমন, ওজু ভঙ্গ না হলে এক ওজু দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা যায়, তেমনি তায়াম্মুম অটুট থাকলে এক তায়াম্মুম দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ পাঠ করা যায়। এটাই কিতাব ও সুন্নাহ সম্মত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তায়াম্মুম হচ্ছে নিরুপায় অবস্থার পবিত্রতা। ওজু করতে অসমর্থ হলেই কেবল তায়াম্মুমের সুযোগ রয়েছে। সফরুস সায়াদাত গ্রন্থের লেখক বলেছেন, আমি এরকম কোনো হাদিস পাইনি যেখানে বলা হয়েছে রসুল পাক স. ফরজ নির্দেশ (নামাজ) আদায় করার জন্য প্রতিবার নতুন নতুন করে তায়াম্মুম করেছেন।

তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতটি এই– এক যুদ্ধের সময় রসুলে আকরম স. এর সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা। হঠাৎ তিনি তাঁর গলার হার খুঁজে পেলেন না। যাত্রা স্থগিত করলেন রসুলে আকরম স.। সাহাবীগণ হার খুঁজতে শুরু করলেন। নামাজের সময় এসে গেলো। দেখা গেলো ওজুর পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। হজরত আবু বকর সিদ্দিক তখন তাঁর প্রিয় কন্যা হজরত আয়েশার প্রতি রুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি রসুলুল্লাহকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছো। এদিকে সাহাবীগণও হার খুঁজতে ব্যস্ত। এই করতে গিয়ে পানির ব্যবস্থা করা হলো না। আর এদিকে নামাজের সময়ও হয়ে গেলো। ওই সময়েই অবতীর্ণ হলো তায়াম্মুমের আয়াত। হজরত উসায়েদ ইবনে হোযায়েফ তখন বললেন, হে আবু বকর, আপনার (কন্যার) বদৌলতেই মুসলমানের উপর অবতীর্ণ হলো এই বরকত। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার উপরেও

বরকত বর্ষণ করুন। তারপর তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার গলার হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনার মতো ঘটনা আমি আর দেখিনি। এটা প্রকাশ্য অপছন্দনীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জীবনে এনে দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। কিছুক্ষণ পর উপবিষ্ট একটি উটের নিচ থেকে হারানো হারটি পাওয়া গেলো। এভাবেই কার্যকর হলো আল্লাহ্পাকের হিকমত। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় হাবিবের নিকটেও হার কোথায় আছে তা গোপন রেখে পবিত্রতা অর্জনের একটি সহজ বিধান নাজিল করলেন।

তায়াম্মুমের নিয়ম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তায়াম্মুম করতে গেলে দুইবার মাটিতে হস্ত স্থাপন করতে হবে। প্রথমবার মাটি স্পর্শ করে মুখমণ্ডল মসেহ করতে হবে। পরের বার মৃত্তিকায় স্পর্শিত হাত দিয়ে কনুই পর্যন্ত দুই হাত মসেহ করতে হবে। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী। ইমাম আহমদের কোনো কোনো অনুসারীও এই অভিমতের অনুসারী। এই অভিমতের অন্যান্য প্রবক্তা হচ্ছেন, হজরত আলী, হজরত ইবনে ওমর, হাসান বসরী, শা'বী, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং সুফীয়ান সওরী। কেউ কেউ বলেছেন, একবার মাটিতে হাত রেখে সেই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও দুই হাত মসেহ করতে হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, প্রথমে মসেহ করতে হবে দুই হাত। তারপর মুখমণ্ডল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে মসেহ করতে হবে প্রথমে মুখমণ্ডল তারপর দুই হাত। প্রথমোক্ত নিয়মটি পছন্দ করেছেন ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ।

শেষোক্ত মতটিকে সমর্থন করেছেন মাকহুল, আওয়ামী, ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে খুজাইমা। শেষোক্ত মতটিকে প্রধান্য দিয়েছেন ইমাম মালেক এবং আরো কতিপয় মোহাদ্দেছ। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী বোখারী শরীফে উল্লেখিত শেষোক্ত মতের হাদিসগুলোকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমোক্ত মতের হাদিসগুলোকে তিনি দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, যে সকল হাদিসে তায়াম্মুমের জন্য দুইবার মাটিতে হাত রাখার কথা এসেছে, সেই হাদিসগুলোই অধিকতর বিশুদ্ধ। একবার মাটিতে হাত রাখতে হবে মুখ মোছার জন্য, আরেকবার মাটিতে হাত রাখতে হবে কনুই পর্যন্ত দুই হাত মোছার জন্য। সফরুস সায়াদাত কিতাবে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রথমোক্ত মতটির মধ্যেই রয়েছে সাবধানতা ও সতর্কতা।

গোসল

গোসল শব্দটিকে যদি গাসলুন উচ্চারণ করা হয় তবে তার অর্থ হবে ধৌত করা। আর যদি বলা হয় 'গুসলুন' তবে তার অর্থ হবে গোসল করা। গিসলুন উচ্চারণ করলে ওই বস্তুকে বুঝানো হবে, যার মাধ্যমে মস্তকে ধৌত করা হয়। যেমন সাবান বা সাবান জাতীয় কোনো কিছু। ইগসাল অর্থ গোসল করিয়ে দেয়া। গাসুল অর্থ গোসলকারীর গোসলের পানি। আর মাগসিল অর্থ গোসলের স্থান। মরদেহ গোসল দেয়ার স্থানকেই সাধারণত মাগসিল বলা হয়। গোসালাহ বলা হয় ওই পানিকে যার দ্বারা হাত মুখ ধৌত করা হয়েছে। গোসল বা গোসল সম্পর্কিত শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ বলা হলো এতক্ষণ ধরে।

শরিয়তের পরিভাষায় গোসল হচ্ছে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে পানি প্রবাহের মাধ্যমে ধৌত করে নেয়া। পানি প্রবাহের সময় শরীর মর্দন করা ওয়াজিব কিনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মত হচ্ছে হাত দ্বারা শরীর মর্দন করা ওয়াজিব নয়।

আমাদের মাজহাবেও একথা বলা হয়েছে। ইমাম মাযনী বলেছেন, মালেকী ও শাফেয়ী মাজহাবের অভিমত হচ্ছে শরীর মর্দন করা ওয়াজিব।

পর পর দুইবার স্ত্রী সহবাস করলে সহবাসের মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করা ওয়াজিব নয়। এটা ঐকমত্য। তবে এমতাবস্থায় ওজু করা মোস্তাহাব। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, মোস্তাহাব নয়। আসহাবে জাওয়াহের (কোরআন ও হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারীগণ) বলেছেন, আমলটি মোস্তাহাব নয়, বরং ওয়াজিব। কারণ হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, যে এক সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চায় সে যেনো প্রথম সহবাসের পর ওজু করে নেয়। এই হাদিসের আলোকেই তাঁরা ওই সময়ে ওজু করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ ওই ওজুকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তখন সাধারণভাবে হাত মুখ ধুয়ে নেয়া, লজ্জা স্থান ধুয়ে নেয়া, এসব করতে হবে। রসুল আকরম স. কখনও কখনও একাধিক স্ত্রীগমনের পর একবার গোসল করেছেন। আবার কখনও এক স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের পর অন্য স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন। এই আমলটিই অবশ্য অধিকতর পরিচ্ছন্ন।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. সহবাসের পর ঘুমিয়ে পড়তে চাইলে ঘুমের আগে নামাজের ওজুর মতো ওজু করে নিতেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারী। গ্রন্থকার বলেছেন, ওই ওজু ছিলো নিদ্রাকালীন পবিত্রতা। সহবাসের পর ঘুমিয়ে পড়তে চাইলে ওই নিয়মেই ওজু করে নেয়া যেতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, তখন ওজুর বদলে তায়াম্মুম করে নিলেও চলে। এ সম্পর্কে তাঁরা হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসও উপস্থাপন করে থাকেন। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

রসুলে পাক স. গোসল করার সময় প্রথমে ওজু করে নিতেন। সেই ওজুতে মাথা মসেহ করা, না করা সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা এসেছে। তবে মাথা মসেহ করাই উত্তম। অর্থাৎ অন্য সময় যেমন ওজু করা হয়, তেমনি ওজু করে নিতে হবে।

ইমাম মালেক বলেছেন, গোসলপূর্ব ওজুতে মাথা মসেহ করতে হবে না। পা ধৌত করা সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে্ কেউ কেউ বলেছেন, গোসলপূর্ব ওজুতে পা ধৌত করতে হবে। কেউ বলেছেন, করতে হবে না। অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, পা ধৌত করতে হবে গোসলের শেষে, যদি গোসলের স্থান পরিচ্ছন্ন না থাকে। তিনি স. ওজু করার পর হাতের আঙ্গুলসমূহ পানিতে ডুবিয়ে দিতেন। আর ওই ভিজা আঙ্গুল দিয়ে চুলের গোড়ায় খেলাল করতেন। তারপর তিন চৌল পানি হাতের উপরে ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করে দিতেন। চুলের গোড়া খেলাল করার অর্থ মাথার চুলের গোড়া খেলাল করা। হাদিস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী সেকথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, চুলের গোড়া খেলাল করা অর্থ দাড়ির চুলের গোড়া খেলাল করা। হাদিস শরীফে কেবল চুলের গোড়া খেলাল করার কথা বলা হয়েছে। মাথার চুল বা দাড়ির চুল এরকম কোনো কথা হাদিসে বলা হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন, দাড়ির চুলের গোড়া খেলাল করা ওয়াজিব নয়। তবে দাড়ির চুলের গোড়ায় যদি এমন কিছু থাকে, যার কারণে সেখানে পানি পৌঁছানো যায় না, তবে খেলাল করে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

গোসল করার পর ওজু করা একটি অনর্থক আমল। এরকম আমল সুন্নতের খেলাপ। গ্রন্থকারের অভ্যাস এই যে, গোসলের সময় লজ্জাস্থানে হাত পড়লে তিনি ইমাম শাফেয়ীর মতানুসারে গোসলের পর ওজু করে নেন। এটা একধরনের সাবধানতা। লজ্জা স্থানে হাত না পড়লে পুনরায় ওজু করার কোনো কারণই নেই।

গোসলের পর গামছা, তোয়ালে বা অন্য কোনো বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শরীর মুছে নেয়া সম্পর্কেও মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। জননী মায়মুনা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এর গোসলের পর তিনি পবিত্র শরীর মোছার জন্য রুমাল এগিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি স. সেই রুমাল গ্রহণ করতেন না। এই বর্ণনার মাধ্যমে রুমাল ব্যবহার করা মাকরূহ, একথা প্রমাণিত হয় না। কেননা হতে পারে রসুল পাক স. অন্য কোনো কারণে রুমাল গ্রহণ করেননি। হতে পারে তা হয়তো ছিলো রেশমের বস্ত্র অথবা অপরিচ্ছন্ন কোনো বস্ত্রখণ্ড। এমনও হতে পারে যে, তিনি কেবল বিনয় প্রকাশার্থে বাড়িয়ে দেয়া বস্ত্র গ্রহণ করেননি।

কেউ কেউ বলেছেন, গোসলের পর কোনো বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শরীর মুছে ফেলা গ্রীষ্মকালের জন্য মাকরূহ। কিন্তু শীতকালের জন্য মোবাহ। হাত দ্বারা শরীরের পানি মুছে ফেলা বা ঝেড়ে ফেলা কোনো অবস্থাতেই মাকরূহ নয়।

২। নামাজ

ইবাদতের মধ্যে নামাজ সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং সবচেয়ে পরিপূর্ণ ইবাদত। নবী পাক স. এরশাদ করেছেন, নামাজে রয়েছে আমার নয়নের প্রশান্তি।

নামাজের সময় তাঁর স. হৃদয়ের গভীরে বয়ে যেতো অপার্থিব আনন্দস্রোত। সেই স্রোতের দ্যুতি বিকিরিত হতো তাঁর পবিত্র আঁখিযুগলে। চোখের তারায় তিনি তখন এমন শান্তি অনুভব করতেন, যা অন্য সময়ে অনুভব করতেন না। হাদিসে উল্লেখিত চোখের শীতলতা বা শান্তি (কুররাতুল আইন) হচ্ছে অদৃশ্য থেকে আগত আলো ও আনন্দ। কুররতুন শব্দটি এসেছে ক্বররুন থেকে– যার অর্থ ক্বরর অর্থাৎ সুস্থিরতা বা শান্তি। প্রিয়জনের দর্শন লাভ ঘটলে চোখে যে শান্তি অনুভূত হয়, তা অন্য কোনো কিছুতে হয় না। আর এই দর্শনই আনে সুস্থিরতা। প্রিয়জন ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দৃষ্টি পুরোপুরি শান্ত বা সুস্থির হতে পারে না। প্রকৃত প্রেমিকেরা অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করে বিক্ষিপ্তভাবে। প্রিয়তমের দর্শন ব্যতিরেকে অন্য সকলের দর্শন তার নিকট বিস্বাদ। তাদের অবস্থা তখন হয় কোরআন মজীদে উল্লেখিত ওই অবস্থার মতো যেখানে বলা হয়েছে, "তাদের চোখগুলো এমনভাবে অনুবর্তিত হতে থাকে যেনো মৃত্যু তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে।" বন্ধুদর্শনের মধ্যে রয়েছে শান্তি, তৃপ্তি ও দৃষ্টিনন্দনত্ব। আর শত্রুদর্শনের মধ্যে রয়েছে রোষ ও কটাক্ষ। মানুষ তার সন্তান সন্ততিকেও ভালোবাসে। তাই তাদেরকেও কুররাতুল আইন বলা হয়।

আলেমগণ বলেছেন, মুমিনের মেরাজ হচ্ছে নামাজ। এখানে মুমিন অর্থ রসুল পাক স. স্বয়ং। অন্য সকলে এই অর্থে মুমিন যে, তাঁরা প্রকৃত মুমিন রসুল পাক স. এর একনিষ্ঠ অনুসারী। অনুসরণের যোগ্যতানুসারে তাঁরাও ওই মেরাজের অংশ পেয়ে থাকেন। নামাজের তাশাহুদ পাঠের বিধানের মধ্যে এই মাকামের অংশ প্রাপ্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। ভিতর বাহির– কলব ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের সবকিছু সহকারেই নামাজী তার প্রভুপ্রতিপালকের প্রতি নিমগ্ন হয়। ফেরেশতাদের বিভিন্ন আমলকে আল্লাহ্পাক এক রাকাতের নামাজের মধ্যেই সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদল ফেরেশতা রুকু করেন। অন্যদল করেন সেজদা। আবার কোনো দল করেন কিয়াম, কোনো দল পাঠ করেন ক্বেরাত। একদল অপরদলের আমল করতে পারেন না। মানুষের প্রতি নির্দেশিত নামাজই কেবল ওই সকল ইবাদতকে একত্র করেছে। তাই নামাজ একটি সমন্বিত আমল, পূর্ণাঙ্গ ইবাদত। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, কেবলামুখী হওয়া, তকবিরে তাহরীমা, অন্যান্য তকবিরসমূহ, ক্বেরাত, কিয়াম, রুকু, সেজদা, তসবিহ, দোয়া, দরূদ, একাগ্রচিত্ততা, বিনয়, নম্রতা– এগুলোর প্রত্যেকটি একেকটি পৃথক ইবাদত।

আল্লাহ্পাক এগুলোকে কতইনা সুন্দররূপে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। আর এই নামাজ হচ্ছে রসুল পাক স. এর ওই নামাজের নিদর্শন যার অভ্যন্তরে রয়েছে শেফা, বরকত ও কামালিয়াত। আর তাই তিনি স. নামাজকে বলেছেন, কুররাতুল আইন। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, হে আমার হাবিব! আপনার প্রতি

প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যে কিতাব প্রেরণ করা হয়েছে, আপনি তা তেলাওয়াত করুন ও নামাজ কায়েম করুন। আল্লাহ্পাক আরো বলেছেন, আপনার পরিবারবর্গ এবং অনুসারীদেরকে নামাজের নির্দেশ দিন এবং তার উপর ধৈর্য ধারণ করুন। এই ধৈর্য ধারণের মধ্যে এরকম ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজের মধ্যে রয়েছে এমন এক গুরুভার, যা নফসের জন্য বহন করা অত্যন্ত কঠিন। কামনা, বাসনা, আনন্দ, পার্থিব ব্যস্ততা– এ সকল কিছু থেকে পৃথক হয়ে নামাজ পাঠকারী আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ অন্বেষণে লিপ্ত হয়। দণ্ডায়মান হয় আল্লাহ্তায়ালার মহান দরবারে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'আসতায়ীনু বিস সবরি ওয়াস সালাহ' (তোমরা নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও)। এখানে নামাজের সঙ্গে ধৈর্যের উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, নামাজের মধ্যে রয়েছে কয়েক ধরনের ধৈর্য বা সবর। যেমন, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার উপর সবর, নামাজের হেফাজতের উপর সবর, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব পালনের উপর সবর, ঔদাসিন্য এবং অন্যমনস্কা থেকে অঙ্গকে বিরত রাখার প্রতি সবর ইত্যাদি। এ কারণে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, নিঃসন্দেহে নামাজ একটি কঠিন কাজ। তবে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাদের জন্য নয়।

নামাজ ফরজ হয়েছিলো মেরাজ শরীফের রাতে। প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছিলো। পরে ধীরে ধীরে তা পাঁচ ওয়াক্তের জন্য ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে। কেননা আমার নির্দেশ পরিবর্তিত হয় না।

নামাজের সময় নির্ধারিত হয়েছিলো রসুল পাক স. এর মেরাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। মাওয়াহেব গ্রন্থে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. মেরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। সকাল হলো। হজরত জিব্রাইল এসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় বলে দিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, নামাজের সময় নির্ধারিত হয়েছে হিজরতের পর। আবার কেউ বলেছেন, ওয়াক্ত নির্ধারিত হয়েছিলো হিজরতের পূর্বে। এমনকি হজরত জিব্রাইল বলে দেয়ারও আগে। হজরত জিব্রাইল পরে এসে পুনরায় নামাজের সময় সম্পর্কে অবহিতি দান করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, সময় নির্ধরণ সূত্রে হজরত জিব্রাইল রসুল পাক স. এর নিকট দুই দিন এসেছিলেন, বলেছিলেন, নামাজ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, আযান দিন। আযান দেওয়া হলো। আযান শুনে সমবেত হলেন সাহাবীগণ। শুরু হলো জোহরের নামাজ। নামাজের ইমাম হলেন হজরত জিব্রাইল। তখন সূর্য্য মধ্য গগন থেকে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। সময় গড়িয়ে চললো। ছায়া প্রসারিত হতে থাকলো পূর্বদিকে। আসল বস্তুর ছায়া যখন দ্বিগুণ

হয়ে গেলো তখন হজরত জিব্রাইলের ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হলো আসরের নামাজ। সূর্য্য ডুবে গেলো। সূর্য্যাস্তের পরক্ষণেই অনুষ্ঠিত হলো মাগরিবের নামাজ। পশ্চিম আকাশে দিনান্তের সর্বশেষ চিহ্ন মুছে গেলে অনুষ্ঠিত হলো এশা। আর সোবহে সাদেকের সময় সম্পাদিত হলো ফজর। পরের দিনও হজরত জিব্রাইল জোহরের নামাজের ইমামতী করলেন। আসল বস্তুর ছায়া তখন অত্যন্ত হ্রস্ব। মূল বস্তু ও ছায়া তখন প্রায় একাকার। ছায়া দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হলো। অনুষ্ঠিত হলো আসরের নামাজ। মাগরিবের নামাজ পড়া হলো সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার পর। এশার নামাজ পড়া হলো প্রথমবারের চেয়ে একটু বেশী রাত করে। অর্ধ রজনীতে অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশে। সন্দেহ ছিলো বলে এখানে বর্ণনাকারী অর্ধরাত্রি অথবা এক তৃতীয়াংশ দু'টোই বলেছেন। আর বলেছেন, ফজরের নামাজ অনুষ্ঠিত হলো সোবহে সাদেকের শেষ দিকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, পূর্বাকাশ যখন হয়ে উঠেছিলো উজ্জ্বল অর্থাৎ সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ আগে। এভাবে পর পর দুইদিন নামাজের তালিম দেয়ার পর হজরত জিব্রাইল বললেন, পর পর দুই দিন নামাজের ওয়াক্তের প্রথম ও শেষ সীমা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। ওই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময় ছিলো আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের নামাজের সময়।

আপনার উম্মতের জন্য প্রথম ও শেষ সময়ের মধ্যে নামাজ পাঠ করবার অবকাশ দেয়া হলো। তবে ওয়াক্তের প্রথম দিকে নামাজ পাঠের মধ্যে যে ফযীলত রয়েছে, তা অর্জন করার ব্যাপারে আপনার উম্মতেরা যেনো পিছ পা না হয়। আবার কোনো কেনো নামাজ ওয়াক্তের শেষ দিকে আদায় করাই মোস্তাহাব। যেমন ফজরের নামাজ, গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ এবং এশার নামাজ।

এই নামাজগুলো শেষ দিকে পড়লেই অধিক পুণ্য লাভ হয়। ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীগণ সব নামাজই ওয়াক্তের প্রথমদিকে আদায় করে থাকেন এবং বলে থাকেন, ওয়াক্তের প্রথম দিকে পাঠ করাই দস্তুর। তাই তারা এরকম করাকেই উত্তম বলে জানেন। শীত ও গ্রীষ্মকালের পার্থক্য অনুসারে নামাজ পাঠের ব্যাপারটিকে মান্য করা আমাদের মতে ওয়াজিব এবং শাফেয়ীগণের নিকট সুন্নত। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখরতা কিছুটা কমে যাওয়ার পর জোহর নামাজ পাঠ কারার কথা বলা হয়েছে হাদিস শরীফে। কাজেই তা পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীরা এরকম করাকে অনুত্তম মনে করে থাকেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, সূর্য্য কিছুটা ঢলে পড়ার সময়টাই প্রখরতা কমে যাওয়ার সময়। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যটি ঠিক নয়। কারণ ওই সময়টি জোহরের প্রথম দিককার সময়। রোদের প্রখরতা কিছুটা করেম যাওয়া অথবা বস্তুর ছায়া একগুণ

হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার ব্যাপারে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাব অতি সাবধান। কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম।

শাফেয়ী মতালম্বীরা আসরের নামাজও আগে আগে পড়ে থাকেন। দিবসের এক চতুর্থাংশে অবশিষ্ট থাকে– এরকম সময় তাঁরা আসরের নামাজ পাঠ করে থাকেন। তেমনি তাঁরা ফজরের নামাজও পড়ে থাকনে আগে আগে, সোবহে সাদেকের শুরুতেই। কেউ কেউ আবার ওয়াক্তের শেষ দিকে নামাজ পাঠ করাকে উত্তম জানেন। তারা মনে করেন, ওয়াক্ত হওয়ার পরক্ষণেই তাড়াহুড়া করে নামাজ পাঠ করা উচিত নয়। তবে মাগরিবের নামাজ ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরক্ষণেই পাঠ করার ব্যাপারে সকলেই একমত। আসরের নামাজ পড়া যাবে ওই সময়ে যখন সূর্য থাকে বেশ কিছুটা উঁচুতে এবং উজ্জ্বল অবস্থায়। বিলম্বে আসর নামাজ পাঠ করার অর্থ এই নয় যে, তখন দিবসের এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকবে। শাফেয়ীগণের আগে আগে আসরের নামাজ পড়ার পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তি হাদিসসম্মত নয়। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, রসুল আকরম স. এরকম সময়ে আসর আদায় করেছেন যেনো নামাজের পর সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার আগেই একজন মানুষ পায়ে হেঁটে মদীনা শরীফের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। একথার দ্বারা বস্তুর ছায়া তিনগুণ হয়েছে বুঝা যায় না। অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুল পাক স. এমন সময়ে আসর পড়েছেন যখন সূর্য উঁচুতে অবস্থান করছিলো এবং তার রঙ ছিলো উজ্জ্বল।

নামাজের পর কেউ মদীনার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেলেও সূর্য তখনও উঁচুতেই অবস্থান করতো। কারো কারো মতে মদীনা থেকে মদীনার শেষ প্রান্তের দূরত্ব প্রায় চার মাইল। এই হাদিসটি পূর্বের হাদিসটিকে অধিকতর প্রবল করার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। কিন্তু মদীনার শেষ প্রান্ত অর্থ কোন দিকের শেষ প্রান্ত সে কথা হাদিস দু'টির একটিতেও উল্লেখিত হয়নি। সঠিক দূরত্বের কথা বলা হয়নি। যে লোক হেঁটে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে তার চলার গতি শ্লথ না দ্রুত হবে সে কথাও বলা হয়নি। একথাও বলা হয়নি যে, ওই লোক শক্তিশালী হবে না দুর্বল। সুতরাং বিষয়টি তাঁদের মাজহাবের ওই সকল মন্তব্যের মতো যেমন দিবসের এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকা, বস্তুর ছায়া তিনগুণ হওয়া ইত্যাদি। অপর এক হাদিসে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রসুল পাক স. এর সঙ্গে আসরের নামাজ আদায় করলাম। এরপর একটি উট জবেহ করে তার গোশত পাকানো হলো এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে আমরা তা ভক্ষণ করলাম। এই হাদিসের মাধ্যমে অবশ্য অন্যান্য ইমামগণের মাজহাবের অনুকূল ধারণা লাভ করা যায়। তবে একথাটিও স্মরণে রাখাতে হবে যে, রসুল আকরম স. কখনও কখনও শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং

ওয়াক্তের সীমানির্দেশ করার জন্য এরকম আমল করেছেন। সবসময় তিনি এমন করেছেন একথা বলা যায় না।

হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত আলেম শায়েখ কামালউদ্দিন ইবনুল হেমাম বলেছেন, সূর্যের রঙ তখনও পরিবর্তিত হয়নি, এরকম বিলম্বে আসরের নামাজ পড়ার পর উট জবাই করা এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তার রান্না করা গোশত খাওয়া সম্ভব। অভিজ্ঞ পাচক অতি দ্রুত রান্নার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং হাদিসে উল্লেখিত আসরের পরে জবাই এবং মাগরিবের পূর্বে তা রান্না করে খেয়ে ফেলার ব্যাপারটি অসম্ভব কিছু নয়। এমনও হতে পারে যে, তখন সেখানে অনেক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। আর তারা একযোগে গোশত কাটা, রান্নার ব্যবস্থা উনুন জ্বালানো, রান্না ইত্যাদি করেছিলেন। তাই অল্প সময়ের মধ্যে ওরকম সম্ভব হয়েছিলো। এরকম সম্মিলিত উদ্যোগই অতি দ্রুত কার্যোদ্ধার হওয়ার কারণ। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দৌড়ে চলে এসো।" এই নির্দেশটি যেমন অবশ্যমান্য, তেমনি যেক্ষেত্রে বিলম্ব করা মোস্তাহাব সেক্ষেত্রেও বিলম্ব করা সমীচীন । যেমন গ্রীষ্মকালে রোদের তাপ কিছু কমে আসার পর জোহরের নামাজ আদায় করা, পূর্বাকাশ কিছু ফর্সা হয়ে যাওয়ার পর ফজরের নামাজ আদায় করা এবং এশার নামাজ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা। বিভিন্ন সহিহ হাদিসে এ সম্পর্কে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

আমাদের মাজহাবের আলেমগণ বলেছেন, নফল নামাজ পড়ার কারণে আসরের নামাজ বিলম্বিত করাও মোস্তাহাব। আসর থেকে মাগবির পর্যন্ত নফল নামাজ পাঠ মাকরূহ। তাই ওয়াক্তের শুরুতে আসর আদায় করে নফল থেকে ক্ষান্ত হওয়ার চেয়ে অধিক নফল পড়ার পর আসর আদায় করাও উত্তম। মোট কথা আমাদের মাজহাব অনুসারে আসরের নামাজ এমতো বিলম্ব করে আদায় করা মোস্তাহাব, যেনো সূর্যের রঙ তখনও অপরিবর্তিত থাকে এবং সূর্য উজ্জ্বলরূপে উচ্চে অবস্থান করে। হজরত ইবনে মাসউদের হাদিস দ্বারা এরকম প্রমাণিত হয়। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. আসরের নামাজ এমন সময়ে আদায় করতেন, যখন আকাশের রঙ থাকতো শাদা এবং পরিষ্কার। হজরত জাবের বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল পাক স. আসরের নামাজ এমন সময়ে আদায় করতেন, যখন সূর্য থাকতো প্রোজ্জ্বল। তাঁর বর্ণনায় মদীনার শেষ পর্যন্ত গমন করা ইত্যাদির উল্লেখ নেই। এই হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, রসুলে আকরম স. কখনও কখনও আসরের নামাজ একটু আগে আগে পড়তেন, কিন্তু সব সময় তিনি এরকম করতেন না। শায়েখ ইবনুল হেমাম কিছুটা বিলম্বে আসর নামাজ পাঠ করা সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনাকরার পর বলেছেন, আমার নিকট এই হাদিস এবং কিছুটা

আগে আসর পড়া সম্পর্কি হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে বলে মনে হয় না। তিনি আরো বলেছেন, এই নামাজকে আসর বলা হয়েছে এই কারণে যে, এ সময়কে এতেছার করা হয়– নিংড়ানো হয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হয়েছে, রোজার সময় ছাড়া অন্য সময়ে ওয়াক্তের প্রথম দিকে আসর পড়া বিধেয়। ইমাম বোখারী বলেছেন, শেষ দিকের কথা। নবী পাক স. একবার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপমা এরকম– এক ব্যক্তি তিনজন শ্রমিক নিযুক্ত করলো এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলো এক দিরহাম করে। প্রথমজন কাজ করলো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। দ্বিতীয়জন দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত এবং তৃতীয় জন করলো আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। পারিশ্রমিক পরিশোধের সময় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রমিক বললো, আমরা দু'জন তো তৃতীয়জন অপেক্ষা বেশী কাজ করেছি। তবুও আমাদের সকলের পারিশ্রমিক সমান। এর কারণ কী? মালিক বললো, আমার নির্ধারণ তো ছিলো এরকমই। এ হচ্ছে আমার অনুগ্রহ। আমার অনুগ্রহ আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করি। তোমাদের এখানে করণীয় কিছুই নেই। নবীপাক স. পুনরায় বললেন, প্রথম শ্রমিক হচ্ছে ইহুদীদের প্রতীক। তাদের আয়ু যেমন বেশী তেমনি আমলও বেশী। দ্বিতীয় শ্রমিক হচ্ছে খৃষ্টান সম্প্রদায়। আর তৃতীয় শ্রমিক তোমরা। তোমাদের আয়ু যেমন কম তেমনি আমলও কম। এই হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায়, আসর মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় সকাল থেকে দুপুর এবং দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত সময় অনেক বেশী। জোহর আসরের সময়কে ফজর জোহরের সমান করতে গেলে আসরের নামাজ কিছুটা বিলম্ব করেই পড়তে হয়।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা করো, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।" আরো এরশাদ করেছেন, "সকাল সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের জিকির করো।" এসকল আয়াত দ্বারা ফজর এবং আসরের নামাজের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাজের সময় সম্পর্কে এবং নামাজ ওয়াক্তের প্রথম দিকে ও শেষ দিকে আদায় করা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে। আমরা প্রসঙ্গটির ইতি ঘটালাম এখানেই।

আযান

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, হজরত জিব্রাইল ইমামতি করে নামাজ শিক্ষা দিয়েছেন। ওই সময় নামাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে– এরকম ঘোষণার কথা বলা

হয়েছিলো। কিন্তু ওই ঘটনাটি ছিলো আযান সম্পর্কিত শরিয়তের বিধান প্রতিষ্ঠিত হবার আগের ঘটনা। আযানের বিধান জারী করা হয়েছিলো প্রথম হিজরীতে মদীনায়। কেউ কেউ বলেছেন দ্বিতীয় হিজরীতে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— রসুল আকরম স. সাহাবীগণের সঙ্গে এই মর্মে পরামর্শ করতে বসলেন যে, নামাজের সময় সকলকে কিভাবে আহ্বান কারা যায়। কেউ একজন বললেন, ঘণ্টা বাজানো যেতে পারে, যেমন খৃষ্টানেরা তাদের উপসনার সময় হলে বাজায়। কেউ বললেন ইহুদীরা যেমন শিঙ্গা বাজায় তেমনি শিঙ্গা বাজানো যায়। কেউ কেউ বললেন, একটি উঁচু স্থানে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই আগুন দেখেই সকলে বুঝতে পারবে যে, নামাজ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই পরামর্শগুলো কারো নিকটেই তেমন পছন্দ হলো না। সাহেবুল আযান নামে খ্যাত সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্যক্তি আকাশ থেকে নিচে নেমে এলেন। তার হাতে ছিলো একটি ঘণ্টা। হজরত ইবনে জায়েদ বললেন, আপনার ঘণ্টাটি কি আপনি আমার নিকট বিক্রয় করবেন? লোকটি বললো, তুমি ঘণ্টাটি নিয়ে কী করবে? তিনি বললেন, আমি এর দ্বারা মানুষকে নামাজের জন্য আহবান করবো। লোকটি বললো, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম একটি পদ্ধতি শিখিয়ে দেবো। এই বলে তিনি আযানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করলেন। এইভাবেই শিখিয়ে দিলেন একামতও। সকালে তিনি রসুল পাক স. সকাশে তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালেন। রসুল আকরম স. বললেন, ইনশাআল্লাহ্ তোমার স্বপ্ন সত্য। তুমি বেলালকে বলো, এখন থেকে সে যেনো এভাবেই আযান দিতে থাকে। কেননা তার কণ্ঠস্বর উচ্চ, সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। নামাজের সময় হলো। হজরত বেলাল নূতন নিয়মে আযান দিলেন। গায়ের চাদর সামলাতে সামলাতে ছুটে এলেন হজরত ওমর। বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ, আমিও আব্দুল্লাহ বিন জায়েদের মতো স্বপ্ন দেখেছি। রসুল পাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালার জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে এলহামের মাধ্যমে সঠিকপথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আবু বকরও এরকম স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইমাম গাজ্জালী বলেছেন, এরকম স্বপ্ন দেখেছিলেন দশ জন সাহাবী। তার মধ্যে সাত জন ছিলেন আনসার। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, আযান শুনে হজরত ওমর এলেন। এরকম করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রসুল স. জবাব দিলেন বিলম্বে। কারণ তাঁর উপর তখন অবতীর্ণ হচ্ছিলো পবিত্র প্রত্যাদেশ।

হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. মেরাজ রজনীতে আল্লাহ্ পাক সকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওই স্থানটি ছিলো আল্লাহ্পাকের মহিমার একটি বিশেষ মহল। সেখানে তিনি স. এক ফেরেশতাকে দেখে হজরত জিব্রাইলের নিকট জানতে চেয়েছিলেন, এই ফেরেশতাটিকে? হজরত জিব্রাইল

বলেছিলেন, সেই আল্লাহ্‌র কসম যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, আমি সকল ফেরেশতার চেয়ে অধিক নৈকট্যভাজন, কিন্তু এ পর্যন্ত আমি একে কোনো সময় দেখিনি। ওই ফেরেশতা বলতে শুরু করলো, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। যবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, হে আমার বান্দা! তুমি সত্য বলেছো। আমিই সুমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ফেরেশতার মাধ্যমেই রসুল পাক স. শিখে নিয়েছিলেন আযানের বাক্যাবলী। এরকম বলা যেতে পারে যে, মেরাজ রজনীতেই রসুল পাক স. আযানের বাক্যাবলী শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তখন এই নির্দেশ পাননি যে, এটাই নামাজের আযান হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

মক্কাবাসের প্রাক্কালে তিনি স. আযান ছাড়াই নামাজ পাঠ করেছেন। মদীনাবাসের সময় তিনি সাহাবীগণের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ বিনিময় করেছিলেন। তখন কোনো কোনো সাহাবী স্বপ্নে শুনতে পেয়েছিলেন আযান। ইত্যবসরে রসুল পাক স. এর উপর এই মর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো যে, আপনি আসমানে যে শব্দগুলো শুনতে পেয়েছিলেন সেগুলোকেই আযান হিসাবে গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ পাক সমধিক জ্ঞাত।

রসুল আকরম স. কখনো আযান দিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণ একমত হতে পারেননি। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল পাক স. সাহাবীগণকে নিয়ে সফর করছিলেন। সকলেই ছিলেন তাঁদের নিজ নিজ বাহনের আরোহী। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। মাটি হয়ে গেলো কর্দমাক্ত। তাই নিচে নামা যাচ্ছিলো না। নামাজের সময় হলো। রসুল পাক স. নিজেই আযান দিলেন। সকলেই তাঁদের বাহনের উপরেই নামাজ পড়ে নিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই হাদিসে আযান দিলেন কথাটির অর্থ আযানের হুকুম দিলেন। অর্থাৎ এই ঘোষণা দিলেন যে, আরোহী অবস্থাতেই নামাজ পড়ে নিতে হবে। মসনদে ইমাম আহমদ এবং দারাকুতনীর বর্ণনায় একথাটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. তখন আযান দেয়ার হুকুম দিলেন।

হেদায়া গ্রন্থে ইমাম ইউসুফের বর্ণনায় এসেছে, আমি একদিন মাগরিবের সময় ইমাম আবু হানিফাকে আযান দিতে দেখেছি। আযান দিয়ে তিনি বলেছিলেন, শামসুল আয়েম্মা ইমাম সুরুখসী একথা উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন, এই বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা আযান ও একামত দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আবার সফতিয়ানীর বক্তেব্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানিফা ইমামতিও করতেন এবং বলতেন ইমাম ও মোয়াজ্জিন– দুজনেরই আলেম হওয়া উত্তম। তবে শেষ যুগের আলেমগণ বলেছেন, উত্তম হচ্ছে ইমাম আযান ও ইকামতের দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন অন্যের

উপর। কেননা রসুল পাক স. কখনো ইমামতি, আযান ও ইকামত একত্র করেননি। শামসুল আয়েম্মা বলেছেন, বিষয়টি ছিলো কেবল রসুল পাক স. এর জন্যই। আমাদের জন্য উত্তম হচ্ছে, ইমামই আযান দিবেন। কারণ মোয়াজ্জিন আযানের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায়। তিনি আরো বলেছেন, রসুল পাক স. কখনো কখনো আযান ও ইকামত বলেছেন। যেমন, হজরত ওকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেন, এক সফরে আমি ছিলাম রসুল পাক স. এর সঙ্গী। সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লো তখন তিনি স. আযান ও ইকামত বলে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। নেহায়া গ্রন্থে বর্ণনাটি রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আযান, ইকামত ও ইমামতি একত্র করা রসুল পাক স. এর সাধারণ অভ্যাস ছিলো না। এরকম ঘটনা ঘটেছিলো মাত্র একবারই এবং সফরের সময়। আলেমগণ বলেন, ওই আযানও প্রকৃত আযান ছিলো না– ছিলো আযানের ঘোষণা। আর ইমাম আবু হানিফার আযানও তার নিয়মিত কোনো আমল ছিলো না। মাত্র একবারই তিনি মাগরিবের আযান দিয়েছিলেন। এরকম বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, অনেক সময় তিনি ইমাম আবু ইউসূফকে নামাজ পড়ানোর নির্দেশ দিতেন। কিন্তু ওই দিন তিনি নিজেই ইমামতি করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফার মতো একজন মহান ইমাম রসুল পাক স. এর সুন্নতের অনুকূল হবেন না– এরকম ভাবা যায় না। একথা বলতেই হয়, নেহায়া রচয়িতার বর্ণনা দুর্বল। তাঁর বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায়, যেনো রসুল পাক স. নিয়মিত আযান, ইকামত, ইমামত একত্র করতেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। তবে এ কথাটি ঠিক যে, আযান, ইকামত, ইমামত একজন করলে তা বৈধ হবে। হয়তো এই বৈধতা প্রমাণ করার জন্যই তিনি স. জীবনে অন্তত একবার ওরকম করেছিলেন। একথাটি মেনে নিলে বিষয়টির একটি সরল নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, সুন্নত এই যে, মোয়াজ্জিন যখন হাইয়্যালাস সালাহ বলবেন, তখন ইমাম ও মোক্তাদীগণ দণ্ডায়মান হবেন এবং যখন বলবেন ক্বদকামাতিস সালাহ, তখন ইমাম তকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করে নামাজ শুরু করবেন। এই সুন্নতের উপর আমল করলে দেখা যায়, ইকামত দাতা ও ইমাম একজন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইমাম নামাজ শুরু করার পরও মোয়াজ্জিনকে ইকামতের অবশিষ্ট অংশ (আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ) উচ্চারণ করতে হয়। একারণেই একজনের আযান, ইকামত ও ইমামত সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই কেউ বলেছেন, এরকম করা মাকরূহ। কেউ বলেছেন, অনুত্তম। আর এই একত্রিকরণকে মোস্তাহাব বলে

জানেন যারা, তারা বরাত দিয়ে থাকেন ইমাম নববীর এবং শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণের এবং হানাফী মাজহাবের শামসুল আয়েম্মা ইমাম সুরুখসির ।

হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, খেলাফতের সঙ্গে আযান সম্পৃক্ত থাকলে আমিই আযান দিতাম । এই বর্ণনাটি রয়েছে ফতলুল বারী গ্রন্থে ।

প্রকৃত কথা এই যে, একজনই যদি আযান ও ইকমত বলে ইমামতি করে তবে তা হবে বৈধ । মাকরূহ নয় । রসুল পাক স. জীবনে অন্তত একবার এরকম করেছেন । সুতরাং তাকে মাকরূহ বলে মন্তব্য করা যায় না । আমলটি বৈধ বলে মেনে নিতে হবে ।

তাকবিরে তাহরীমা

বিভিন্ন হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল পাক স. দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করতেন । নামাজ শুরুর এই তাকবিরের নাম তাকবিরে তাহরীমা । তাকবিরে তাহরীমার পূর্বে তিনি স. মুখে নিয়ত উচ্চারণ করতেন না । মোহাদ্দেছগণ বলেছেন, মুখে নিয়ত বলা বেদাত । মুখে নিয়ত উচ্চারণ করাকে রসুল পাক স. পছন্দ করতেন না । সাহাবায়ে কেরামের কেউ এরকম করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই । মাওয়াহেব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, ইবনে কাইয়ুম বলেছেন, নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বেদাত । রসুলে আকরম স. থেকে কোনো সহিহ সনদ অথবা দুর্বল, মুসনাদ বা মুরসাল কোনো সূত্রেই এরকম আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না । কোনো সাহাবীও এরকম করেননি । কোনো তাবেয়ীও একে মোস্তাহাব বলে সাব্যস্ত করেননি । চার মাজহাবের কোনো ইমামও একে সমর্থন দেননি । তবে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে । মুখে উচ্চারণ করাকে কেউ কেউ বলেছেন বেদাত । কারণ এমন আমলের কোনো ভিত্তিই নেই । কিন্তু কেউ কেউ একে মোস্তাহাব বলেছেন এই যুক্তিতে যে, নিয়তের মৌখিক উচ্চারণ একাগ্রচিত্ততার সহায়ক এবং এতে করে ইবাদতের মধ্যে মুখের ও অন্তরের সমন্বয় সাধন হয় । শরিয়তের বিধান ও আকলের চাহিদা অনুসারে বোধগম্য হয় যে, কলব, মুখের সঙ্গে সমন্বিত হলে আমল হয় অধিকতর পূর্ণ । কিন্তু এই যুক্তিটি অচল । নিয়তকে রুকু, সেজদা, তসবিহ পাঠের সঙ্গে তুলনা করলে চলবে না । এরকম তুলনা নসের (কোরআন ও হাদিসের) বিরোধী । রুকু ও সেজদার তসবিহ পাঠ, ক্বেরাত ইত্যাদি মনের সঙ্গে মুখে উচ্চারণ করার দলিল আছে ঠিকই, কিন্তু মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার কোনো দলিলই নেই ।

রসুল পাক স. তাকবিরে তাহরীমা বলার সময় দুই হাত উত্তোলন করতেন– অধিকাংশ হাদিসে একথার বর্ণনা রয়েছে । ইমাম আবু ইউসুফ এবং হানাফী

মাজহাবের ফকীহ তাহাবী, কাযী প্রমুখ এই মতটিকে পছন্দ করেছেন। তারা বলেছেন তাকবিরে তাহরীমা বলার সময় হাত উঠানো সুন্নত। কোনো কোনো হাদিসে প্রথমে হাত উঠিয়ে তারপর তাকবির বলার কথা এসেছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, প্রথমে হাত ওঠাতে হবে। তার একটু পরে উচ্চারণ করতে হবে তাকবির। মাশায়েখগণও এরকম আমলকে পছন্দ করেছেন। হেদায়া গ্রন্থে এই আমলটিকে অধিকতর বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। যুক্তি হচ্ছে, হাত উঠানোর মাধ্যমে গায়েরুল্লাহর প্রভাবকে মিটিয়ে দেয়া হয় এবং আল্লাহু আকবার উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের মহত্ব ও উচ্চতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এভাবে প্রথমে নফি (নিবারণ) এবং পরে এসবাত (প্রতিষ্ঠা) করা হয়। কলেমা শরীফ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর মধ্যেও নফি ও এসবাত রয়েছে। প্রথমে রয়েছে নফি (লা ইলাহা) এবং তারপর রয়েছে এসবাত (ইল্লাল্লাহ)।

ইব নূর ইমাম বলেছেন অন্য কথা। তাঁর মতে প্রথমে আল্লাহু আকবার বলতে হবে এরপর হাত উঠাতে হবে। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে সুনানে কুবরা কিতাবে বায়হাকি কর্তৃক বর্ণিত হজরত আনাসের একখানি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাকবিরে তাহরীমার ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া গেলো–

১. তাকবির উচ্চারণ ও হাত উঠানোর কাজ এক সংগে করতে হবে।

২. আগে হাত ওঠাতে হবে, তারপর তাকবির বলতে হবে।

৩. আগে তাকবির বলতে হবে, পরে হাত ওঠাতে হবে।

রসুল আকরম স. থেকে এই তিন রকম আমলেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ পাকই সমধিক জ্ঞাত।

তাকবিরে তাহরীমার সময় রসুল আকরম স. অধিকাংশ সময় কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। কখনো উঠাতেন কাঁধ পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা গ্রহণ করেছেন প্রথমোক্ত নিয়মটি। হজরত ওবায়েল ইবনে হাজারের হাদিস থেকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও এই নিয়মটি গ্রহণ করেছেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফে। শেষোক্ত নিয়মটি গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক। বর্ণিত হয়েছে ইমাম আহমদও এর সমর্থক।

হাদিস শরীফে এই নিয়মের প্রমাণ রয়েছে। আবু হুমায়েদ সাইদির বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি সাহাবা কেরামের একটি দলের সামনে এ সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছিলো তোমরা নবী করীম স. নামাজের একনিষ্ঠ সংরক্ষক। হাঁ কোনো কোনো সময় তিনি স. এরকম আমল করেছেন (কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়েছেন)।

তাকবিরে তাহরীমার পর তিনি বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করতেন। এভাবে বুকের উপর হস্ত স্থাপন করা শাফেয়ী মাজহাবের আমল। আর হানাফি মাজহাবের আমল হচ্ছে নাভির নিচে হস্ত স্থাপন করা। শাফেয়ী মাজহাবের কোনো

কোনো অনুসারীও এই আমলটির সমর্থক। এরকম বলা হয়েছে মওয়াহেব গ্রন্থে। হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, বুকের উপর হাত রাখা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব। ইমাম আহমদের মাজহাব ইমাম আবু হানিফার অনুরূপ। আবার এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইমাম আহমদ বলেছেন, বুকের উপরে অথবা নাভির নিচে যে কোনো স্থানে হস্ত স্থাপন করা যেতে পারে। ইমাম তিরমিজী বলেছেন, এই আমলটি সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্নরূপ বক্তব্য রয়েছে। তাই বুকের উপরে অথবা নাভির নিচে যে কোনো ভাবে এই আমলটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

রসুল আকরম স. হাত বাঁধার পর ছানা পড়তেন। এর আর এক নাম দোয়ায়ে এসতেফাতাহ। দোয়াটি এরকম– সুবহানা কাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবার কাসমুকা ওয়া তাআলা যাদদুকা ওয়ালা ইলাহা গইরুক। এই দোয়া ছাড়াও আরো দোয়ায়ে এস্তেফাতাহ রয়েছে। যেমন, ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা ইত্যাদি। ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীগণ সব কয়টি অথবা যে কোনো একটি দোয়ায়ে এস্তেফাতাহ ফরজ ও নফল নামাজে পড়ে থাকেন। ইমাম আবু হানিফার অনুসারীগণ মনে করেন ওই দোয়াসমূহ পড়তে হয় নফল নামাজে। বিশেষ করে রাতের নফল নামাজে। ফরজ নামাজে পড়তে হয় কেবল সুবহানা কাল্লাহুম্মা...... এই দোয়াটি। ইমাম আবু ইউসুফের মতে সুবহানাকা ও ইন্নি ওয়াজ্জাহতু দুটো দোয়াই পাঠ করা যায়।

ইমাম তাহাবীর অভিমতও এরকম। তবে তিনি বলেছেন, নামাজী ইচ্ছা করলে প্রথমে সুবহানাকা এবং পরে ইন্নি ওয়জ্জাহতু অথবা প্রথমে ইন্নি ওয়াজ্জাহতু এবং পরে সুবহানাকা পড়তে পারে। ইমাম আবু ইউসুফও এরকম বলেন। প্রসিদ্ধ নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে সুবহানাকা এবং পরে ইন্নি ওয়াজ্জাহতু পড়া। আর একটি কথা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, যারা নামাজ শুরু করার আগে ইন্নি ওয়াজ্জাহতু পড়ে থাকেন তাদের আমলটি সুন্নতের অনুরূপ নয়।

সুবহানা কাল্লাহুম্মা সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাই বলেছেন হাদিসটি উত্তম ও প্রসিদ্ধ। হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে মুসলিম শরীফে। বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো মুজতাহিদ সাহাবী কর্তৃক গৃহীত হাদিসটির সমর্থনে রয়েছেন বহু সংখ্যক তাবেয়ী আলেম। ইমাম আবু হানিফাও এই হাদিসের অনুসারী। সুতরাং হাদিসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অনেক মোহাদ্দেছও এই হাদিস অনুযায়ী আমল করেছেন। যেমন– সুফিয়ান সওরী ইমাম আহমদ, ইসহাক প্রমুখ। ইমাম তিরমিজি কেবল হাদিসটির একটি সনদের উপর বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অন্য সনদগুলো বিরূপতামুক্ত। তাই শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এই হাদিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মাজহাব।

দোয়ায়ে এস্তেফাতাহ্ বা সানা পড়ার পর রসুল আকরম স. পাঠ করতেন আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম। এই আউযুবিল্লাহ পাঠ করতে হয় কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করার পূর্বে। সে তেলাওয়াত নামাজের অভ্যন্তরে হোক বা নামাজের বাইরে। সুফিয়ান সওরী ও আতা বলেছেন, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব। কোরআন মজীদের প্রকাশ্য নির্দেশের মাধ্যমে এই ওয়াজিবটি সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, যখন কোরআন পাঠ করবে, তখন আউযুবিল্লাহ পড়ে নিও। এলমে ক্বেরাতের বিখ্যাত গ্রন্থ শাথবীর ব্যাখ্যা সূত্রে হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরকম পাঠ করতেন এবং বলতেন, জিব্রাইল আমাকে এরকম বলেছেন। হজরত আবু সাঈদের হাদিসেও আউযুবিল্লাহ পড়ার কথা বলা হয়েছে। ইবনুল হেমামও এরকম বলেছেন।

হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে আসতায়িযুবিল্লাহ পাঠ করাই উত্তম। এরকম করলে কোরআন মজীদে উল্লেখিত শব্দের সঙ্গে আনুরূপ্য সৃষ্টি হয়। আউযুবিল্লা পড়া উত্তম না, আসতায়িযুবিল্লাহ্ পড়া উত্তম– সে সম্পর্কে ফেকাহ ও ক্বেরাত শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

রসুল আকরম স. আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম পাঠ করার পর বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়তেন। এই আমলটির ব্যাপারে সকলেই একমত। যদিও ইমাম আবু হানিফার মতে বিসমিল্লাহ শরীফ, সুরা ফাতিহা অথবা অন্য কোনো সুরার অংশ নয়। কিন্তু তিনিও নামাজের শুরুতে আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন। সুতরাং এই আমলটি নামাজের উদ্বোধনী স্বরূপ। এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে। এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ। বিসমিল্লাহ শরীফ কোরআন তেলাওয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রতি রাকাতে যেহেতু কোরআন পাঠ করতে হয়, তাই প্রতি রাকাতের শুরুতেই বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করতে হবে। এই অভিমতটি একটি সতর্কতামূলক অভিমত। আর এতে মতানৈক্যও রয়েছে। বিসমিল্লাহকে যারা সুরা ফাতিহার অংশ বলে মনে করেন, তাদের মত হচ্ছে– সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে না। বিসমিল্লাহ শরীফ সশব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে পাঠ করতে হবে, না নিঃশব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে– এই নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সওরী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, নিঃশব্দে পাঠ করতে হবে। এই মতের সমর্থক সাহাবীগণ হচ্ছেন হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের। হজরত আনাসও বলেছেন, আমি রসুলে করীম স. এর পিছনে নামাজ পড়েছি। নামাজ পড়েছি হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের পিছনেও।

তাঁদের কাউকেও আমি বিসমিল্লাহ শরীফ সশব্দে পাঠ করতে শুনিনি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, নাসাঈ, ইবনে খুজাইমা এবং দারা কুতনী। জামেউল উসুল কিতাবে হজরত আনাসের হাদিসটি 'বিসমিল্লাহ নিঃশব্দে পাঠ করা' অধ্যায়ে সিহাহসিত্তা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। দারা কুতনী বলেছেন, বিসমিল্লাহ শরীফ শব্দে পাঠ করা সম্পর্কে রসুল পাক স. থেকে বিশুদ্ধ কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি। তবে এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যেসকল বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো কিছু কিছু সহিহ এবং অবশিষ্টগুলো জয়িফ। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, মদীনা মনোয়ারার কোনো কোনো ইমাম সুন্নত বুঝানোর জন্য বিসমিল্লাহ শরীফ সশব্দে পাঠ করেছেন। হাদিস ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, বিসমিল্লাহ শরীফ সশব্দে পাঠ করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো উম্মতকে শিক্ষাদান। যেমন তিনি স. শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জোহরের নামাজেও সশব্দে সুরা পড়েছেন। সফরুস সায়াদাত রচয়িতা বলেছেন, রসুল পাক স. বিসমিল্লাহ শরীফ কখনও সশব্দে , আবার কখনও নিঃশব্দে পড়েছেন। ইমাম তিরমিজি তাঁর জামে তিরমিজি গ্রন্থে বিসমিল্লাহ পাঠ সংক্রান্ত দু'টি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেছেন। তন্মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ হচ্ছে বিসমিল্লাহ শরীফের নিঃশব্দ পাঠ বিষয়ক। তিনি ওই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন, অধিকাংশ আলেম সাহাবী নিঃশব্দে পাঠ করার আমলটি গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান এবং হজরত আলী। এই মতের সমর্থক তাবেয়ীগণ হচ্ছেন সুফিয়ান সওরী, আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ। তিরমিজি বলেছেন, বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করতে হবে নিঃশব্দে। জামে তিরমিজির অন্য অনুচ্ছেদটি সশব্দ পাঠ বিষয়ক। এই অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেছেন, রসুল পাক স. বিসমিল্লাহ শরীফ সশব্দে পাঠ করতেন। তিরমিজি বলেন, এই হাদিসের সনদ সুদৃঢ় নয়। সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠের পক্ষের সাহাবীগণ হচ্ছেন, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ। কতিপয় তাবেয়ীও এই অভিমতটির সমর্থক। ইমাম শাফেয়ীর মাজহাবেও এই আমলটি গৃহীত হয়েছে। হাকেম বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিস সহিহ। এ সম্পর্কে বর্ণিত হজরত আবু হোরায়রার হাদিসটিও সহিহ। সশব্দ পাঠের পক্ষে এই দুইজনের হাদিসই উল্লেখযোগ্য। আবদুল বার সুত্রে শায়েখ ইবনুল হেমাম বলেছেন, সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠের সমর্থক তাবেয়ীগণ হচ্ছেন– শা'বী, নাখয়ী, আওজায়ী, কাতাদা, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, আ'মাশ, জুহুরী, মুজাহিদ, হাম্মাদ এবং আবু ওবায়েদ। কোনো কোনো হাফেজে হাদিস বলেছেন, সশব্দে পাঠ করা সম্পর্কে হাদিসগুলো সুস্পষ্ট নয়। আর ওই হাদিসগুলোর সনদের ব্যাপারেও মোহাদ্দেছগণের সমালোচনা রয়েছে। প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণনাকারীগণও এ সকল বর্ণনা থেকে বিমুখ। তাই তাঁরা এ সকল হাদিস

বর্ণনা করেননি। যদিও তাঁদের রচিত হাদিস গ্রন্থসমূহে অন্যান্য বিষয়ে দুর্বল হাদিসও লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইবনে তামান্না বলেছেন, আমি দারা কুতনীকে বলতে শুনেছি, বিসমিল্লাহ শরীফ সশব্দে পাঠ করার ব্যাপারে কোনো সহিহ হাদিস রসুল পাক স. থেকে বর্ণিত হয়নি। মোট কথা এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসগুলোর অধিকাংশ এবং অধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হাদিসগুলো বিসমিল্লাহ শরীফ নিঃশব্দে পাঠ করার পক্ষে। আর এটাই ইমাম আবু হানিফার মাজহাব। যাঁরা বলেন, হজরত আলী সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন, তাঁদের এ কথা ঠিক নয়। বরং তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলিফার মতো বিসমিল্লাহ শরীফ নিঃশব্দেই পাঠ করতেন।

বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ শেষে রসুলপাক স. সুরা ফাতিহা পড়তেন এবং পাঠ শেষে আমিন বলতেন। জেহরী নামাজে (মাগরিব, এশা ও ফজর) সশব্দে আমিন বলতেন। আর সেররী নামাজে (জোহর ও আছর) আমিন বলতেন নিঃশব্দে। মোক্তাদীরাও এরকম করতেন। আমিন সশব্দে বলার পক্ষেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মাজহাব এরকম। ইমাম মালেকের মাজহাবে এর পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আবু হানিফার মাজহাব হচ্ছে সকল অবস্থায় আমিন বলতে হবে নিঃশব্দে। তিরমিজি শরীফে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয় নিয়মের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে সশব্দের পক্ষের হাদিসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশী। ইমাম বোখারীও ওরকম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অধিকাংশের আমল ছিলো আমিন সশব্দে বলা। হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম চারটি কাজ নিঃশব্দে করবে – ১. আউজুবিল্লাহ ২. বিসমিল্লাহ ৩. আমিন ৪. সুবহানাকাল্লাহুম্মা। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এরকম বর্ণনা এসেছে। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর জাময়ুল জাওয়াম গ্রন্থে আবু ওয়ায়েল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এবং হজরত আলী বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন সশব্দে। কিন্তু আউযুবিল্লাহ এবং আমিন সশব্দে পাঠ করতেন না। আবু ওয়ায়েল থেকে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয় নিয়মের হাদিস বর্ণনা করে শায়েখ ইবনুল হেমাম বলেছেন, উভয় বর্ণনাই সমালোচনাসাপেক্ষ। তবে এ বিষয়ে হজরত ইবনে মাসউদের হাদিস নির্ভরযোগ্য।

প্রকাশ থাকে যে, কোনো হাদিসে লিপিবদ্ধ হয়েছে মাদ্দা সাওতাহু এর দ্বারা। আমিন শব্দটির হামযা অক্ষরটিকে মদ উচ্চারিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে মাদ্দা সাওতাহু দ্বারা সশব্দে আমিন বলাকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা অন্য বর্ণনায় রয়েছে এর সহায়তাসূচক শব্দ। সেখানে বলা হয়েছে, উচ্চস্বরে আওয়াজ করার কথা। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, আমিন বললে মসজিদ মুখরিত হয়ে উঠতো।

আমিন পাঠ করার নিয়ম হচ্ছে, আলিফ বর্ণটি মদ সহযোগে এবং মিম অক্ষরটিকে সাকিন করে পড়তে হবে। আবার আলিফকে মদ ছাড়াও পড়া যায়।

কেউ কেউ বলেছেন, আলিফে মদ এবং মিমি তাশদিদ দিয়ে পাঠ করলে অশুদ্ধ হবে। তবে তাতে নামাজ নষ্ট হবে না। কেননা কোরআন মজীদের অন্যত্র এরকম উচ্চারণবিশিষ্ট শব্দ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্পাক বলেছেন, আম্মিনা আলাইছাল হারামা– যদিও এখানে আম্মিনা শব্দটি আমিন এর সমার্থক নয়। কেউ কেউ বলেছেন, আবার তা অযথার্থও নয়, কেননা আম্মিনা অর্থ কবুলের আকাঙ্খী। শায়েখ ইবনুল হেমাম হুলওয়ারী গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে এরকম বর্ণনা এনেছেন। শায়েখ আবদুর রহমান, সালামী ও সুদ্দীও এরকম অর্থ গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো ফেকাহ্ শাস্ত্রজ্ঞ বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, এরকম উচ্চারণ অশুদ্ধ।

তিনি স. সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মিলেয়ে পড়তেন। ফজরের নামাজ পড়তেন সাত আয়াত থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত। কখনও পড়তেন সুরা ক্বফ, কখনও সুরা রূম। আবার কখনও ক্বেরাত সংক্ষিপ্ত করতেন। সফরের সময় পড়তেন সুরা ফালাক্ব এবং সুরা নাস। জুমার দিন ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে পড়তেন সুরা সেজদা এবং দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন 'হাল আতা আলাল ইনসানা হিইনা মিনাদ্দাহরী', শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীগণ এই আমলের ব্যতিক্রম কখনও করেন না। কিন্তু হানফী মাজহাবের অনুসারীগণ কোনো বিশেষ সুরাকে বিশেষ কোনো নামাজে পাঠ করাকে মাকরূহ মনে করেন। শায়েখ ইবনুল হেমাম তাহবী এবং ইসবিহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, এরকম নির্ধারণ তখনই মাকরূহ হবে যখন তাকে মনে করা হবে অপরিহার্য এবং ওই নির্দিষ্ট সুরা ছাড়া অন্য সুরাকে মনে করা হবে মাকরূহ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, কোরআনের যতটুকু তোমার জন্য সহজ হয়, ততটুকুই পাঠ করো। রসুল পাক স. পড়েছেন, এই মনে করে যদি কেউ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোনো সুরা পাঠ কর, তবে তা মাকরূহ হবে না। কিন্তু শর্ত হচ্ছে কখনও কখনও অন্য সুরাও পাঠ করতে হবে। এরকম করলে মূর্খ লোকেরা বুঝে নিতে পারবে যে, এর ব্যতিক্রম করা জায়েয। মুহীত প্রণেতা বলেছেন, জুমার দিন ফজরের নামাজে বর্ণিত ক্বেরাত পাঠ করা মোস্তাহাব। তবে শর্ত হচ্ছে, কখনও কখনও এর ব্যতিক্রম করতে হবে। ক্বেরাত পাঠ করা সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের পর কোনো নির্দিষ্ট ক্বেরাতের বৈধাবৈধ সম্পর্কে আর কিছু বলার থাকে না। কেননা মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে তো কেবল সবসময়ের জন্য কোনো সুরাকে নির্দিষ্ট করে নেয়ার ব্যাপারে। হানাফীগণের মত হচ্ছে, রসুল পাক স. কোনো সুরাকে কোনো বিশেষ নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন, এরকম কোনো প্রমাণ নেই। তিবরাণী বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে প্রত্যেক জুমায় কথাটি অতিকথনের পর্যায়ভুক্ত। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি রসুল স. কে এরূপ আমল করতে দেখেছি। আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন।

রসুল আকদাস স. জুমার নামাজে সুরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন। কখনও কখনও পাঠ করতেন সাব্বি হিসমা রব্বিয়াল আ'লা এবং সুরা গাসিয়াহ। এরকম বর্ণনাও রয়েছে যে, জুমার রাতে তিনি পাঠ করতেন সুরা জুমা। আল্লামা সুয়ূতী সুরা মুনাফিকুন পাঠ করার কথাও বলেছেন। মোট কথা তিনি বিভিন্ন কারণে সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছোট কিংবা বড় সুরা পাঠ করতেন। হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে একথা এসেছে। ওই হাদিসটি প্রসিদ্ধ এবং অনেকের আমলে বাস্তবায়িত। অধিকাংশ ফেকাহ শাস্ত্রজ্ঞদের আমল ছিলো এরকম– ফজর ও জোহরের নামাজে তেওয়ালে মোফাসসাল, আসর ও এশায় আওসাতে মোফাসসাল এবং মাগরিবের নামাজে কেসারে মোফাসসাল এর অন্তর্ভুক্ত সুরা পাঠ। অধিকাংশ সময়ে তিনি স. এরকমই করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সুরা নির্বাচন সম্পর্কে আমীরুল মুমিনিন হজরত ওমর হজরত আবু মুসা আশআরীর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। হেদায়া পুস্তকে একথা এসেছে। হজরত ওমরের পত্রের বিবরণ সুন্নতের অনুকূলেই ছিলো। এর বিপরীত বর্ণনাগুলোও সুন্নতসম্মত। মোট কথা বিশেষ কোনো সুরা নির্ধারণ বা নির্বাচন সংঘটিত হয়েছিলো সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আল্লাহ্পাকই উত্তমরূপে জ্ঞাত।

ক্বেরাত শেষ হলে তিনি স. আল্লাহু আকবার বলতে বলতে রুকুতে চলে যেতেন। এই তাকবির দণ্ডায়মান অবস্থায় উচ্চারিত হতো, না রুকুর দিকে ঝুঁকে পড়ার সময়– সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মাজহাব হচ্ছে তাকবির বলা হতো রুকুর দিকে ঝুঁকে পড়ার পর। হেদায়া গ্রন্থে জামে সগীর কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ঝুঁকে পড়া অবস্থায় তাকবির বলতে হবে। তেমনি রুকু থেকে ওঠার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। হাদিস শরীফে এসেছে– রসুল পাক স. নামাজে মাথা ঝুঁকানো এবং মাথা ওঠানোর সময় তাকবির বলতেন। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তাকবির বলতে হবে দুই হাত উঠিয়ে। আমাদের মাজহাবের মত হচ্ছে তাকবির বলতে হবে হস্ত উত্তোলন না করেই এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। হানাফী মাজহাব ও অন্যান্য মাজহাবের মধ্যে এই মতানৈক্যটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। শাফেয়ীগণ হস্ত উত্তোলনের হাদিসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সফরুস সায়াদাত প্রণেতা বলেছেন, অধিক বর্ণনার প্রেক্ষিতে হস্ত উত্তোলন সম্পর্কিত হাদিস হয়েছে সর্বজনবিদিত। হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে রসুল পাক স. এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে চারশ' হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আশারা মোবাশশারা সাহাবীগণও রয়েছেন। ইমাম তিরমিজির নিয়ম হচ্ছে, মতভিন্নতাসূচক হাদিসগুলোকে তিনি সবসময় দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে থাকেন। এক্ষেত্রেও তিনি হাত ওঠানো ও না ওঠানোর হাদিসগুলোকে দু'টো পৃথক অধ্যায়ে বিন্যস্ত

করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন হাত ওঠানোর পক্ষের হাদিসগুলোকে আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন হাত না ওঠানোর হাদিসগুলোকে। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি দেখেছি নামাজের শুরুতে তিনি স. তাঁর হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। আর রুকুর প্রাক্কালে এবং রুকু থেকে মস্তক উত্তোলনের সময়ও তিনি এইরূপ করতেন। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তিনি স. দুই সেজদার মধ্যবর্তীতে হস্ত উত্তোলন করতেন না। হজরত ইবনে ওমর সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন সনদের উল্লেখ করেছেন, অনেক মুজতাহিদ সাহাবী এবং তাবেয়ীও এই আমলের দিকেই ইশারা দিয়েছেন। যেমন আওজায়ী, আবদুল্লাহ শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ। এঁরা হাত ওঠানোর হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন এবং এই আমলটিকে অধিক গুরুত্ববহ বলে মনে করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম ছিলো যারা তকবিরে তাহরিমা ব্যতীত অন্য সময় হাত ওঠাতেন না, তাঁদের সম্পর্কে। এই অধ্যায়ে তিনি আল কামার বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদিস উল্লেখ করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর সঙ্গীগণকে বলেছিলেন, আমিও তোমাদের মতো রসুল পাক স. এর পিছনে নামাজ আদায় করেছি। এরপর হজরত ইবনে মাসউদ নামাজ পড়লেন। কিন্তু তকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য সময় হাত উঠালেন না। তিরমিজি বলেছেন, হজরত বারাবিন আজীব থেকেও এ প্রসঙ্গে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদের এই হাদিসটি হাসান। অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী এই অভিমতটির প্রবক্তা। সুফিয়ান সওরী এবং কুফাবাসীগণও এ্ই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর মোয়াত্তা গ্রন্থে ইমাম মালেক-জুহুরী-সালেম বিন আবদুল্লাহ– হজরত ইবনে ওমর– তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, সুন্নত হচ্ছে মাথা ঝুঁকানো এবং ওঠানোর সময় তাকবির বলা। কিন্তু তাকবিরে তাহরীমা ছাড়া অন্য সময় হাত ওঠানো যাবে না। ইমাম আবু হানিফা এই অভিমতটিকেই গ্রহণ করেছেন। অনেক হাদিস রয়েছে এই অভিমতটির সমর্থনে। যেমন আসেম বর্ণনা করেছেন তার পিতা কুল আইয়ুব জরবী থেকে। প্রখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন তিনি এবং লাভ করেছিলেন হজরত আলীর সাক্ষাত। তিনি বলেছেন, হজরত আলী তাকবিরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোনো সময় হস্ত উত্তোলন করতেন না। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে সুফিয়ান সওরীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহাবী মেশকাতুন আছার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মুজাহিদ বলেন, আমি হজরত ইবনে ওমরের পিছনে নামাজ পড়েছি। তিনি প্রথম তাকবির ছাড়া আর কখনো হাত উঠাতেন না। আশওয়াছ বলেছেন, আমি হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে তাকবিরে তাহরীমা ছাড়া অন্য সময় হাত ওঠাতে দেখি। হজরত ওমর, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ ছিলেন রসুলে আকরম স. এর অত্যন্ত

ঘনিষ্ঠ সহচর। তদুপরি হজরত ইবনে ওমরকেও তাকবিরে তাহরীমা ছাড়া হাত ওঠাতে দেখা যায়নি। সুতরাং এর বিপরীত আমল গ্রহণ যোগ্য না হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। শায়েখ ইবনুল হেমাম তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইবরাহীম আল কামা এবং আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা রসুলে করীম স. হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের সঙ্গে নামাজ পড়েছি। তাঁরা কেউই তাকবিরে তাহরীমা ছাড়া হাত ওঠাতেন না। হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যা পুস্তক নেহায়ায় লিপিবদ্ধ রয়েছে– হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের একবার এক ব্যক্তিকে বায়তুল্লাহ শরীফে নামাজ পড়তে দেখলেন, লোকটি রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় তার হস্ত উত্তোলন করছিলো, তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের লোকটিকে বললেন তুমি এরকম কোরো না। কারণ রসুল পাক স. এই আমলটি প্রথম দিকে করতেন বটে, কিন্তু পরে তিনি তা ছেড়ে দিয়েছিলেন। একথায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এরকম আমল ইসলামের প্রথম দিকে ছিলো কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে যায়।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল আকরম স. যখন রফে ইয়াদাইন (হস্ত উত্তোলন) করতেন তখন আমরাও সেরকম করতাম। তিনি স. যখন ওই আমলটি ছেড়ে ছিলেন, তখন আমরাও ছেড়ে দিলাম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আশারা মোবাশশারাগণ তাকবিরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোনো সময় রফে ইয়াদাইন করতেন না। এই আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, হাত ওঠানো এবং না ওঠানো দুটি আমলই হাদিস সম্মত। সুতরাং আমাদেরকে বলতেই হচ্ছে যে, এর রকম করা হয়েছিলো সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। অথবা প্রথম জামানায় এই আমলটি ছিলো, কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে যায়।

শায়েখ কামাল উদ্দিন ইবনে হেমাম বলেছেন, প্রথমদিকে নামাজের মধ্যে কথা বলা বৈধ ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। রফে ইয়াদাইন এর আমলটিও তেমনি রহিত আমলের পর্যায়ভুক্ত। ইমাম আবু হানিফা থেকে মুমতাদ এবং তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর সম্মুখে একবার ওয়ায়েল ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি রসুল পাক স. কে রুকু ও সেজদার প্রাক্কালে রফে ইয়াদাইন করতে দেখেছেন। একথা প্রসঙ্গে ইবরাহীম বলেছেন, এরকম হওয়া সম্ভব। কেননা তিনি হয়তো ওই একদিনই রসুল পাক স. এর সঙ্গে নামাজ পড়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ অথবা তার মতো অন্যান্য সাহাবী নিশ্চয় এ বিষয়ে অধিক অবগত ছিলেন। তাঁরা বলেছেন, রফে ইয়াদাইন রহিত হওয়ার কথা। হজরত আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনাকারীর একটি বিরাট দল এই মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রসুল পাক স. প্রথম তাকবির ছাড়া আর কখনো হাত ওঠাতেন না। হজরত আবদুল্লাহ ছিলেন ইসলামের বিধি বিধানের একজন প্রখ্যাত আলেম। নবী পাক স. এর বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে অধিক জ্ঞাত ছিলেন সে সম্পর্কে

সকলেরই ঐকমত্য ছিলো। গৃহবাসের সময় এবং সফরে সকল অবস্থায় তিনি রসুল আকরম স. এর পবিত্র সংসর্গধন্য ছিলেন। অসংখ্যবার তিনি রসুল স. এর পিছনে নামাজ পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং অধিক অভিজ্ঞজনের অভিমত গ্রহণ করাই উত্তম। বিশেষ করে ওই ব্যক্তির তুলনায়, যিনি একক ভাবে কদাচিৎ কোনো ঘটনার সাক্ষী। পরিশেষে একথা আবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, রফে ইয়াদাইন করা না করা দুটোই বৈধ এবং সুন্নত।

আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত। এ সম্পর্কে সাফরুস সায়াদাত গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। প্রয়োজনে তা দেখে নেয়া যেতে পারে। রসুল আকরম স. রুকুর সময় দুই হাত দ্বারা দুই হাঁটু শক্ত করে ধরতেন। হাতের আঙ্গুলগুলো রাখতেন ফাঁক করে। আলেমগণ বলেছেন, নামাজে হাতের আঙ্গুল তিন অবস্থায় রাখতে হয়– এক. রুকু অবস্থায় ফাঁক করে। দুই. সেজদা অবস্থায় সম্মিলিত অবস্থায়। তিন. অন্যান্য অবস্থায় স্বাভাবিক অবস্থায়। রুকু অবস্থায় তিনি স. তাঁর বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখতেন পৃষ্ঠদেশকে রাখতেন সমান্তরাল। মস্তক পৃষ্ঠদেশের চেয়ে উঁচু অথবা নিচু হতো না।

রুকুতে তিনি স. কমপক্ষে তিনবার পাঠ করতেন সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, নামাজ পূর্ণ করতে গেলে কমপক্ষে তিনবার রুকুর এই তসবী পাঠ করতে হবে। তিনবারের বেশী হলে উত্তম। কিন্তু সংখ্যা হতে হবে বেজোড় অর্থাৎ পাঁচ, সাত বা নয় বার পাঠ করতে হবে। আলেমগণ বলেছেন, তসবী পাঠের সর্বোচ্চ সংখ্যা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বোচ্চ দশবার পড়া যাবে এর বেশী নয়। কেউ কেউ আবার এমনও বলেছেন, এত বেশী পড়া যাবে না, যাতে মনে হয় ভুল করে অধিক পড়া হচ্ছে। কেউ আবার বলেছেন রুকু অবস্থায় যতক্ষণ থাকা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তসবী পাঠ করা যাবে। এ সকল মতভেদ একা একা নামাজ পাঠকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জামাতবদ্ধ অবস্থায় নামাজ এর নিয়ম ভিন্ন। ইমামকে তখন মোক্তাদীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। মোক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল এবং বৃদ্ধ লোকও থাকতে পারেন। অতএব, তাদের অসুবিধার কথা বিবেচনায় আনতে হবে।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, আমি রসুল পাক স. এর পিছনে নামাজ পড়েছি। তাঁর নামাজের সঙ্গে এই নব্য যুবকের (ওমর বিন আবদুল আজীজের) নামাজ সর্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি অনুমান করেছেন সেজদায় তসবী পাঠ করা হতো দশবার যদিও প্রকৃত সংখ্যা ছিলো এর চেয়ে কম।

রসুলে আকরম স. যতক্ষণ রুকুতে থাকতেন, ততক্ষণ থাকতেন সেজদায়। সেজদায় গমনের সময় প্রথমে মাটিতে রাখতেন দুই হাঁটু। তারপা দুই হাত, তারপা কপাল এবং শেষে নাক। কেউ কেউ বলেছেন প্রথমে নাক। তারপর

কপাল। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মাজহাব হচ্ছে প্রথমে মাটিতে রাখতে হবে হাঁটু। তারপর হাত। ইমাম মালেক ও ইমাম আওজারীর মাজহাব হচ্ছে, প্রথমে দুই হাত রাখতে হবে মাটিতে। তারপর দুই হাঁটু। ইমাম আহমদেরও একটি অভিমত এরকম।

রসুলে আকদাস স. সেজদা করতেন শরীরের সাতটি অঙ্গ দিয়ে, মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা, নাক এবং কপাল। মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত শুধু নাক অথবা শুধু কপালের উপর সেজদা করা সম্পর্কে কয়েকটি মত রয়েছে। হানাফীগণের মত হচ্ছে, নাক ও কপাল দুটোই মাটিতে রেখে সেজদা করতে হবে। সেজদা অবস্থায় দুই পা মাটি থেকে উপরে উঠে গেলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। এক পা উঠে গেলে নামাজ হবে মাকরুহ। শারহে ইবনুল হেমাম গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে।

সেজদা করার সময় তিনি স. দুই বাহু পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখতেন। এমনভাবে সেজদাবনত হতেন যে, উভয় বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হতো। বাহু ও উদর উরুদেশ পৃথক রাখতেন এভাবে, যাতে একটি ছাগলের বাচ্চা সেই ফাঁক দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে। সেজদার সময় মস্তক রাখতেন দুই হাতের মধ্যবর্তী স্থলে। রুকু থেকে উঠে সুস্থির হয়ে দাঁড়াতেন। দুই সেজদার মধ্যস্থলেও তেমনি বসতেন সুস্থির হয়ে। কখনও কখনও ওই সময়গুলোতে এমন বিলম্ব করতেন যাতে করে মনে হতো হয়তোবা তিনি নামাজের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হয়েছে দণ্ডায়মান অবস্থায়, রুকু অবস্থায়, তা'দীল, সেজদা, জলসা এগুলোতে তিনি প্রায় সমপরিমাণ সময় ব্যয় করতেন। যখন কিয়াম (দণ্ডায়মান অবস্থা) দীর্ঘ হতো তখন রুকু, কওমা (রুকুর পরে দাঁড়ানো) সেজদা এবং জলসা (দুই সেজদার মধ্যবর্তী সময়ের উপবেশন) সবকিছুই দীর্ঘ হতো। আর কিয়াম স্বল্পকারীন হলে নামাজের অন্য অঙ্গগুলোও হতো কম সময়ের। তবে এরকম যে তিনি সবসময় করতেন তা নয়। বিভিন্ন সময় এগুলোর সময়ের মধ্যে তারতম্যও ঘটে যেতো। সাধারণত সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ এবং তাহাজ্জুদ নামাজের রুকু সেজদা জলসা ও কওমা হতো সমপরিমাণ। এগুলো সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে জানা যায় রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এবং দুই সেজদার মধ্যস্থলে এমনভাবে সুস্থির হতে হবে যেনো মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যায়। তিনি স. এরশাদ করেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চুরি হচ্ছে নামাজের চুরি। সাহাবগণ তখন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ স.! নামাজের চুরি আবার কী রকম? তিনি স. উত্তর দিলেন, রুকু ও সেজদা সম্পূর্ণ আদায় না করা।

হজরত হোযায়ফা একবার দেখলেন, এক ব্যক্তি রুকু ও সেজদা পুরোপুরি আদায় না করে নামাজ পড়ে যাচ্ছে। নামাজ শেষে তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, তুমি নামাজ পড়লে বটে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে নামাজ পড়োনি। তুমি যদি এখন মৃত্যুবরণ করো, তবে তোমার মৃত্যু ইসলামের উপর হবে না। এ কথার অর্থ, আল্লাহ্তায়ালা রসুল পাক স. কে যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই ধর্মবহির্ভূত অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, রুকু, সেজদা, রুকু থেকে দাঁড়ানো এবং দুই সেজদার মধ্যবর্তী তা'দীল (স্থিরতা) ফরজ। ইমাম আহমদের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, একবার তসবি পাঠের সমপরিমাণ স্থিরতা ওয়াজিব। আর এক বর্ণনায় রয়েছে ফরজ। অন্য আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে সুন্নত। ইমামে আজম আবু হানিফা এবং কুরখী বলেছেন, ওয়াজিব। জুরজানী বলেছেন সুন্নত। তবে কওমা ও জলসায় তা'দীল বা স্থিরতা সকল অবস্থায় সুন্নত। মালেকী আলেমগণ এরকম বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, প্রকৃত রুকু হচ্ছে মস্তক অবনত করা এবং প্রকৃত সেজদা হচ্ছে মাটিতে কপাল স্থাপন করা। সুতরাং এগুলোতে ন্যূনতম সময় ব্যয় করতেই হবে। এর অধিক ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা। এই পূর্ণতা পরিত্যাগকারী ব্যক্তির নামাজ হয়ে যাবে বটে, কিন্তু তা অপূর্ণ বলে গণ্য হবে এবং এতে করে সে গোনাহগারও হবে। আল্লামা শামনী কোনো কোনো মাজহাবের ইমাম থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, রুকু ও সেজদার তা'দীল রক্ষিত না হলে নামাজ পুনরায় পাঠ করতে হবে। শরহে ইবনুল হেমাম গ্রন্থে রয়েছে, তা'দীল পরিত্যাগ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে ইমাম আহমদ বলেছিলেন, আমি আশংকা করি হয়তোবা এরকম করা জায়েয হবে না। ইমাম সুরুখসী বলেছেন, তা'দীল তরককারীর পুনঃনামাজ আদায় অপরিহার্য। অন্যান্য মাশায়েখগণও এরকম বলেছেন।

এ পর্যন্ত আলোচিত হলো রুকু ও সেজদার তা'দীল বা স্থিরতা সম্পর্কে। কিন্তু কওমা ও জলসার তা'দীল রক্ষা করা সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এক রুকন (স্তম্ভ) থেকে অন্য রুকনে যাওয়া এগুলোর উদ্দেশ্য। সুতরাং রুকু থেকে মাথা ওঠানো ওয়াজিব নয়। কেননা এখান থেকে মাথা না উঠিয়ে সেজদায় যাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেজদা থেকে মাথা না উঠিয়ে পুনরায় সেজদায় যাওয়া সম্ভব নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার নিকট রুকু থেকে মাথা ওঠানো ফরজ। কিন্তু সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো ফরজ নয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত একটি হাদিসকে এই মাসআলার দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন ওলামায়ে কেরাম। হাদিসটি এই– রসুল আকদাস স. একবার মসজিদের এক কোণায় বসেছিলেন। দেখলেন, এক বেদুইন যথানিয়মে রুকু সেজদা আদায় না করেই তার দুই রাকাত নামাজ পাঠ শেষ করলো। নামাজ শেষে

বেদুইনটি রসুল আকরম স. কে সালাম পেশ করলেন। তিনি স. সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেন, পুনরায় নামাজ পাঠ করো। কেননা তোমার নামাজ হয়নি। বেদুইন পুনরায় নামাজ পড়লো তারপর সালাম করলো রসুল আকরম স. কে। তিনি স. পুনরায় বললেন, তুমি আবার নামাজ পড়, তোমার নামাজ হয়নি। বেদুইন বললো, আপনাকে যিনি সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহ্‌র কসম! আমি এর চেয়ে ভালো নামাজ জানি না। দয়া করে আমাকে সঠিক নামাজ শিক্ষা দিন। তিনি স. ওজু, কেবলামুখী হওয়া, কিয়াম, ক্বেরাত ইত্যাদির বিবরণ দেয়ার পর বললেন, পূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে রুকু করো তারপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। দুই সেজদার মধ্যেও সোজা হয়ে বসো। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, ওই বেদুইনের নামাজ মাকরূহ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো বলেই রসুল আকরম স. তাকে পুনরায় নামাজ পাঠ করতে বলেছিলেন। তার নামাজ ফাসেদ এবং বাতিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এরকম বলেননি। তা'দীল যদি ফরজ হতো, তবে তিনি বারবার তাকে নামাজ পড়তে বলতেন না। বরং প্রথম বারেই তাকে বিষয়টি পুরোপুরি শিক্ষা দান করতেন। ওই হাদিসের শেষাংশে আবু দাউদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, যখন তুমি এভাবে আদায় করবে, তখন তোমার নামাজ পূর্ণ হবে। এর চেয়ে কম করলে তোমার নামাজ থাকবে অসম্পূর্ণ। তা'দীল ফরজ হলে রসুল আকরম স. তার পঠিত নামাজকে নামাজ বলে আখ্যায়িত করতেন না এবং অপূর্ণ শব্দটিও ব্যবহার করতেন না। সরাসরি বলতেন, তোমার নামাজ হয়নি বা তোমার নামাজ বাতিল হয়েছে। আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন।

সেজদার মধ্যে দোয়া পাঠ

রসুল আকদাস স. সেজদার মধ্যেও দোয়া মাছুরা পাঠ করতেন। তিনি স. এরশাদ করেছেন, তোমরা সেজদার মধ্যে দোয়া পড়। কেননা সেজদাকারীর দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আরো বলেছেন, সেজদার অবস্থায় বান্দা আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকতর নিকটবর্তী হয়। দোয়া দুই প্রকার– এক প্রকার হচ্ছে, আল্লাহ্‌পাকের মহত্ব মহিমা কীর্তন এবং স্তবস্তুতি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে– এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের কাছে কিছু যাঞ্চা করা। আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের মহিমা কীর্তন করা এবং তাঁর নিকট কোনোকিছু প্রার্থনা করা একই কথা। একথার সমর্থনে রয়েছে ওই হাদিসে কুদসিটি যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাক বলেন, আমার জিকিরে লিপ্ত থাকার কারণে কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করার সুযোগ না পায়, তবে আমি তাকে প্রার্থীদের চেয়েও উত্তম কিছু দান করি। কোনো কিছুর জন্য প্রার্থী হওয়াই দোয়ার উদ্দেশ্য। এখানে সেই প্রার্থনা জিকিরের মাধ্যমেই পূরণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ কারণে হানাফিগণ

নামাজের মধ্যে কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করাকে নিষেধ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, নামাজকে কেবল জিকির আজকার ও তসবী তাহলীলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ নামাজী দোয়া করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। জিকির আজকার এবং তসবী তাহলীলের মাধ্যমে সেই নির্দেশ প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এর অতিরিক্ত দোয়া বা প্রার্থনা নফল নামাজের মধ্যে করা যেতে পারে।

ফরজ নামাজে কোনোকিছু যাচ্ঞা বা প্রার্থনা করা উচিত নয়। কোনো কোনো হাদিসের মাধ্যমে নফল নামাজে বিশেষ করে রাতের নামাজে প্রার্থনা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো কোনো হানাফি আলেম বলে থাকেন ফরজ, নফল কোনো নামাজেই যাচ্ঞা করা যাবে না। এরকম করলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। এই মতটি বাড়াবাড়ি পর্যায়ের। এতে করে বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত রসুল আকদাস স. এর আমলকে অস্বীকার করা হয়। সুতরাং এই অভিমতটি সুসংগত যে, ফরজ নামাজে থাকতে হবে কেবল জিকির আজকার, তসবী তাহলীল ইত্যাদি। আর কোনো কিছু চাওয়া বা যাচ্ঞা করার বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করতে হবে নফল নামাজের মধ্যে। আল্লাহ্পাকই অধিক অবহিত।

দুই সেজদার পরবর্তী রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর নিয়ম সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে। প্রথমটি এই– সেজদা থেকে ওঠে বসে দুই হাত মাটির উপর রাখতে হবে। এর পর দাঁড়াতে হবে। একে বলে জলসা-এ-এসতেরাহাত। এই জলসার বিধান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এরকম করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন জলসা-এ-এসতেরাহাত সুন্নত। সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে এভাবে মাটিতে হাত রেখে বসার পর তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যেতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন, এরকম উপবেশন প্রয়োজন সাপেক্ষে বৈধ। তাদের কথা হচ্ছে বয়সজনিত দুর্বলতার কারণে তিনি স. এ রকম করতেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক এই অভিমতের প্রবক্তা। ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। তারা এই উপবেশনকে সুন্নত বলেননি। ইমাম শাফেয়ী তাঁর মতের সমর্থনে বোখারী, তিরমিজি এবং নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত হজরত মালিক ইবনে হুয়াইরিসের হাদিসটিকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে তিনি হজরত মালিক, দেখলেন, রসুল আকদাস স. প্রথম ও তৃতীয় রাকাত শেষে উপবেশন না করে দাঁড়ালেন না। শামনী বলেছেন, ইবনে উবাই বর্ণনা করেছেন, নোমান ইবনে আবী আব্বাস বলেন, আমি দেখেছি বহু সাহাবী প্রথম ও তৃতীয় রাকাত শেষে মাটিতে উপবেশন না করে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আলী, হজরত ওমর, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে জোবায়ের থেকে এরকম বর্ণনা এসেছে।

শ্রেষ্ঠ সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁরা এবং ছিলেন হজরত মালেক ইবনে হুআইরিসের তুলনায় রসুল আকদাস স. এর অধিক ঘনিষ্ঠ অনুসারী। সুতরাং শ্রেষ্ঠ সাহাবীকে প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব। আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল আকদাস স. সেজদা থেকে পরবর্তী রাকাতের জন্য দাঁড়াবার সময় মাটিতে হাত রেখে উপবেশন করতে নিষেধ করেছেন। হজরত ওয়ায়েল বলেছেন, তিনি স. সেজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করে দুই হাত উরুদেশের উপর স্থাপন করে দণ্ডায়মান হতেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত পরস্পরবিরোধী হাদিসগুলোর এভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে যে, তাঁর সেজদার পর দাঁড়ানোর আগে উপবেশনটি ছিলো অসুস্থতা অথবা বয়সজনিত দুর্বলতার কারণে। জমহুর ইমামগণ এরকমই বলেছেন। উল্লেখ্য যে, এতক্ষণ যে উপবেশনের বিষয়ে আলোচনা করা হলো, তা কিন্তু জলসা-এ-এসতেরাহাত নয়। দাঁড়ানোর সময় উরুর উপর বা মাটির উপর হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ানো সুন্নত। কিন্তু তা জলসা-এ-এসতেরাহাত নামে অভিহিত হতে পারে না। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদের মতে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রেখে তার উপর ভর করে দাঁড়ানো সুন্নত। এই আমলটি সুন্নত সাব্যস্ত হয়েছে হজরত ওয়ায়েল ইবনে হাজারের ওই হাদিসের মাধ্যমে, যা বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ কর্তৃক। সেখানে বলা হয়েছে, আমি রসুল আকদাস স. কে হাঁটু ও উরুর উপর হাতের ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। হজরত ওমর থেকেও এরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। সেই হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল আকদাস স. সেজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় মাটির উপর হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ানো নিষেধ করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন, জলসা-এ-এসতেরাহাত বলে কিছু নেই। তবে তিনি সেজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় মাটির উপর হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ানোর পক্ষপাতি। আমরাও বলি প্রয়োজন সাপেক্ষে দুর্বলতা বা বয়সজনিত কারণে এরকম করা বৈধ।

তাশাহহুদের সময় বসা

তিনি তাশাহহুদের সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর উপবেশন করতেন এবং ডান পা রেখে দিতেন খাড়া। এটাই ইমাম আবু হানিফার মাজহাব। ইমাম শাফেয়ী এর মাজহাবে প্রথম বৈঠকের নিয়ম এরকমই। তিনি প্রথম বৈঠকের নাম দিয়েছেন এফতেরাম এবং দ্বিতীয় বৈঠকের নাম দিয়েছেন তাওয়াররুক। তিনি বলেছেন, তাশাহহুদের পরে আর কোনো তাশাহহুদ নেই– যেখানে তাওয়াররুক করতে হবে। দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর স্বাভাবিক অবস্থায় বসার নাম তাওয়াররুক। শাফেয়ী মাজহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ হাভীতে এরকম বলা হয়েছে– এর দলিল নেয়া হয়েছে হজরত আবু হুমায়স সাইদীর হাদিস থেকে–

যিনি সাহাবা কেরামের একটি দলের সম্মুখে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে আমিই রসুল পাক স. এর নামাজ সম্পর্কে অধিক অবহিত।

ইমাম মালেক বলেছেন, উভয় বৈঠকেই তাওয়াররুক করতে হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, যে নামাজে দুইবার তাশাহহুদ পড়তে হয়, সেই নামাজের শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক করতে হবে। তাশাহহুদের উপবেশন সম্পর্কে চার মাজহাবের চার ইমামের চার রকম বক্তব্য রয়েছে।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বর্ণিত হাদিস এবং অন্যান্য হাদিস অনুসারে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এফতেরাশের তরিকা হচ্ছে স্বাভাবিক তরিকা। কেননা তাশাহহুদে এফতেরাশ সুন্নত। রসুল পাক স. প্রথম ও শেষ বৈঠকে একই নিয়মে উপবেশন করতেন। কোনো কোনো হাদিসে অবশ্য তাওয়াররুকের কথা এসেছে। কিন্তু সেই তাওয়াররুক ছিলো বিশেষ কোনো কারণে। বয়সজনিত কারণে অথবা দীর্ঘ দোয়া করার সময় তিনি ওভাবে বসতেন। অধিকতর সাচ্ছন্দ্য লাভ করার জন্যই তিনি তাওয়াররুক করতেন। এমনও হতে পারে যে, রসুল পাক স. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তরিকায় বসতেন। সুন্নত ও নফল নামাজের বর্ণানয় এরকম কথা এসেছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ্‌র যিনি প্রতিটি আমলে প্রশস্ততার অবকাশ রেখেছেন।

তাশাহহুদ পাঠের সময় তিনি স. দুই হাত দুই উরুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতে বলয় সৃষ্টি করতেন এবং ইশারা করতেন। শাফেয়ী মাজহাবের অভিমত হচ্ছে, ওই বলয় হবে তিপ্পান্ন গণনার মতো। নিয়মটি এরকম– তর্জনী ছাড়া অন্য সকল আঙ্গুল বন্ধ করতে হবে। আর বৃদ্ধাঙ্গলীর অগ্রভাগ রাখতে হবে তর্জনীর নিচে হাতের তালুর দিকে। এই অবস্থাকেই শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণ তিপ্পান্ন গণনার মতো বলে থাকেন। তারা প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করেছেন মুসলিম শরীফে বর্ণিত হজরত ইবনে ওমরের একটি হাদিসকে।

হানাফীগণের নিয়ম হচ্ছে, তাশাহহুদের সময় অঙ্গুলীসমূহের অবস্থান হবে নব্বই গণনার মতো। নিয়মটি এই– কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুলকে গুটিয়ে নিয়ে তর্জনীকে রাখতে হবে খোলা। তারপর বলয় সৃষ্টি করতে হবে মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্রিত করে। এই নিয়মটি বর্ণিত হয়েছে মুসলিম শরীফে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের থেকে। ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ীর পূর্বতন মতও এরকম। ইমাম মালেকের নিয়ম এরকম– ডান হাতের সকল আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলতে হবে। কেবল খোলা রাখতে হবে তর্জনী এবং তা অনবরত আন্দোলিত করতে হবে। ইমাম শাফেয়ীর আরেকটি নিয়ম এরকম– মধ্যমার অগ্রভাগকে বৃদ্ধার দ্বিতীয় গিরার মধ্যবর্তী স্থানে রাখতে হবে এবং তর্জনী উত্তোলন করতে হবে শাহাদাত পাঠের সময়।

ইশারা করার সময় সম্পর্কেও মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ইশারা করতে হবে ইল্লাল্লহ উচ্চরণের সময়। আবার কেউ বলেছেন, ইল্লাল্লহ এর আল্লাহ্ উচ্চারণের শেষে। তবে এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অভিমতটি এই– আঙ্গুল ওঠাতে হবে লা ইলাহা বলার সময় এবং নামিয়ে নিতে হবে ইল্লাল্লহ উচ্চারণকালে। উপরের দিকে এমনভাবে ইশারা করতে হবে যেনো কোনোদিক সুনির্দিষ্ট না হয়ে পড়ে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে শাহাদাত পাঠের সময় বলয়সৃষ্টি, আঙ্গুলের ইশারা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে। জামেউল উসুল গ্রন্থে সিহাহ সিত্তা থেকে এ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস সংকলিত হয়েছে। কোনো কোনো হাদিসে বলয় সৃষ্টি ও ইশারা করার কথা বর্ণিত হয়েছে যৌথভাবে। আবার কোনো কোনো হাদিসে কেবল বলা হয়েছে ইশারার কথা। অধিকাংশ মোহাদ্দেছ, ফকিহ, মুজতাহিদ এবং বেশীর ভাগ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার নিয়মটি গ্রহণ করেছেন। আলেমগণ বলেছেন, সঠিক নিয়মে ইশারা করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের মাজহাবও এরকম। আল্লামা শামনী বলেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর আমালী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, গুটিয়ে রাখতে হবে কণিষ্ঠা ও অনামিকা। বৃত্ত সৃষ্টি করতে হবে মাধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গলী দিয়ে এবং ইশারা করতে হবে তর্জনীর মাধ্যমে। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, রসুল করীম স. ইশারা করতেন। তাই আমরাও ইশারা করি। ইমাম আবু হানিফাও একথা বলেছেন। আল্লামা শামনী যহিরিয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, নামাজী ব্যক্তি তাশাহহুদের আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহ পর্যন্ত পৌঁছলে ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে কিনা, সে ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। তারপর তিনি ইশারা করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কছেন এবং এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন ফকিহ আবু জাফর থেকে। তিনি বলেছেন, কণিষ্ঠা ও অনামিকাকে বন্ধ করে রাখবে। বৃত্ত সৃষ্টি করবে মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা এবং ইশারা করতে হবে শাহাদাত আঙ্গুলীর মাধ্যমে।

মুনতাহাল মুফতী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, ইশারা মাকরূহ। কেফায়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হেদায়ার টিকা ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, মুহীত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে তাশাহহুদের সময় ডানহাতের শাহাদাত অঙ্গুলী উত্তোলন করা সুন্নত। ইমাম আবু ইউসুফও এরকম বলেছেন। আল্লামা নজমুদ্দিন বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইশারা করার সুন্নতটি বর্ণিত হয়েছে। কুফা এবং মদিনাবাসী আলেমগণও এই বিষয়টির বর্ণনাকারী। এ ছাড়া বহুসংখ্যক হাদিসও রয়েছে এর সমর্থনে। কাজেই এ আমলটি যে উত্তম সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

শরহে বেকায়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বৃত্ত তৈরী করা এবং ইশারা করার নিয়ম এসেছে আমাদের আসহাবগণ থেকে। আঙ্গুল আবদ্ধ করা এবং বৃত্ত বানানো নিষেধ– হেদায়া গ্রন্থে একথা বর্ণিত হয়েছে হজরত ওয়ায়েল ইবনে হাজারের হাদিস থেকে।

অথচ হজরত ওয়ায়েল থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী, আবু ইয়ালা, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ ইমামগণ বিভিন্ন হাদিস বর্ণনা করেছেন– যার মধ্যে রয়েছে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা বৃত্ত সৃষ্টি এবং ইশারা করার বিবরণ। শায়েখ ইমাম আজল্ল আলী মুত্তাকী এ সম্পর্কে একটি পুস্তিকাও প্রণয়ন করেছেন। এই পুস্তকে হানাফী ফেকাহ এবং তার মতানৈক্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ওই আলোচনায় বৃত্ত সৃষ্টি এবং ইশারা করার দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছে।

'আস্সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু' পাঠ সম্পর্কে দু'টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

প্রথম প্রশ্নঃ নামাজে কোনো মানুষকে সম্বোধন করা নিষেধ। এরকম করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এখানে আলাইকা দ্বারা রসুল পাক স. কে সম্বোধন করা হলো কেনো?

উত্তরঃ এটি রসুল পাক স. এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এটি প্রকৃত অর্থে সম্বোধনও নয়। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে দোয়া– যা সম্বোধনরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আসল কথাটি এই যে, এ বাক্যটি মেরাজের ঘটনার অংশ বিশেষ। সেখানকার বাক্যসমূহকেই নামাজের মধ্যে হুবহু রেখে দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনাটুকুর মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রশ্নটিরও জবাব হয়ে গেলো।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, গায়েব বা নাম পুরুষ থেকে উপস্থিত বা মধ্যম পুরুষে ওঠে আসার হেতু কী। যেহেতু এখানে উচ্চারিত শব্দগুলি হচ্ছে গায়েবের শব্দ। দোয়াটি এভাবেও উত্থাপন করা যেতে পারতো– আত্তাহিয়্যাতু, আস্সালামু আলা নাবিয়্যু ওয়াসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন। এই প্রশ্নটির উত্তর প্রথম প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে। তদুপরি একথা বলা যেতে পারে যে, রসুল পাক স. যে রকম বলেছিলেন, ঠিক সেরকমভাবেই তিনি স. সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই তা রয়ে গিয়েছে অবিকৃত এবং হুবহু অবস্থায়।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া প্রণেতা আহলে মারেফতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলেছেন, নামাজী যখন আত্তাহিয়্যাতুর মাধ্যমে আলমে মালাকুতের দরজা উন্মুক্ত করেন তখন তাঁকে ইজ্জতে এলাহীর দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর তার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে গেলে তিনি হুঁশিয়ার হয়ে যান এবং রসুল করীম স. এর

আনুগত্যের বরকতে আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে প্রবেশ করেন এবং সেখানে দেখতে পান আল্লাহ্র হাবিব স.কে। তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি তখন বলে ওঠেন, আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুহাক্কেক আলেমগণ বলেছেন, সৃষ্টির প্রতি অণু পরমাণুতে রয়েছে হকিকতে মোহাম্মদীর বিস্তার। তাই অন্তর্জগতে তাঁর ওই বিস্তারের বিদ্যমানতা লক্ষ্য করে বলা হয়— আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু। নামাজের মধ্যেই প্রতিভাসিত হয় ওই অনন্য আত্মিক দর্শন (কাশফ)। কারণ নামাজের অবস্থাই হচ্ছে সর্বোত্তম অবস্থা। নামাজের মাকামই সর্বাধিক নৈকট্যের মাকাম।

ইমাম কেরমানী শরহে বোখারীতে বলেছেন, তাঁর পৃথিবী বাসের সময় সাহাবায়ে কেরাম এরকম সম্বোধন করতেন। তিরোধানের পর তাঁরা বলতেন আসসালামু আনান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। রসুল পাক স. নিজে তাশাহহুদ পড়তেন এভাবে— আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াআশহাদুআন্নী রসুলুল্লাহ। শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম রাফেয়ীও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনাটি স্পষ্ট নয়। তবে রসুল পাক স. কোনো মোজেজা প্রকাশ পেলে বলতেন, আশহাদুআন্নী রসুলুল্লাহ। সহিহ বোখারীতে মোজেজাতুন্নবী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, এক সফরে সাহাবীগণের খাদ্যসামগ্রী অপ্রতুল হয়ে পড়েছিলো তখন তিনি অবশিষ্ট যৎসামান্য খাদ্যসামগ্রীকে একটি তসতুরীর মধ্যে রাখলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর তসতুরীর এক কোণ থেকে সকল সৈন্য তাঁদের নিজ নিজ পাত্র ভরে প্রচুর খাদ্য নিয়ে গেলেন। তবুক যুদ্ধের সময়েও এরকম মোজেজা প্রকাশ পেয়েছিলো। ওই সময় সৈন্যের সংখ্যা ছিলো সত্তর হাজার। সেখানে মোজেজা প্রকাশের পর তিনি বলেছিলেন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আন্নী রাসুলুল্লাহ। রসুল পাক স. এরশাদ করছেন, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন বলার মধ্যে উম্মতের জন্য এই সতর্কতা রয়েছে যে, তারা যেনো বিশুদ্ধতার আভরণে সজ্জিত হয় এবং এভাবে রসুলপাক স. এর সালাম লাভ করে ধন্য হয়। নামাজের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহ্পাকের যে মহান অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, তা থেকে কেউ যেনো বঞ্চিত না হয়।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, নামাজে যেমন আল্লাহ্র হক রয়েছে তেমনি রয়েছে বান্দাদের হক। তাই যে নামাজ তরক করবে সে আল্লাহ্র হক নষ্ট করবে। সাথে সাথে নষ্ট করবে বান্দাদের হক। যারা পৃথিবী পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন যারা বর্তমান এবং যারা আগামীতে আগমন করবে, তাদের সকলের হক নষ্ট করে নামাজ পরিত্যাগকারীরা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলেহীন বলা ওয়াজিব।

শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠের পর রসুল পাক স. এর উপর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। এ রকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন সুন্নত।

তিবরানী, ইবনে মাজা এবং দারা কুতনী কর্তৃক বর্ণিত হজরত সাহল ইবনে সাআদের হাদিসে রয়েছে রসুল পাক বলেছেন, ওই ব্যক্তির নামাজ নামাজই নয় যে তার নবীর উপর দরূদ পাঠ করলো না। হজরত আবু মাসউদ আনসারী থেকে দ্বারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. বলেন, যে ব্যক্তি তার নামাজে আমার এবং আমার আহলে বাইতের উপর দরূদ পাঠ করে না তার নামাজ কবুল করা হবে না। দরূদ শরীফের বিভিন্ন রকম বিবরণ পাওয়া যায়। তবে এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যেদীনা মোহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়েদিনা কামা সাল্লাইতা আলা সাইয়্যেদীনা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ ওয়া বারিক আলা সাইয়্যেদীনা মোহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদীনা মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা সাইয়্যেদীনা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদীনা ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। বিভিন্ন মাশায়েখ এর নিকট থেকে আমি এরকম দরূদ শরীফ শুনেছি। হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসের শেষাংশে রয়েছে, ফিল আলামিনা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। এই কথাটুকু পড়া অধিক উত্তম। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী এই বর্ণনাটুকুকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন বর্ণনাটি বেদাত।

রসুল আকরম স. ওহীর মাধ্যমে হুকুম পেয়ে সাহাবায়ে কেরামকে দরূদ শরীফ শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং ওই দরূদ শরীফের সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজন অথবা বিয়োজন বৈধ নয়। আল্লাহ্‌পাক রক্ষা করুন, এমন দুর্মতি যেন কারো না হয়। হানাফী মতাদর্শের গ্রন্থ যখীরা থেকে সংকলিত করে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরকম করা মাকরূহ। কেননা রহিমতা এবং তারাহাম শব্দ দুটি ব্যবহার হয় তিরস্কৃত ব্যক্তির উপর দয়া করার জন্য নিবেদনের ক্ষেত্রে। প্রখ্যাত মোহাদ্দেছ আব্দুল বার বলেছেন, কোনো বর্ণনাতেই একথার উল্লেখ নেই যে, রসুল পাক স. এর নাম উচ্চারণের সময় রহমাতুল্লাহ বলতে হবে। কেননা তিনি বলেছেন, মান ছল্লি আলা। মান তারহীম আলা বলেননি। তারাহহাম শব্দটি কোনো প্রার্থনা সূচক শব্দ নয়। বরং সালাত শব্দটির মধ্যেই রহমত এর অর্থ নিহিত। তবে সালাত শব্দটি রসুল পাক স. এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে। তাই এই শব্দটিকে রূপান্তরিত করা যাবে না। জমহুর ওলামার সমর্থনে কাযী আয়ায অবশ্য এরূপ রূপান্তরের বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কুরতুবীও বলেছেন, এরকম করা বৈধ। কেননা হাদিস শরীফে এর বর্ণনা রয়েছে। তদুপরি তাশাহহুদের মধ্যে বলা হয়েছে আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবী-উ-ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখানে রহমত শব্দটি রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, রসুলপাক

স. নাম উচ্চারণের সংগে সংগে রহমাতুল্লাহ বলা যাবে না। তবে আল্লাহুম্মারহিম ওয়া তারহীম এরকম বলা যাবে।

দরূদ শরীফ পাঠের পর নবী পাক স. যে দোয়া করতেন তাকে বলা হয় দোয়ায়ে মাছুরা। প্রসিদ্ধ দোয়া মাছুরা হজরত আয়শা সিদ্দিকা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ –

হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে এসেছে, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আজাবি জাহান্নাম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী করীম স. কোরআন মজীদের সুরা শিক্ষা দেয়ার মতো এই দোয়াটি শিক্ষা দিতেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন– যা আমি নামাজে পাঠ করতে পারি। রসুল করীম স. তখন বললেন এই দোয়াটি পাঠ করো– আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসী জুলমান কাছিরা ওয়ালা ইয়াগ ফিরুজ জুনূবা ইল্লা আংতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আংতাল গফুরুর রহীম।

হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠের পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে এই দোয়া পড়তেন।

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, তিনি স. এই দোয়া পাঠ করতেন সালাম ফিরানোর পর। এরকম হওয়া সম্ভব যে, তিনি স. এই দোয়া সালাম ফিরানোর আগে এবং পরে উভয় অবস্থায় পাঠ করতেন। এই দোয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য দোয়ায়ে মাছুরায় ক্ষমা প্রার্থনা করা ও জাহান্নামের আযাব এবং দজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, রসুল পাক স. ছিলেন মাসুম ও মাগফুর (নিষ্পাপ ও ক্ষমাপ্রাপ্ত) তবে তিনি এভাবে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করবেন কেনো? এর উত্তর হচ্ছে– তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এরকম করেছেন। অথবা এভাবে প্রার্থনা করেছেন উম্মতের জন্য। নিজের জন্য নয়। তাঁর দোয়ার প্রকৃত অর্থ হবে– আউযুবিকা উম্মাতি। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আমার উম্মতের জন্য তোমার কাছে আশ্রয় যাচ্ঞা করছি। অথবা বিনয় ও বন্দেগী প্রকাশার্থে তিনি এরকম করেছেন। প্রকৃত বান্দার আচরণ এরকমই হয়। তাঁরা নিজেদের মুখাপেক্ষিতা প্রদর্শনকে বন্দেগীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে জানেন। আল্লাহ্পাক অমুখাপেক্ষী। তাঁর নৈকট্যভাজনেরা একথা উত্তমরূপে অবগত বলেই

ভয় ও বিনয় প্রকাশকে নিজেদের জন্য তাঁরা অবধারিত করে নেন। আল্লাহ্পাকের নিষ্পাপ বান্দারা সকল অবস্থায় আল্লাহ্নির্ভর হয়ে থাকেন এবং আশ্রয়প্রার্থীও হন তাঁরই সকাশে। আল্লাহ্ পাকের মহিমা ও অমুখাপেক্ষিতার প্রতি মনোনিবদ্ধ করে ক্ষমা প্রার্থনাকে অবলম্বন করে তাঁরা শান্তি লাভ করেন। আল্লাহ্পাকের প্রিয়ভাজন ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য এরকমই। তারা আল্লাহ্পাকের প্রতাপ ও পরাক্রমের প্রতি আত্মসমর্পণকারী পবিত্র ও নিষ্পাপ বান্দা।

রসুল আকরম স. সকল পবিত্র জনের মধ্যে পবিত্রতম। সকল নিষ্পাপ বন্দার মধ্যে সর্বাধিক নিষ্পাপ। দৃষ্টিগ্রাহ্য ও দৃষ্টির অতীত সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে তাঁর কারণেই। সকলের ক্ষমা তো তাঁরই অনুদান বা সদকা। আর তিনি তো পূর্বাহ্নেই চিরক্ষমাপ্রাপ্ত। তিনি যখন এ ধরনের দোয়া পাঠ করতেন তখন অন্যদেরকে তো এ দোয়া পাঠ করতেই হবে। উত্থাপিত প্রশ্নের আর একটি উত্তর এও হতে পারে যে, তিনি স. আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে এই দোয়া পাঠ করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। যেমন– আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন– ওয়াসতাগ ফির জামবিকা ওয়াল মু'মিনিনা ওয়াল মু'মিনাত। সুতরাং এই এসতেগফার হজরত আদম থেকে শুরু করে সকল নবী, ওলী, আরেফ এবং সালেহগণের আমল হিসাবে পরিগণিত হলো।

তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়া মাছুরা পাঠের পর তিনি ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন। সালাম ফিরানোর সময় পিছন থেকে তাঁর পবিত্র গণ্ডদেশ পরিদৃষ্ট হতো। সালাম বলতেন তিনি এভাবে– আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। সালামের লক্ষ্য থাকতো ফেরশতামণ্ডলী এবং মুসল্লীগণ।

জামাতে ডান দিকে দাঁড়ানোর ফযীলত বেশী। ফযীলতের একটি কারণ এইযে, মেরাজ রজনীতে আল্লাহ্পাকের সন্নিধান লাভের পর অবতরণ করে তিনি স. সর্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করেছিলেন ডান দিকে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের প্রতি। ডানে এবং বামে সালাম ফিরোনো ছিলো নবী পাক স. এর চিরাচরিত অভ্যাস। এ সম্পর্কে পনের জন সাহাবী কর্তৃক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এই মাজহাব অনুসরণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং অন্যান্য ইমামগণ। কিন্তু ইমাম মালেক বলেছেন, সালাম ফিরাতে হবে একদিকে। এ সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে তা কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। তবে রাতের নামাজে তিনি স. এরকম করতেন। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, তিনি স. আমাকে জাগানোর জন্য একটি সালাম করতেন। মোহাদ্দেছগণ বলেছেন, হাদিসটি মুআল্লাল। যদি মুআল্লাল নাও হয়, তবুও এই হাদিস দ্বারা এ কথা অবশ্যই সাব্যস্ত হবে না যে, তিনি স. দ্বিতীয়বার সালাম বলতেন না। হাদিসটিতে দ্বিতীয় সালামের কথা অনুক্ত রয়েছে। এমনও হতে পারে যে, তাঁর দ্বিতীয় সালাম এমন অনুচ্চ ছিলো যাতে কেবল আহলে

বাইতগণের জাগরণ নিশ্চিত হয়। ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, জাগ্রত করার জন্য তিনি একবার উচ্চ স্বরে সালাম করতেন। আরেক বার করতেন অনুচ্চ স্বরে। কেউ কেউ বলেছেন, কেবলা মুখী হওয়া অবস্থায় তিনি সালাম শুরু করতেন এবং শেষ করতেন ডানে এবং বায়ে মুখ ফিরিয়ে। তাঁর বায়ের সালাম হতো অনুচ্চ স্বর বিশিষ্ট। হজরত সাহল ইবনে সা'য়াদ থেকেও এক সালামের বর্ণনা এসেছে। ওই বর্ণনাটিও মোহাদ্দেছগণের সমালোচনার শিকার। আলেমগণ ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, বিষয়টি মুসুল্লিগণের ইচ্ছানির্ভর। তাঁরা দুইবার সালাম করতে পারেন অথবা একবার।

রসুল পাক স. নামাজে বিশেষ করে ফরজ নামাজে এদিক ওদিক তাকাতেন না এবং সাহাবীগণকেও এদিক সেদিক তাকাতে নিষেধ করতেন। এদিক সেদিক তাকানো অর্থ ঘাড় ফিরিয়ে ডানে অথবা বাঁয়ে তাকানো। ঘার না ফিরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে ডানে বামে দৃষ্টিপাত করলে সেই দৃষ্টিপাতকে এদিক সেদিক তাকানো বলা যাবে না। আর নামাজে এরকম করা মাকরূহও নয়। নেহায়া গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। শায়েখ ইবনুল হেমাম বলেছেন, তাকানোর সময় কেবলার দিক থেকে ঘাড় ঘুরে গেলে এদিক সেদিক তাকানো বলে গণ্য হবে এবং এরকম দৃষ্টিপাত মাকরূহ। আর যদি শরীর কেবলার দিক থেকে ঘুরে যায় তবে নামাজ হয়ে যাবে বাতিল। এরকম আমলকে বলে আমলে কাছীর। আর আমলে কাছীর বলে ওই আমলকে যার দ্বারা নামাজ মাকরূহ হয়। আল্লামা শামনী বলেছেন, ঘাড় না ঘুরিয়ে বুক ঘুরালেও নামাজ মাকরূহ হবে। আর বুক সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে ফেললে নামাজ বাতিলই হয়ে যাবে। চোখের কোণ দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে নামাজ মাকরূহ হবে না। তিরমিজি শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, রসুল পাক স. নামাজের মধ্যে চোখের কোণ দিয়ে ডানে বামে দেখতেন। ওলামায়ে কেরাম বলেন, তিনি মুকতাদিগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এরকম করতেন। অথবা এরকম করলে যে নামাজ বাতিল হবে না– সে কথা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি ওরকম করতেন।

হাদিস শরীফে এসেছে, বান্দা যখন নামাজে দণ্ডায়মান হয়, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অলৌকিক ও অতুলনীয় অবয়বের মধ্যেমে তার প্রতি মনোযোগী হন। বান্দা যখন ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকায় এবং গায়রুল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে তখন আল্লাহ্পাক বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সে তো আমার চেয়ে উত্তম নয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি মনোনিবেশ করো। বান্দা দ্বিতীয়বার এরকম করলে আল্লাহ্পাক পুনরায় একথা বলেন। তৃতীয়বার করলে আল্লাহ্পাক তাঁর মহিমান্বিত মনোযোগ তার দিক থেকে ফিরিয়ে নেন। এক হাদিসে এসেছে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাতকারীর নামাজ কোনো নামাজই নয়। তবে রসুল পাক স. এর পৃথিবী বাসের সময়ের একটি ঘটনা প্রশ্নের

উদ্রেক করে। ঘটনাটি এই– একবার রসুল পাক স. এক ব্যক্তিকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য পাহারাদার হিসাবে নিযুক্তি দিলেন। ওই ব্যক্তি অশ্বারোহী হয়ে সারারাত পাহারা দিয়েছিলেন। তখন নামাজ পাঠকালে রসুল আকরম স. ওই পাহারাদারের পথের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ঘটনাটি ঘটেছিলো একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এবং রসুল আকরম স. নফল নামাজ পাঠের সময় ওই পাহারাদারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিলেন। এখানে নফল অর্থ ফরজের অতিরিক্ত যে কোনো নামাজ। সে নামাজ ফজরের সুন্নত নামাজও হতে পারে। জামেউল উসুল কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই নামাজ ছিলো ফরজ নামাজ। কেউ কেউ বলেছেন, ওই নামাজ যদি ফরজ হয় তবে বুঝতে হবে শংকাকুল বিশেষ পরিস্থিতির কারণে রসুল আকরম স. কে ওভাবে দৃষ্টিপাত করতে হয়েছিলো। শংকাকুল পরিস্থিতিতে সঙ্গী সাথীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। নামাজ ইবাদত। আর ওই রক্ষীর প্রতি লক্ষ্য রাখাও ছিলো ইবাদত। জেহাদের ময়দানে এরকম সতর্কদৃষ্টি নিতান্তই সঙ্গত। তাই সমরপ্রান্তরে খওফের নামাজের বিধান দেয়া হয়েছে। হজরত ওমর বলেছেন, আমি নামাজরত অবস্থায় সেনাবাহিনী প্রস্তুত করি। হজরত ওমরের এই বক্তব্যটি রয়েছে বোখারী শরীফের একটি অধ্যায়ে যার শিরোনামটি এরকম– নামাজের মধ্যে পরিকল্পনা করা। ওই অধ্যায়ে আরেকটি হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে এরকম,– একবার রসুল পাক স. নামাজের সালাম ফেরানোর সাথে সাথে ব্যস্তসমস্ত হয়ে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললেন, ঘরে ছিলো কিছু সোনা। নামাজের মধ্যে সেই সোনার কথা মনে হয়েছিলো। আর আমার পছন্দ হচ্ছিলো না যে, ওই সোনা সারারাত আমার ঘরে থাকুক। তাই সে সোনা বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম। আলেমগণ বলেছেন, এধরনের খেয়াল মানুষের প্রকৃতিগত। এখানে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যে সকল অনভিপ্রেত খেয়াল ইবাদত ও আনুগত্যের অনুকূল নয়– তা নিন্দনীয়। নামাজরত অবস্থায় তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেলে দ্রুত নামাজ সমাপ্ত করতেন। নামাজরতা শিশুর মাতার একাগ্রচিত্ততা রক্ষা করতে যেয়েই তিনি এরকম করতেন। তিনি স. কখনও কখনও নামাজ পড়া অবস্থায় ছোট শিশুকে ঘাড়ে উঠিয়ে নিতেন। কোনো কোনো সময় হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন তিনি স. সেজদাবনত হলে তাঁর পিঠে উঠে বসতেন। তখন তাঁর সেজদা হতো দীর্ঘ। নামাজরত অবস্থায় কখনও এমনও হয়েছে যে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা হাজির হয়েছেন, তখন ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে তিনি স. দুই এক পা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর হুজরা শরীফের দরজা কেবলা দেকেই ছিলো। ফলে তাঁকে এদিকে ওদিকে ঘুরতে হতো না। এরকম অনেক ঘটনা রয়েছে হাদিস শরীফে।

আমলে কাছীর

আমলে কাছীর কাকে বলে সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সর্বাধিক পছন্দনীয় মত হচ্ছে, ওই সকল কাজকে আমলে কাছীর বলে যে সকল কাজ করতে দুই হাতের প্রয়োজন হয়। ওই সকল কাজ যদি এক হাতেও করা হয়, তবুও তা আমলে কাছীর হবে এবং এরকম করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন– পাগড়ী বাঁধা, জামা পরিধান করা, লুঙ্গী পরিধান করা ইত্যাদি। আর যে সকল কাজ সাধারণত এক হাতে করা হয়, তা ঘটনাক্রমে দুই হাতে করা হলেও আমলে কাছীর হবে না। হবে আমলে কালীল। এরকম আমল করলে নামাজ বাতিল হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, যে কাজ করলে নামাজরত নয় বলে ধারণা হয় সেই কাজই আমলে কাছীর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নামাজী ব্যক্তি যে কাজকে কাছীর মনে করে সেই কাজই আমলে কাছীর। কেউ বলেছেন কোনো কাজ পর পর তিনবার করলে তা আমলে কাছীর বলে গণ্য হবে। তিনবারের কম করলে হবে আমলে কালীল।

নামাজরত অবস্থায় কেউ রসুল পাক স. কে সালাম করলে তিনি হাতের ইশারায় সালামের জবাব দিতেন। হাত এতটুকু উঠাতেন যাতে হাতের পিঠ উপরের দিকে থাকে। আবার কখনও জবাব দিতেন আঙ্গুলের ইশারায়। এ সম্পর্কে উপরোক্ত দু'রকম বর্ণনাই স্পষ্টরূপে এসেছে হাদিস শরীফে। মাথার ইশারা দ্বারাও তিনি সালামের জবাব দিয়েছেন। তবে আমি অবশ্য তিরমিজি শরীফের একটি হাদিস ছাড়া অন্য কোথাও এরকম দেখিনি। হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. ইশারায় সালামের উত্তর দিতেন। এই ইশারা কি মাথার দ্বারা ইশারা না অন্য কোনোকিছু দ্বারা ইশারা সে কথা স্পষ্টরূপে বলা হয়নি। জামেউল উসুল কিতাবে বর্ণিত হাদিসসমূহে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি স. হাত দ্বারা ইশারা করতেন। কোনো কোনো হাদিসব্যাখ্যাতা মাথা দ্বারা ইশারা করার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে কোনো হাদিস উল্লেখ করেননি। এতে করে বুঝা যায় এরকম হাদিস তারা আদৌ পাননি। আল্লাহ্‌পাকই অধিক অবহিত।

রসুল আকরম স. সালামের জবাব দান ছাড়া নামাজরত অবস্থায় অন্য কোনো কিছুর ইশারা করেছেন কিনা সে সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে তিনি স. সূর্য্যগ্রহণের নামাজ আদায় করছিলেন। লোকজন সমবেত হচ্ছিলো। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, ব্যাপারটা কী? রসুল আকরম স. তখন মাথা দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। এরকম বর্ণনাও রয়েছে যে, তিনি স. নামাজরত অবস্থায় হাতের ইশারায় কাউকে বসতে অথবা ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন। যেমন হজরত জাবের বলেছেন, রসুল আকরম স. আমাকে একবার এক কাজে পাঠালেন।

কাজটি শেষ করে আমি ফিরে এসে দেখি তিনি নামাজ পড়ছেন। আমাকে দেখে তিনি হাত দ্বারা জমিনের দিকে ইশারা করলেন। যার অর্থ বসো–

হজরত উম্মে সালমা তাঁর এক ক্রীতদাসীকে রসুল আকরম স. এর নিকটে একথা জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন যে, আপনি আসরের পর যে দুই রাকাত পড়লেন সে দুই রাকাত কোন নামাজ? ক্রীতদাসী গিয়ে দেখলো, তিনি স. নামাজ পড়ছেন। নামাজরত অবস্থাতেই তিনি স. ইশারায় ক্রীতদাসীকে ধৈর্য ধরতে বললেন। ক্রীতদাসী চুপচাপ বসে রইলো। রসুল আকরম স. নামাজ শেষ করে বললেন, ওই দুই রাকাত নামাজ হচ্ছে জোহরের সুন্নত নামাজ। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধি দল এসে পড়েছিলো, তাই তখন ওই সুন্নত নামাজ পড়তে পারিনি। সেই নামাজই আসরের পর আদায় করেছি।

রসুল আকরম স. প্রথম দিকে নামাজরত অবস্থায় বিভিন্ন রকম ইশারার মাধ্যমে সালামের জবাব দিয়ে থাকতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই বিধানটি রহিত হয়ে যায়। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ বলেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেন, আমরা নামাজ পাঠ অবস্থায় রসুল পাক স. কে সালাম দিতাম। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা আবিসিনিয়ায় হিজরত থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে দেখলাম, রসুলপাক স. নামাজ পড়ছেন। আমরা তাঁকে সালাম করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। নামাজ শেষে আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আগে আমরা সালাম বলতাম আর আপনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই নামাজে মগ্নতা রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তখন বললেন, আল্লাহ্তায়ালা যেমন ইচ্ছা তেমনি বিধান জারী করেন। এখন তাঁর এই হুকুম বলবৎ যে, নামাজের মধ্যে জিকিরে এলাহী ছাড়া আর কোনো কথা বলা যাবে না। এই বিধানের কারণে তিনি নামাজ পাঠ শেষে সালামের জবাব দিতেন না। বর্ণিত হয়েছে, তিনি এমন বিনয়ের সঙ্গে নামাজ আদায় করতেন, যাতে মনে হতো তাঁর শরীরের অভ্যন্তর থেকে ডেকচির ফুটন্ত পানির মতো আওয়াজ নির্গত হচ্ছে। একথার অর্থ, তাঁর বিনয়ের অভিপ্রকাশ ঘটতো গভীর অভ্যন্তর থেকে। এক বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর পবিত্র বক্ষদেশ থেকে চাকা ঘুর্ণনের মতো আওয়াজ শোনা যেতো। ওই আওয়াজ ছিলো অনুচ্চারিত ক্রন্দনের।

হানাফী মাজহাবের ফেকাহর কিতাবে রয়েছে, ক্রন্দন সশব্দ না হওয়া পর্যন্ত নামাজ বাতিল হবে না।

পার্থিব বিপদ মুসিবতের কারণে সজোরে কাঁদলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু আখেরাতের ভয়, ভীতি, আশা, আগ্রহের কারণে সশব্দে ক্রন্দন করলে নামাজ বাতিল হবে না। বরং এরকম ক্রন্দন বিনয় ও একাগ্রচিত্ততার নিদর্শন। এই বিষয়টির দিকে ইংগিত রয়েছে হজরত মুতরিফের বর্ণনায়, যা তিনি বর্ণনা করেছেন

তাঁর পিতা নিকট থেকে। ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আখেরাতের ভয়ে যদি কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সজোরে কাঁদে তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু কান্না নিয়ন্ত্রণের অতীত হলে নামাজ বাতিল হবে না। আল্লামা শামনীও এরকম বলেছেন। রসুল আকরম স. নামাজরত অবস্থায় কখনও কখনও গলা খাঁকারী দিতেন। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে তিনি এরকম করতেন না। তাই ফকিহগণ বলেছেন, বিনা প্রয়োজনে গলা খাঁকারী দিলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। ওজর বশতঃ করলে বাতিল হবে না। আর শরিয়তে গ্রহণযোগ্য ওজর হচ্ছে মানুষ যখন কোনো কাজ করতে নিতান্ত অপারগ হয়, না করলে অস্বস্তি বোধ করে এবং পরিহার করার ক্ষমতা না থাকে। যেমন– হাঁচি ও ঢেকুর। তেমনি গলার স্বরকে পরিষ্কার করার জন্য গলা খাঁকারী দিলেও নামাজ বাতিল হবে না। মোক্তাদী যদি তার ইমামকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে গলা খাঁকারী দেয় এবং যদি তা কোনো অক্ষরের উচ্চারণের মতো হয়ে যায়, তবুও নামাজ বাতিল হবে না। এরকম বলেছেন আল্লামা শামনী। হেদায়া গ্রন্থেও একথা রয়েছে।

রসুল আকদাস স. নামাজের মধ্যে চোখ খোলা রাখতেন। চোখ বন্ধ করে তিনি নামাজ পড়তেন না। হজরত আনাস থেকে বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে জননী আয়েশা একটি রঙ্গিন চিত্র সম্বলিত পর্দা কেবলার দিকের জানালায় ঝুলিয়ে দিয়ে ছিলেন। রসুল আকদাস স. তাঁকে বলেছিলেন পর্দাটি সরিয়ে ফেলো। কারণ পর্দাটির রং ও চিত্র আমার নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। পর্দাটি হয়তো ছিলো অলংকরণ বিশিষ্ট। অথবা চিত্র হারাম হওয়ার পূর্বে তিনি একথা বলেছিলেন। আলেমগণ বলেছেন, ওই পর্দার আড়ালে ছিলো কাপড়ের পুতুল। জননী আয়েশা পুতুল ঢেকে রাখার জন্য পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। যদি তা না হয় তবে পর্দা ঝুলানো নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে আবহারী একথা বলেছেন। মাজমাআল বিহার গ্রন্থে এসেছে, জননী আয়েশা তাঁর পবিত্র প্রকোষ্ঠ বাসর শয্যার মতো সাজিয়ে রাখার জন্য চিত্রিত পর্দা ঝুলিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌পাকই ভালো জানেন।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল আকদাস স. চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করে নামাজ পাঠ করছিলেন। নামাজের মধ্যে সেই চিত্রিত বস্ত্র একাগ্রতা ক্ষুণ্ন করেছিলো। নামাজ শেষে তিনি সেই পোশাক খুলে রেখে বললেন, পোশাকটি আবু জাহাশকে দিয়ে দাও। সে-ই আমাকে এই পোশাকটি হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে। এই পোশাকের পরিবর্তে হাদিয়া হিসাবে তার কম্বলটি নিয়ে এসো। এই চিত্রিত পোশাকের কারুকার্য আমার বিনয়ে ও একাগ্রচিত্ততায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি এরকম করেছিলেন। আল্লাহ্‌পাক অধিক জ্ঞাত।

এক হাদিসে রয়েছে, তিনি সালামের জবাব হাতের ইশারায় দিতেন। তিনি যে নামাজে চোখ খোলা রাখতেন, এই হাদিসটি তার প্রমাণ। এই সমালোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি নামাজে কখনই চোখ বন্ধ করতেন না। আবার এ কথাও সুনির্দিষ্ট হয় না যে, সব সময় তিনি তার দৃষ্টিকে পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতেন। নামাজের সম্পূর্ণ সময়ে তাঁর চোখ বন্ধ থাকতো না এরকম বলাই সমীচীন হবে। কিন্তু হাদিসের প্রকাশ্য মর্মানুযায়ী বুঝা যায়, তিনি নামাজে একেবারেই চোখ বন্ধ করতেন না। আল্লাহ্পাক সমধিক জ্ঞাত।

নামাজ পাঠ অবস্থায় চক্ষু বন্ধ করে রাখা মাকরূহ কি না সে ব্যাপারে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মাজহাবে চক্ষু বন্ধ করা মাকরূহ। তবে কেউ কেউ বলেছেন, চোখ খোলা রাখলে যদি অন্যমনস্কতা আসে, হৃদয় চঞ্চল হয় এবং কেবলার দিকে রক্ষিত কোনো বস্তু যদি একাগ্রচিত্ততার ব্যাঘাত ঘটায়, তবে চক্ষু বন্ধ করে নামাজ পড়লে মাকরূহ হবে না বরং তা হবে মোস্তাহাবের নিকটবর্তী। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন।

নামাজ শেষের জিকির ও দোয়া

তিনি নামাজ শেষে বিভিন্ন জিকির ও দোয়া পাঠ করতেন। হজরত সাওবান বলেছেন, সালাম ফিরানোর পর তিনি তিনবার ইসতেগফার পড়তেন। তারপর পাঠ করতেন এই দোয়া– আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারকতা ইয়া জাল জালালী ওয়াল ইকরম। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন রসুল আকদাস স. নামাজের পর এই দোয় পাঠ পর্যন্ত বসে থাকতেন– আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়ামিন কাস সালাম তাবারকতা ইয়া জাল জালালী ওয়াল ইকরম। উদ্ধৃত হাদিস দু'টি রয়েছে মুসলিম শরীফে। বোখারী শরীফে রয়েছে, হজরত উম্মে সালমা বলেন, রসুল আকদাস স. সালাম ফিরানোর পর ওই অবস্থায় অল্পক্ষণ বসে থাকতেন। আমরা ভাবতাম মেয়েরা যাতে মসজিদ থেকে আগে বের হয়ে যেতে পারে তাই তিনি ওরকম করতেন। নামাজের পর তিনি নামাজের অবস্থায় বেশীক্ষণ বসতেন না। বরং কখনও ডানদিকে কখনও বাম দিকে ফিরে বসতেন। আবার কখনও কখনও বসতেন মুসল্লীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে। তারপর জিকির আজকার, দোয়া ইত্যাদি পাঠ করতেন। আলেমগণ বলেছেন, কোরআন পাকের কোনো আয়াত অবতীর্ণ হলে অথবা নতুন কোনো বিধান প্রচার করতে চাইলে নামাজ শেষে তিনি সাহাবীগণের মুখোমুখী হয়ে বসতেন। নামাজের পর পঠিতব্য অনেক জিকির আজকারও দোয়ার বর্ণনা রয়েছে হাদিস শরীফের বিভিন্ন গ্রন্থে। যেমন– আল্লামা জাওজীর হিসনে হাসিন, ইমাম নববীর আল আজকার ইত্যাদি। ওই সকল দোয়া ও জিকির তিনি যে সবসময় পাঠ করতেন তা নয়। ওই জিকির ও দোয়াগুলো তিনি যখন যেটুকু চাইতেন পাঠ করতেন। ইমাম নববী তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। তিনি ওই

দোয়াগুলো সবসময় পাঠ করাকে অপরিহার্য মনে করতেন না। সাহাবায়ে কেরাম রসুল আকদাস স. কে যখন যে দোয়া পাঠ করতে শুনেছেন, তার উপরে আমল করেছেন এবং সেগুলো বর্ণনাও করেছেন। নফল ও মোস্তাহাব আমলের রীতি এরকমই। কখনও করা হয়। কখনও করা হয় না। কখনও করা হয় কম। আবার কখনও বেশী। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, রসুল আকদাস স. মোস্তাহাব আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেগুলো প্রতিপালনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। কিন্তু সেগুলোকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। আল্লাহ্পাক উত্তম অবহিতির অধিকারী।

এবার তাঁর পঠিত কিছু দোয়া ও জিকিরের উল্লেখ করা হচ্ছে। নামাজের পর তিনি তিনবার পড়তেন, আসতাগ ফিরুল্লাহাল্লাজী লা ইলাহা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়ূম ওয়া আতুবু ইলাইহি। মুসলিম ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, সালাম ফিরানোর পর তিনি তিনবার ইসতেগফার করতেন। শাম দেশের ইমাম আওযায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, ইসতেগফার করতে হবে কীভাবে? তিনি বলেছিলেন, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ্, আসতাগফিরুল্লাহ্। কোনো কোনো মূর্খ নামাজ শেষের ইসতেগফারকে অশোভনীয় মনে করে। তারা বলে, নামাজ শেষে ইসতেগফার করলে এইকথা মনে হতে পারে যে, নামাজটি একটি পাপ কর্ম যার কারণে ইসতেগফার করা হচ্ছে। এই চিন্তাটি বিকৃত ও বাতিল। কোনো কোনো পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় এও বলে থাকে যে, নামাজের পর কলেমা তৌহিদ পড়লে কাফের হয়ে যাবে। তাদের কথা হচ্ছে, নামাজই তার অভ্যন্তরের সকল ক্রটিবিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসাবে যথেষ্ট। তাই আলাদা করে ইসতেগফার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু নামাজ শেষের ইসতেগফারের প্রমাণ রয়েছে হাদিস শরীফে। তাই পথভ্রষ্টদের অমূলক চিন্তা পরিত্যাজ্য।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে তিনি নামাজ শেষে পাঠ করতেন, আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়ামিন কাস সালাম তাবারকতা ইয়া জাল জালালী ওয়াল ইকরম। কোনো কোনো বর্ণনায় মিনকাস সালামের পরে রয়েছে ওয়াইলাইকা দারিস সালাম। মাশায়েখগণের ওজিফার মধ্যে একথাটিও সংযোজিত হয়েছে– ওয়া দাখাল না দারিস সালাম। এই সংযোজনগুলো অবশ্য কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনায় নেই। এ প্রসঙ্গে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাটি করা হলো, তা নেয়া হয়েছে শায়েখ ইবনে হাজার মক্কীর মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে।

রসুল আকদাস স. আরো পাঠ করতেন– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলকো ওয়ালাহুল হামদো ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদির।

এই দোয়ার জারদ শব্দটি উভয় স্থানে পড়তে হবে যবর সহযোগে। শব্দটির অর্থ সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য। শব্দটির অর্থ পিতা অথবা পিতামহও হতে পারে। শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্পাকের সম্মুখে বিত্ত ও বংশ মূল্যহীন।

সফলতা সম্পূর্ণতই পুণ্যকর্ম নির্ভর। কেউ কেউ আবার শব্দটির জিম অক্ষরে যের দিয়ে পড়ে থাকেন। এভাবে পাঠ করলে অর্থ দাড়াবে, আখেরাতের সিদ্ধি লাভ হবে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ ও রহমতের দ্বারা। চেষ্টা ও সাধনা সেখানে অকার্যকর। আলেমগণ বলেছেন, এরকম উচ্চারণ সম্পর্কিত বর্ণনা দুর্বল। শব্দটির যবর দ্বারা পাঠ করাই উত্তম।

রসুল আকদাস স. আরো পাঠ করতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ وَالْحَسْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

ইমাম নববী বলেছেন, সালামের পর যে সব জিকির ও দোয়া পাঠের কথা বলা হলো, সেগুলোর মধ্যে ইসতেগফারই সর্বাগ্রগণ্য। তারপর আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম শেষ পর্যন্ত এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু শেষ পর্যন্ত পাঠ করা উচিত। মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে শায়েখ ইবনে হাজার এরকম বলেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. এ সকল জিকির ও দোয়া উচ্চস্বরে পাঠ করতেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই জিকির ও দোয়া সকল অবস্থায় অনুচ্চস্বরে পাঠ করাই উত্তম। চাই সে ইমাম হোক অথবা একক নামাজী। রসুল আকদাস স. উম্মতকে শিক্ষাদানের জন্য উচ্চস্বরে দোয়া পাঠ করেছেন। তাই ইমাম যদি উচ্চস্বরে পাঠ করার মধ্যেই অধিক কল্যাণ দেখতে পায় অথবা শিক্ষা দেয়াই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তবে উচ্চস্বরে পাঠ করা দূষণীয় নয়। বরং তখন তা হবে মোস্তাহাব।

নামাজের পরে তিনি স. মুআওবিয়াতাইন পাঠ করতেন। বিশুদ্ধ হাদিসে এরকম বলা হয়েছে। মুআওবিয়াত শব্দটি পড়তে হবে ওয়া অক্ষরে যের দিয়ে। কুল আউজুবি রব্বিল ফালাক এবং কুলআউজুবি রব্বিন্নাস সুরা দু'টোকে একত্রে বলা হয় মুআওবিয়াতাইন। কেউ কেউ সুরা দু'টোর সঙ্গে সুরা কাফিরুন ও সুরা এখলাসকেও মিলিয়ে নিয়ে থাকেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এই আয়াতগুলোকেও মুআওবিয়া'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি নামাজের পর দশ বার সুরা এখলাস পড়তেন। তিনি হজরত মুয়াজ বিন জাবালকেও এই দোয়া পাঠ করার উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেছেন, হে মুয়াজ! তোমার জন্য আমি এই দোয়াই পছন্দ করেছি। প্রতি নামাজের পর এই দোয়ার আমল তুমি কখনই পরিত্যাগ কোরো

না। হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ। রসুল আকদাস স. হজরত মুয়াজকে তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে ভালোবাসি। এ ফকির (গ্রন্থকার) এই দোয়া পাঠের বরকত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেনি। এটি একটি বিখ্যাত ওজিফা। এই দোয়াটি পাঠ করতে হয় ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর কারো সাথে কথা না বলে দশ বার ।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, দশ বার পাঠ করতে হবে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর। এই ওজিফা পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখে, পাপ মুছে ফেলে এবং মর্যাদা উন্নত করে।

এক বর্ণনায় রয়েছে ফরজ নামাজের পর প্রসিদ্ধ ওজিফা হচ্ছে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ, তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার এবং একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। মুসলিম এই হাদিসের বর্ণনাকারী। তাঁর অপর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ বার পড়ে একশ' পুরো করতে হবে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, সুবহানাল্লাহ পঁচিশবার, আলহামদুলিল্লাহ পঁচিশবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লহ পঁচিশবার। জামেউল উসুল, নাসাঈ এবং মেশকাত কিতাবে আহমদ ও দারেমীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বলেছেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে প্রত্যেক নামাজে পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন– তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার। এক আনসারী স্বপ্নে দেখলেন, এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে কী রসুল আকদাস স. নামাজ শেষে সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহুআকবার তেত্রিশবার পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন? আনসারী বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, তুমি যদি ওগুলো পঁচিশবার করে পড়ার পর পঁচিশ বার লা ইলাহা ইল্লাহ পাঠ করো তবে উত্তম হয়। সকালে আনসারী উপস্থিত হলেন রসুল আকদাস স. এর দরবারে। তারপর খুলে বললেন স্বপ্নের কথা। রসুল আকদাস স. বললেন, স্বপ্নে যেরকম দেখেছো, সেরকম আমল করো। এভাবে স্বপ্নের সঙ্গে রসুল আকদাস স. এর হুকুম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় এই আমলটিও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বোখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে– সুবহানাল্লাহ দশবার, আলহামদুলিল্লাহ দশবার এবং আল্লাহু আকবার দশ বার। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, সুবহানাল্লাহ এগারবার আলহামদুলিল্লাহ এগারবার, আল্লাহু আকবার এগারবার।

সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার– এই দোয়ার নাম দোয়ায়ে মুয়াক্কাবাত। এই দোয়ার সওয়াব সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে

বোখারী ও মুসলিমে। বলা হয়েছে, নামাজের পর এই দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ্পাক দোয়া পাঠকারীর গোনাহ্সমূহ মাফ করে দিবেন, গোনাহ্ পর্বত পরিমাণ হলেও।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল আকদাস স.এর নিকট দরিদ্র মোহাজিরগণ নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! বিত্তবান মুসলমানেরা তো আমাদের চেয়ে অগ্রগামী। তিনি বললেন, কীভাবে? তাঁরা বললেন, সম্পদশালীরা নামাজ পড়েন, আমরাও নামাজ পড়ি, তাঁরা রোজা রাখেন আমরাও রাখি। কিন্তু তাঁরা দান খয়রাত করেন এবং গোলাম আযাদ করেন কিন্তু আমরাতো তা পারি না। রসুল আকদাস স. বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিবো যা করলে কেউ তোমাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। আমলটি এই– প্রতি নামাজের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার। এই আমলের কথা ধনী সাহাবীগণের কানে পৌঁছলে তাঁরাও এই আমল শুরু করে দিলেন। দরিদ্র মোহাজিরগণ রসুল আকদাস স. সকাশে পুনরায় আরজ করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাদের ধনবান সাথীরাও এই আমল শুরু করে দিয়েছে। এখন আমরা কী করবো? রসুল আকদাস স. বললেন, জালিকা ফাদলিল্লাহি ইউ'তিহি মাইইয়াশাউ (এ হচ্ছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ, আল্লাহ্ পাক যাকে চান তাকে এই অনুগ্রহ প্রদান করেন)। এই হাদিস দ্বারা দরিদ্র পুণ্যবানের উপর কৃতজ্ঞচিত্ত বিত্তবানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, চিন্তিত দরিদ্র সাহাবীকে দেখলে তিনি বলতেন, বিষণ্ন হয়ো না। তোমরা বিত্তাধিকারীদের চেয়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। দারিদ্র হচ্ছে আল্লাহ্পাকের একটি পুরস্কার। দরিদ্র বিশ্বাসীরা হাশর প্রান্তর, হিসাব কিতাব কোথাও আটকা পড়বে না। জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তারাই অগ্রগামী, যদিও ধনী বিশ্বাসীরা অধিক আমলে অভ্যস্ত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, দরিদ্র মোহাজির সাহাবীগণের ক্ষেত্রেই শুধু এই বিশেষ অগ্রগণ্যতা স্বীকৃত। আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন।

রাতে শয্যা গ্রহণের পূর্বে উপরোক্ত ওজিফা সম্পাদন করার ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। তিনি তাঁর প্রিয় কন্যা এবং হজরত আলীকে এই রকম শিক্ষা দিয়েছিলেন। মসনদে ইমাম আহমদ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, হজরত ফাতেমাকে সংসারের সব কাজ নিজ হাতে করতে হতো। তিনি আটা পিসতেন, পানি তুলতেন। এসব করতে করতে তাঁর হাত লাল হয়ে গিয়েছিলো। ঘর ঝাড়ু দেয়ার সময় ধূলাধূসরিত হয়ে যেত শরীরের পরিচ্ছদ। রান্না করতে করতে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল হয়ে গিয়েছিলে বিবর্ণ। একটি ক্রীতদাসী পেলে কিছুটা স্বস্তি মিলবে এই আশা নিয়ে তিনি তাঁর পবিত্র পিতা ও রসুল স. এর গৃহে

গমন করলেন। কিন্তু রসুলপাক স. তখন তাঁর গৃহে ছিলেন না। পিতার দেখা না পেয়ে হজরত ফাতেমা ফিরে এলেন আপন গৃহে।

রসুল আকরম স. ঘরে এসে জানতে পারলেন প্রিয় কন্যার আগমনের কথা। এও জানলেন যে, একটি ক্রীতদাসীর একান্ত প্রয়োজন তাঁর। রসুল পাক স. সঙ্গে সঙ্গে কন্যাগৃহে গমন করলেন। বললেন, তোমার ক্রীতদাসীর প্রয়োজন। কিন্তু এখন তো আমার কাছে কোনো ক্রীতদাসী নেই। কোনো স্থান থেকে যদি পেয়ে যাই, তবে তখন মনে করে দিয়ো। তিনি স. পুনরায় বললেন, প্রিয় কন্যা। পার্থিব কষ্টে বিচলিত হবার কিছু নেই। বরং ইবাদতে মগ্ন থাকতে চেষ্টা করো। তাকওয়া অবলম্বন করো এবং পতির সেবা করে যাও। আমি তোমাকে এমন একটি শিক্ষা দিবো যা পরিচারিকা পাওয়ার চেয়েও উত্তম। আমলটি হচ্ছে এই– প্রতিদিন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করা। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, বোখারী, আবু দাউদ ও তিরমিজী। কোনো কোনো বর্ণনায় উপরোক্ত ওজিফা অগণিত পড়ার কথা রয়েছে। বোখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী এবং হজরত ফাতেমা বলেন, রসুল পাক স. আমাদের দু'জনকে এই ওজিফা করতে বলেছেন। তাঁরা দু'জনে এই ওজিফা নিয়মিত করতেন। হজরত আলী বলেছেন, এই ওজিফা সম্পর্কিত নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে আমি কখনই এ আমল পরিত্যাগ করিনি। কখনও ভুলে গেলে রাতের শেষ প্রহরে এ কথা স্মরণ হওয়া মাত্র আমি এই ওজিফা পড়ে নিতাম।

রসুল আকদাস স. তাঁদেরকে আর একটি ওজিফা শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকো ওলাহুল হামদু ওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। ফজর নামাজের পর এবং মাগরিবের নামাজের পর দশবার করে এই দোয়া পাঠ করতে বলা হয়েছিলো তাঁদেরকে।

প্রসিদ্ধ আর একটি ওজিফা হচ্ছে ফরজ নামাজের পরে আয়তুল কুরসি পাঠ করা। এরকম বর্ণনা করেছেন নাসায়ী। তিবরানী এর সঙ্গে সুরা এখলাস পাঠ করার কথা বলেছেন। অন্যান্য হাফেজে হাদিসগণও এরকম বলেছেন। তবে ইবনে জাওজী অতিরিক্ত পরীক্ষাপ্রবণ হবার কারণে এই হাদিসটিকে বলেছেন মাওজু। তার এই বাড়াবাড়ির কারণে হাফেজে হাদিসগণ এর সমালোচনা করেছেন। মুজামে তিরবানী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠকারী পরবর্তী নামাজ পর্যন্ত আল্লাহ্পাকের নিরাপত্তাধীন থাকে। সাহাবায়ে কেরামের একটি দল এ হাদিসটির বর্ণনাকারী। হজরত আলীও ওই দলে রয়েছেন। মেশকাত শরীফে রয়েছে, হজরত আলী বলেন, আমি রসুল আকদাস স. কে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বলতে শুনেছি, ফরজ নামাজের পর

আয়াতুল কুরসি পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো অন্তরায় নেই। এ কথার অর্থ– মৃত্যুর পর তার জান্নাত প্রবেশ অবধারিত। কেবল মৃত্যুই তার এবং জান্নাতের প্রতিবন্ধক। অন্য কোনো প্রতিবন্ধক তার নেই। শয়নকালে কেউ এই ওজিফা পাঠ করলে আল্লাপাক তার গৃহকে এবং সকল প্রতিবেশীদের গৃহকে এবং গৃহবাসীদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে এই হাদিসটি বর্ণনা কছেন এবং এর সূত্রশৃংখল যে শিথিল– সে কথাও বলেছেন। হজরত আলী বলেছেন, কোরআনের আয়াতসমূহের সর্দার হচ্ছে– আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। আয়াতুল কুরসির ফযীলত সম্পর্কে হজরত আবু হোরায়রা থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বোখারী বলেছেন, ওই হাদিস বিশুদ্ধ হতে পারে অথবা অবিশুদ্ধও হতে পারে।

উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ফরজ নামাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশিত ওজিফাসমূহ পাঠ করতে হবে। এরকম কখনও নয় যে, নামাজের অভ্যন্তরে অথবা নামাজের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় ওজিফাগুলো পাঠ করতে হবে। সালাম ফিরোনোর পর পরই দোয়া ওজিফা পাঠ করার নিয়ম।

একটি প্রশ্নঃ ফরজ নামাজের পর যদি সুন্নতে মোয়াক্কাদা থাকে, তবে তখন কীভাবে দোয়া ও ওজিফাসমূহ পাঠ করতে হবে? তখন তো ফরজ নামাজ সমাপনের পর অতিদ্রুত দাঁড়িয়ে সুন্নত নামাজ শুরু করতে হয়। এ সম্পর্কে ইবনুল হেমাম তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন, ফরজ নামাজের পর দোয়া ও ওজিফা পাঠ করার অর্থ এই নয় যে, সুন্নত নামাজ বিলম্বিত করে দোয়া ও ওজিফা পাঠ করতে হবে। বরং দোয়া ও ওজিফা পাঠের সঠিক সময় হচ্ছে– সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ সমাপনের পর এবং অন্যকাজে ব্যস্ত হবার পূর্বে।

ফজর নামাজের পরের সুন্নত নামাজ সঙ্গে সঙ্গে পড়তে হবে, না কিঞ্চিত বিলম্ব করে পড়লেও চলবে– সে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কিঞ্চিৎ বিলম্ব করে পড়লেও চলবে, আবার কেউ কেউ বলেছেন, ফরজের সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে সুন্নতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। অবশ্য এই অভিমতটি আবু দাউদের মাধ্যমে হজরত আররা'ছা কর্তৃক বর্ণিত ওই হাদিসের পরিপন্থী বলে মনে হয়, যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুল পাক স. এর সঙ্গে তকবিরে উলাসহ নামাজ আদায় করলো এবং ফরজ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্নত নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। হজরত ওমর তখন তার কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে বললেন, বসো, একারণে আহলে কিতাবরা ধ্বংস হয়েছে। তারা ফরজ ও সুন্নতের মধ্যে ব্যবধান রাখতো না। রসুল পাক স. হজরত ওমরের এই কথায় প্রসন্ন হয়েছিলেন। কাজেই কোনো দোয়া বা জিকিরের মাধ্যমে ফরজ ও সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য করা উত্তম। তবে এই পার্থক্য করতে হবে কোনো সংক্ষিপ্ত দোয়া অথবা জিকিরের মাধ্যমে। যে সকল দোয়া এবং জিকির দীর্ঘ সেগুলো পাঠ

করতে হবে সুন্নত নামাজের পর। যে সকল দোয়া সাধারণত মসজিদের মধ্য মানুষ পাঠ করে থাকে যেমন বিভিন্ন তসবিহ বা আয়াতুল কুরসী– এ জাতীয় আমল দ্বারা ফরজ ও সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ রসুল আকরম স. থেকে প্রমাণিত নয়। হুলওয়ানী বলেছেন, তবে এ জাতীয় আমল করাতে দোষেরও কিছু নেই। হুলওয়ানীর মতে এ ধরনের আমল অনুত্তম নয়। খুলাসা কিতাবে বলা হয়েছে, জোহর, মাগরিব ও এশার নামাজে ইমামের সালাম ফিরানোর পর বসে বিলম্ব করা মাকরূহ। কারণ এসকল ওয়াক্তে ফরজের পর সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ রয়েছে। এ সকল ওয়াক্তে অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে ফরজের পর তাড়াতাড়ি দাড়িয়ে সুন্নত আদায় করে নেয়া। আর ফরজ নামাজ যে স্থানে দাঁড়িয়ে পড়া হয়েছে, সেই স্থান থেকে ডানে বামে অথবা সম্মুখে পশ্চাতে কিঞ্চিত সরে গিয়ে সুন্নত নামাজ আদায় করা। ইচ্ছে করলে বাড়ীতে গিয়েও সুন্নত নামাজ পড়া যায় এবং এরকম করাই উত্তম। আর যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজ নেই অর্থাৎ আসর ও ফজরের নামাজের পর কেবলামুখী হয়ে বসে থাকা মাকরূহ নয়। ইমাম ও মোক্তাদী তখন ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারে। ইমাম মোক্তাদীগণের দিক মুখ করে বসেও থাকতে পারেন যদি অসুবিধা না থাকে। তবে জোহর ও মাগরিব এবং এশায় ফরজ শেষে সুন্নত নামাজ পাঠের জন্য আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করাই উত্তম। ইবনুল হেমাম তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মাগরিবের ফরজের পর তাড়াতাড়ি করে সুন্নত পড়তে হবে এ কথা– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর দশ বার পাঠ করার পরিপন্থী নয়। তবে এই দোয়া যত্ন সহকারে তাড়াতাড়ি পাঠ করতে হবে। কিন্তু এ রকম তাড়াতাড়ি পাঠ করা দূরূহ। তাই সুন্নতের পর পাঠ করাই উত্তম। তিনি মাগরিবের সুন্নত নামাজের মধ্যে আয়তুল কুরসী পাঠ করে থাকেন। কিন্তু এরকম করা সুন্নতের খেলাপ। মাগরিবের সুন্নত নামাজে ক্বুল ইয়া আই্উহাল ক্বাফিরুন এবং ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করা সুন্নত।

সেজদায়ে সহু

কথায়, প্রচারে এবং বিধিবিধান বর্ণনায় রসুল আকরম স. এর ভুল ও বিস্মৃতিকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয়। ভুল ও বিস্মৃতিকে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা জায়েয হওয়া না হওয়া সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন, নামাজের ভুল ও বিস্মৃতি। তবে আহলে হকদের নিকট এরকম ভুল বা বিস্মৃতি জায়েয। প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের বিস্মরণ আল্লাহ্পাকের হেকমতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের বিস্মরণ সাধারণ কোনো বিস্মরণ নয়। এর মাধ্যমে উম্মতেরা শরিয়তের বিধি বিধান প্রতিপালন এবং রসুল আকদাস স. এর অনুসরণের সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছে। শরিয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিতি প্রদানই কেবল এর উদ্দেশ্য নয়। কেননা উম্মতেরা ভুল করলে তা সংশোধনের নিয়ম তিনি মৌখিকভাবেও বলে দিতে

পারতেন। যেমন, একথা বলতে পারতেন যে, তোমাদের নামাজের এই ভুল হলে সেজদায়ে সহু করতে হবে। কিন্তু তা না করে তিনি নামাজে নিজেই ভুল করেছেন এবং সোহ্ সেজদার মাধ্যমে তার সংশোধন দেখিয়েছেন। এরকম করার কারণে উম্মতেরাও তাঁর ভুল ও সংশোধনের অনুসরণ করার সুযোগ লাভ করেছেন। তাই রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে– যাতে ভালো কাজের একটি আদর্শ পদ্ধতি আমার দ্বারা প্রস্তুত হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে আমার ও উম্মতের পুণ্য ও পুরস্কার লাভ হয়ে যায়। (আমি পুরস্কৃত হই আদর্শ পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসাবে এবং আমার উম্মতেরা পুরস্কৃত হয় আমার ওই উদ্ভাবনার অনুসারী বা সুন্নত পালনকারী হিসাবে)।

সফরুস সায়াদাত রচয়িতা বলেছেন, রসুল আকদাস স. কে তাঁর পৃথিবীর জীবনে মোট পাঁচবার নামাজে সেজদায় সহু করতে হয়েছিলো। প্রথম সেজদায়ে সহুটি সংগঠিত হয়েছিলো জোহরের নামাজের মধ্যবর্তী তাশাহ্হুদ পড়তে ভুল হওয়ার কারণে। এজন্যই তিনি নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর দুইবার সেজদা করেছিলেন (এই সেজদার নাম সেজদায় সহু)। দ্বিতীয় বিস্মরণটি ঘটেছিলো জোহরের নামাজের সময়েই। তিনি দুই রাকাত পড়ার পর নামাজ শেষ হয়েছে মনে করে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছিলেন। পরক্ষণে স্মরণ হতেই পরের দুই রাকাত নামাজ শেষ করে সেজদায়ে সহু করেছিলেন। যে হাদিসের মাধ্যমে এই বর্ণনাটি এসেছে– সেই হাদিসের নাম হাদিসে জুলইয়াদাইন। জুল ইয়াদাইন এক সাহাবীর নাম। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি কি নামাজ সংক্ষেপ করলেন? নাকি ভুল হয়ে গেলো? তিনি স. বললেন, না সেরকম তো কিছু নয়। রসুল আকরম স. এর কথার অর্থ এই যে, প্রকাশ্যতঃ তোমরা দেখেছো যে আমার ভুল হয়েছে– এ কাজটি আমার ইচ্ছাকৃত ভুল নয়। বরং এ ঘটনাটি হেকমতে এলাহীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমার উম্মত যাতে সেজদায়ে সহু সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। তাই আল্লাহ্পাক আমাকে দিয়ে এরকম করিয়েছেন। সুতরাং এ ঘটনাটি আমার অনুভূতি ও ইচ্ছার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। আল্লাহ্পাকই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে আমার আমলের বদৌলতে সেজদায়ে সহুর আকারে তোমরা আমার অনুসরণ লাভ করে ধন্য হও এবং লাভ করো সওয়াবের অধিকার।

তৃতীয় সেজদায়ে সহুর ক্ষেত্রটি ছিলো এরকম– একদিন রসুল আকরম স. নামাজ এক রাকাত কম পড়ে সালাম ফিরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। হজরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহও তাঁর পিছনে পিছনে বাইরে এসে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি নামাজ এক রাকাত কম পড়েছেন। রসুল পাক স. তৎক্ষণাৎ মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং হজরত বেলালকে একামত দিতে বললেন। তারপর বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলেন এবং বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এই হাদিসের বিবরণে সেজদায় সহু প্রসঙ্গটি অস্পষ্ট।

এর কারণ এ হতে পারে যে, এখানে সেজদায়ে সহু প্রসঙ্গটি মূল উদ্দেশ্য ছিলো না।

ইমাম শাফেয়ীর মতে, সেজদায়ে সহু সুন্নত, ওয়াজিব নয়। শামণি বলেছেন, কোনো কোনো হানাফীর মতেও সেজদায়ে সহু সুন্নত। ইবনুল হেমাম তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে কোনো কোনো হানাফী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সেজদায়ে সহু হানাফীগণের নিকট সুন্নত। আল্লাহ্‌পাকই অধিক অবহিত।

চতুর্থ ঘটনাটি এরকম– একদিন রসুল আকরম স. জোহরের নামাজ এক রাকাত বেশী পড়ে ফেললেন। সাহাবীগণ বললেন, এক রাকাত বেশী হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, কেমন করে? সাহাবীগণ বললেন, আপনি নামাজ পাঁচ রাকাত পড়েছেন। তখন তিনি স. সোহ সেজদা করলেন এবং সালাম ফিরালেন।

পঞ্চম ঘটনা– রসুল আকদাস স. একদিন আসরের নামাজ পড়লেন তিন রাকাত। এরপর প্রবেশ করলেন তাঁর হুজরা শরীফে। পরে তাঁকে যখন একথা বলা হলো, তখন তিনি পুনরায় মসজিদে ফিরে এলেন এবং বাকী এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সেজদা করলেন। এরপর আবার সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলেন। এই হলো তাঁর সারা জীবনের পাঁচ বার সহু করার বিবরণ। মুজতাহিদ ইমামগণ এই পাঁচটি ঘটনাকে অবলম্বন করে গবেষণা করেছেন এবং মাসআলা উদ্ধার করেছেন।

দাউদ জাহেরী ছিলেন আহলে জাওয়াহেরদের ইমাম। তাঁরা কোরআন ও হাদিসের জাহেরী (প্রকাশ্য) অর্থের উপর আমল করে থাকেন। কিয়াস ও ইজতেহাদকে তাঁরা স্বীকার করেন না। সেই দাউদ জাহেরী বলেছেন, পাঁচটি ক্ষেত্রে রসুল আকরম স. সেজদায়ে সোহ করেছেন। ওই পাঁচটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও ভুল হলে সেজদায় সহু করা যাবে না।

উপরোক্ত হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রাসুল আকরম স. সোহ সেজদা করেছেন কখনও সালাম ফিরাবার পূর্বে। কখনও পরে। ইমাম শাফেয়ী সোহ সেজদা করতেন সালামের আগে। তাই সালামের আগে সোহ সেজদার বিবরণ সম্বলিত হাদিসগুলোকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। অথবা তিনি দাবী করেছেন, সালামের পরে সোহ সেজদার বিধান রহিত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা সকল অবস্থায় সালামের পর সোহ সেজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি উল্লেখিত হাদিসগুলো ছাড়া অন্য হাদিসকেও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, যেমন সিহাহ সিত্তা কিতাবে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকদাস স. সালামের পর সোহ সেজদা করতেন। অথবা তিনি দলিল হিসাবে গ্রহণ কছেন ওই হাদিসটিকে যা আবু দাউদ ইবনে মাজা মসনদে ইমাম আহমদ এবং মসনদে আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থে হজরত সাওবান থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি এই–

প্রতিটি সোহ বা ভুলের জন্য সালামের পর দু'টি সেজদা রয়েছে। ফেকাহ শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী ফেলী হাদিস অপেক্ষা কওলি হাদিস অধিকতর প্রাধান্যপূর্ণ। বিশেষ করে দ্বন্দ্ব পরিদৃষ্ট হলে অথবা কিয়াস করার প্রয়োজন দেখা দিলে এই নীতিটি মান্য করতে হয়। এখানে তাই কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সালামের আগে সোহ সেজদা করলে যেহেতু চারটি সেজদা একত্রিত হয়ে যায় তাই সালামের মাধ্যমে সেজদাগুলোকে পৃথক করে নিতে হবে। সোহ সেজদা করতে হবে সালাম ফিরানোর পর। এই অভিমতের প্রবক্তা ছিলেন হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের।

রসুল আকদাস স. কখনও এইরূপ সন্দেহে পতিত হননি যে, তিনি কত রাকাত নামাজ পড়লেন। সন্দেহের স্থলে কোনো দিকে দৃঢ় প্রত্যয় থাকে না। সোহ সেজদার সময় কিন্তু এক দিকেই দৃঢ়তা থাকে। এই বিষয়টি অবশ্য মতানৈক্য দীর্ণ দ্বিধা সন্দেহের ব্যাপার তাই এক ধরনের দোদুল্যমানতা থাকেই। রসুল আকদাস স. এর নামাজের ভুলের কারণ ছিলো মগ্নতা ও তন্ময়তা। অতি মনোনিবেশের কারণে তাঁর এ রকম ভুল হয়েছে। ওই মনোনিবেশের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা দ্বিধা সন্দেহ ছিলো না। কেননা তিনি স. এরশাদ করেছেন, সন্দেহ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তানই মানুষকে দ্বিধা দীর্ণ করে দেয়, যার ফলে এরকম সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, নামাজ আসলে কতো রাকাত হলো। রসুল আকদাস স. এর নামাজ কিন্তু সেই রকম ছিলো না। তাই তিনি তাঁর উম্মতকে এই মর্মে শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, নামাজ তিন রাকাত হয়েছে, না চার রাকাত– এরকম সন্দেহের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি ধারণার উপর বিশ্বাস রেখে নামাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং শেষে সোহু সেজদা করতে হবে। সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে প্রবলতর ধারণার উপর ভিত্তি করে নামাজ সমাধা করতে হবে। কোনো দিকের ধারণা যদি প্রবল না হয়, তবে বিশ্বাসের সংগে একদিককে গ্রহণ করে নামাজ সম্পাদন করতে হবে। এই মাসআলাটির ব্যাপারে কেউ কেউ ইমামে আজমকে দোষারোপ করেছেন এবং বলেছেন, তিনি তাঁর বুদ্ধি বিবেচনার মাধ্যমে হাদিসের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এ কথাটি বুঝতে পারেননি যে, যে কোনো একদিকের ধারণাকে প্রবল বলে ধরে নেয়া শরিয়তের রীতি। যেমন কেবলা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হলে প্রবলতর ধারণা অনুযায়ী কেবলা নির্ধারণ করতে হয়। এই মাসআলাটি তাই বুদ্ধি বিবেচনা এবং ধারণানির্ভর নয় বরং তা শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত। অধিকন্তু বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী পাক স. বলেন, কোনো বিষয়ে সন্দিহান হলে চিন্তা করে একটি দিককে নির্বাচন করতে হবে এবং তার উপর আমল সমাপ্ত করতে হবে।

জামেউল উসুল গ্রন্থে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নামাজে সন্দেহের উদ্রেক হলে চিন্তা করে সঠিক দিকটি নির্ধারণ করতে হবে এবং শেষে উপবিষ্ট অবস্থায় দুটি সেজদা করতে হবে। তিরমিজি বলেছেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে নামাজ পুনরায় পড়তে হবে বলে কোনো কোনো আলেম মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যার সন্দেহ বা দ্বিধা নেই সে যদি প্রথমবার এরকম অবস্থার সম্মুখীন হয়, তবে তাকে পুনরায় নামাজ পড়ে নিতে হবে, নতুবা চিন্তা ভাবনা করে দেখতে হবে। চিন্তা ভাবনা করা সত্ত্বেও যদি কোনো দিকের ধারণা প্রবল না হয়, তবে আকল অনুসারে কাজ করতে হবে। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বলেছেন, চিন্তা ভাবনা ও প্রবলতর ধারণা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। এরকম না করলে সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। আর সন্দেহ অধিক প্রবল হলে নামাজ আদায় করা অসম্ভব। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, নামাজ পুনরায় পড়ার ব্যাপারটি প্রায়যোগ্য নয়। তাই ধারণার প্রাবল্য একদিকে বা উভয় দিকে হলেও যে কোনো একটি দিকের উপর নির্ভর করে নামাজ সম্পাদন করা যাবে।

সেজদায়ে তেলাওয়াত

সেজদায় তেলাওয়াতের বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতনৈক্য রয়েছে। আমাদের ইমামগণের মতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নত। তিনি বলেছেন, সেজদা না করার চেয়ে করা উত্তম। এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে নামাজে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সেজদা ওয়াজিব। নামাজের বাইরে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়। কোরআন মজীদের আয়াত এবং হাদিস শরীফের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেজদায়ে তেলাওয়াত না করা একটি দূষণীয় কর্ম। এই সেজদা আদায় করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে, এই সেজদা নামাজেরই অংশ। এই সেজদার বিধান অত্যন্ত সহজ। নামাজে সেজদার আয়াত পড়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে একটি সেজদা দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। বিষয়টি জানাজার নামাজে দাঁড়ানোর মত সহজ কর্ম। তাই নামাজে কিয়াম করা যেমন ফরজ, তেমনি তেলায়াতে সেজদা করা ফরজ। কিন্তু শরিয়তে এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশ না থাকাতে আমরা একে ওয়াজিব বলে থাকি। যে সকল ইমাম তেলাওয়াতের সেজদাকে ওয়াজিব মনে করেন না, তাঁরা দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিকে যেখানে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. সুরা ওয়ান্‌নাজম পাঠ করতেন। কিন্তু কোনো সেজদা করতেন না। এই হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তেলাওয়াতের সেজদা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয়। তাই এমনও হতে পারে– তিনি স. পরে কখনও ওই সেজদা আদায় করেছেন কিংবা

হয়তো তিনি স. এমন সময় তেলাওয়াত করেছিলেন যখন সেজদা দেয়া ছিলো নিষিদ্ধ। এরকমও হতে পারে যে, তেলাওয়াতের সেজদা বিলম্বে আদায় করা বৈধ– এই মাসআলাটি উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিন স. তাৎক্ষণিকভাবে সেজদা করেননি। আর বর্ণিত হাদিসে কেবল ওয়ান্‌নাজম পড়ার কথা বলা হয়েছে এবং ওই সুরায় তেলওয়াতে সেজদা সম্পর্কে রয়েছে মতভিন্নতা। আল্লাহ্‌পাকই ভালো জানেন।

তেলাওয়াতের সেজদার সময় ওজু থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সকলে একমত। কেবল হজরত ইবনে ওমর থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. ওজু ছাড়াই সেজদা করেছেন। এই মতটি শা'বী ব্যতীত অন্য কোনো আলেম সমর্থন করেননি। বায়হাকী হজরত নাফেয়ের মাধ্যমে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, তাহারাত (পবিত্রতা) ব্যতীত কেউ যেনো তেলাওয়াতের সেজদা না করে। দেখা গেছে বর্ণিত হাদিস দু'টির মধ্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। প্রথমোক্ত হাদিসে বেওজু অবস্থায় সেজদা করার কথা বলা হয়েছে। এ কথার অর্থ কেবল বেগোসল অবস্থায় নয় বরং বেওজু অবস্থায়ও। পরবর্তী হাদিসে বলা হয়েছে স্বাভাবিক পবিত্রতার কথা অর্থাৎ ওজু গোসল ছাড়া সেজদা করা যাবে না। প্রথমটিতে বুঝানো হয়েছে ওজর বা প্রয়োজন সাপেক্ষেতা। এ সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে, ইমাম শা'বী পথ চলার সময় কোরআন তেলাওয়াত শুনলে কেবলা মুখী হওয়া ছাড়াই ওজু অথবা বেওজু সকল অবস্থায় ইশারায় সেজদা আদায় করতেন।

সলফে সালেহীনের কেউ কেউ বলেছেন, তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব নয়। তবে ওই ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে ইচ্ছা করে তেলাওয়াত শুনবে। পথ চলার সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তেলাওয়াত শুনলে শ্রবণকারীর উপর সেজদা ওয়াজিব নয়। কেউ কেউ এরকমও বলেছেন, কোরআন পাঠকারী সেজদা না করলে শ্রবণকারীর উপর সেজদা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেকও এরকম বলেছেন। কেউ কেউ আবার এরকম অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে সেজদার আয়াত পাঠ করলে সেজদা করতে হবে। কোনো ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু আমাদের ইমামগণ এবং জমহুরের অভিমত হচ্ছে, নামাজের তেলাওয়াতকারী এবং শ্রবণকারী সকলের উপর সাধারণভাবে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব। এই অভিমতটি একটি পছন্দনীয় অভিমত।

আমাদের মতে তেলাওয়াতের সেজদা করার পূর্বে ও পরে দু'টি তাকবির বলা মোস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এরকম বর্ণনা রয়েছে। কারো কারো মতে সেজদার পর সালাম ফিরাতে হবে। তবে তাশাহুদ পড়তে হবে এ রকম কেউ বলেননি।

দণ্ডায়মান হওয়ার পর সেজদা করা উত্তম। সেজদা অবস্থায় পড়তে হবে সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা– যেমন নামাজের সেজদায় পড়তে হয়। নামাজ হচ্ছে উত্তম অবস্থা এবং উচ্চতর মাকাম। তাই নামাজের তসবিহও উত্তম ও উচ্চ। নামাজের মধ্যে তেলাওয়াতের সেজদা এসে গেলে সেই সেজদাতেও এই তসবিহ পাঠ করতে হবে। কেননা হানাফী মাজহাবের অনুসারীগণের অভিমত এই যে, নামাজে নির্ধারিত তসবিহ ব্যতীত অন্য কোনো বিশেষ তসবিহ পড়া যায় না। সুতরাং তেলাওয়াতে সেজদায় নামাজের সেজদার তসবিহ পাঠ করাই উত্তম। রসুল পাক স. অবশ্য তেলাওয়াতের সেজদার মধ্যে এই দোয়া পাঠ করতেন।

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِه وَقُوَّتِه –

অর্থঃ আমার অবয়ব ওই মহান সত্তাকে সেজদা করলো যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, নির্দিষ্ট আকৃতি দিয়েছেন, তারপর পরাক্রম ও শক্তিমত্তার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন তার দৃষ্টি ও শ্রুতি।

তিরমিজির, নাসাঈ ও আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. উপরোক্ত দোয়া পাঠ করতেন রাত্রিকালের তেলাওয়াতের সেজদায়। বর্ণনাকারীরা হাদিসটিকে হাসান ও সহিহ বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি স. সেজদায় পড়তেন 'রব্বি ইন্নি জলামতু নাফসী ফাগফিরলি' (হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি আমার সত্তার উপর জুলুম করেছি, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো) কেউ বলেছেন, তিনি স. পাঠ করতেন এই দোয়াটি–

سُبْحَانَ رَبِّنَا وَاِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا –

অর্থঃ আমাদের প্রতিপালকের জন্যই সকল পবিত্রতা। নিশ্চয়ই তাঁর অঙ্গিকার সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেউ আবার বলেছেন, তিনি স. পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْطُطْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَّاكْتَسِبْ بِهَا اَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدِكَ زُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِيِّ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عِنْدِكَ –

অর্থঃ হে আমার আল্লাহ্, এই সেজদার দ্বারা তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। এর মাধ্যমে আমাকে পুরস্কৃত করো এবং এই সেজদা আমার সঞ্চয় হিসাবে তোমার নিকট রেখে দাও। আমার পক্ষ থেকে এই সেজদা তুমি ওইভাবে কবুল করো, যেভাবে তুমি সেজদা কবুল করে থাকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল পাক স. কে বললো, গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি একটি গাছের নিচে বসে নামাজ পড়ছি। যখন আমি সেজদা করলাম, তখন গাছটি আমার সঙ্গে সেজদা করলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারপর রসুল পাক স. সেজদার আয়াত পাঠ করলেন। তারপর উপরোল্লেখিত দোয়াটিও পড়লেন। তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি গরীব।

বোখারী শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল আকদাস স. সুরা ওয়ান্‌নাজম পাঠ করলেন এবং সেজদা করলেন। এই সুরার শেষ আয়াতটি সেজদার আয়াত। সুরাটি সম্পূর্ণ পাঠের পর তিনি যখন সেজদা করলেন তখন মুসলমান, কাফের, জ্বিন, ইনসান সকলে সেজদা করলো। এখানে জ্বিন ইনসান অর্থ ওই মজলিশে উপস্থিত জ্বিন ও মানুষ। পৃথিবীর সকল জ্বিন ও মানুষ নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জ্ঞানীগণ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশেই তিনি স. তেলাওয়াতে সেজদা করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার মহান অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশই ছিলো ওই সেজদার উদ্দেশ্য। যে অনুগ্রহরাজির কথা সুরা ওয়ান্‌নাজমের প্রারম্ভেই রয়েছে। মুসলমানেরা তখন সেজদা করেছিলেন রসুল পাক স. এর অনুসরণের নিমিত্তে। আর কাফের মুশরিকরা সেজদা করেছিলো এই কারণে যে, তারা শুনতে পেয়েছিলো তাদের উপাস্য লাত, মানাত ও উজ্জার নিন্দাবাদ। তাদের সেজদা করার কারণ এও হতে পারে যে, সুরার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার শান শওকত প্রতাপ ও পরাক্রম এবং রসুল আকদাস স. এর মর্যাদা ও মহিমার জটিল বর্ণনা শুনে তারা আর স্থির থাকতে পারেনি। তাই আত্মহারা হয়ে তারা তখন সেজদা করতে বাধ্য হয়েছিলো। তাছাড়া তাদের কেউ কেউ তখন হাতের মুঠোয় মাটি নিয়ে নিজেদের মাথা ও মুখের উপর নিক্ষেপ করছিলো এবং বলছিলো আমাদের নিন্দাবাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

ওই সময় কাফের মুশরিকদের সেজদা করা সম্পর্কে এক নরাধম কুরায়েশ একটি কল্প কাহিনী প্রস্তুত করেছিলো। ঐতিহাসিকেরা আবার সেই কল্পকাহিনীকে নতুনরূপে উপস্থাপন করেছিলো। তাদের বর্ণনাকে ওলামা ও মোহাদ্দেছগণ ভিত্তিহীন বলেছেন। ভিত্তিহীন ওই বর্ণনাটি এরকম– রসুল আকদাস স. লাত ও উজজার নাম উচ্চারণ করার সময় ভুলে তাদের প্রশংসা করলেন এভাবে–

تِلْكَ الْغَرَانِيُّو الْعُلِي وإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجِي –

অসতর্কতা বশতঃ রসুল পাক স. এর মুখে এই কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছিলো। অথবা শয়তান তাঁর কণ্ঠস্বরের অনুসরণে এই কথাগুলো বলেছিলো।

মুশরিকেরা এ কথা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেজদা করে ফেললো। বললো, মোহাম্মদ আমাদের উপাস্যগুলোর প্রশংসা করেছে। সুতরাং এখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো সংঘাত আর রইলো না। আমরাও জানি ও বিশ্বাস করি যে, সৃজন, জীবন ও মৃত্যুদান আল্লাহ্তায়ালারই কাজ। তিনি সকল কিছুর পরিজ্ঞাতা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং সকলের রিজিকদাতা। আর এই প্রতিমাগুলো তো কেবল আমাদের সুপারিশকারী মাত্র। মোহাম্মদ এইমাত্র সে কথা স্বীকার করে নিলেন। সুতরাং তাঁর সাথে আমাদের আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এরপর হজরত জিব্রাইল আবির্ভূত হয়ে রসুল পাক স. কে শয়তানের কারসাজির কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি স. চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ করলেন–

وَمَا اَرسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلاَ نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنيَّ اَلْقَي الشَّيْطَانُ اُمْنِيَّتِه فَيَنْسَخُ اللهَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ اَيَاتُهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ –

জ্ঞানগত এবং উদ্ধৃতিগত উভয় দিক দিয়েই উপরোক্ত বর্ণনাটি বাতিল। এরকম মনগড়া কাহিনী কিছুতেই গ্রহণীয় নয়। আর উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর এরকমও নয়। এই আয়াতের তাফসীরের সঙ্গে উল্লেখিত কাহিনীটির কোনো সম্পর্কই নেই। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবহিত।

সেজদায়ে শোকর

নামাজ ছাড়া অন্য সময় কেবল একটি সেজদা করার বিধান সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে– এরকম সেজদা করা জায়েয কিনা? মাসনুন কিনা? ইবাদত কিনা? এবং এর দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায় কিনা? এসকল প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন, এরকম একক সেজদা বেদাত এবং হারাম। শরিয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জায়েয এবং মাসনুন। কোনো কোনো হানাফী আলেম বলেছেন, জায়েয কিন্তু মাকরূহের সঙ্গে জায়েয। নামাজের বাইরে সেজদা করার কয়েকটি প্রকার রয়েছে। ১. সেজদায়ে সহু– এই সেজদা নামাজের বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত। ২. তেলাওয়াতের সজেদা– এর মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। ৩. মোনাজাতের সেজদা– যা নামাজের পরে করার বিধান রয়েছে। এই সেজদাও মাকরূহ। ৪. সেজদায়ে শোকর– যা করা হয়ে থাকে কোনো নেয়ামত লাভের কারণে অথবা বালা মুসিবত দূর হওয়ার পরক্ষণে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশক এই সেজদা সম্পর্কেই মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শুকরিয়ার সেজদা সুন্নত। ইমাম আহমদ ও ইমাম ইউসুফও এই মতের প্রবক্ত। এ সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের মতে সেজদায়ে শোকর সুন্নত নয় বরং মাকরূহ। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামত সীমাহীন ও অগণিত। মানুষ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অপারগ। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই বাধ্যবাধকতা অভিপ্রেত নয়। একে সুন্নত বা মোস্তাহাবের রূপ দেয়া হলেও নয়। এরকম করার অর্থ আল্লাহ্র বান্দাদেরকে একটি অসম্ভব কাজের নির্দেশ দেয়া। তারা আরো বলেছেন, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যে সেজদার কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ হবে, নামাজের সেজদা। অথবা এরকমও হতে পারে যে, পরবর্তীতে এই বিধানটি রহিত হয়েছে। কিন্তু যারা সেজদায়ে শোকরের পক্ষপাতী তাঁরা বলেছেন, নেয়ামত বলতে সকল নেয়ামতকে বুঝতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং তাৎক্ষণিকভাবে যে নেয়ামত লাভ হয়, সেই নেয়ামতের জন্যই সেজদায়ে শোকর করতে হবে। তাঁরা আরও বলেছেন, সেজদায়ে শোকর অর্থ নামাজের সেজদা নয়। কেননা এই সেজদাকে সেজদায়ে শোকর বলে বিশেষভাবে অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তী খলিফাগণের কেউ কেউ এরকম আমল করেছেন। কাজেই এই বিধানটি রহিত হয়েছে একথা বলা যাবে না।

আরেক ধরনের সেজদার কথা জানা যায়, যার নাম সেজদায়ে তাহিয়্যাত। কোনো কোনো ফেকাহর গ্রন্থে এই সেজদার বিবরণ রয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে গৃহিত নীতি হচ্ছে, সেজদায়ে তাহিয়্যাত মাকরূহ এবং হারাম। মসনদে ইমাম আহমদ, জামে তিরমিজি এবং সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হজরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে এরকম বর্ণনা এসেছে। কোনো বিষয় খুব ভালো লাগলো তিনি স. তাঁর মুখমণ্ডল মাটিতে স্থাপন করে সেজদা করতেন। আল্লাহ্পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থেই তিনি এরকম করতেন। হজরত আনাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। বিশুদ্ধ সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, ইয়েমেন থেকে হজরত আলীর পত্র এলো। ওই পত্রে লিখিত ছিলো, হামাদানের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই সংবাদ জানার সাথে সাথে রসুল পাক স. সেজদায়ে শোকর আদায় করলেন এবং নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য দোয়া করলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে উচ্চারণ করলেন আসসালামু আলাইকুম আলহামাদান। আসসালামু আলা হামাদান।

হজরত আবদুর রাহমান ইবনে আউফ বলেছেন, যখন আল্লাহ্তায়ালা রসুল পাক স. কে সুসংবাদ দিলেন— যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তার উপর দশবার দরূদ প্রেরণ করে। আর যে ব্যক্তি একবার আপনার উপর সালাম প্রেরণ করেন আল্লাহ্পাক তার উপর দশ বার সালাম বর্ষণ করেন। এই নেয়ামত প্রাপ্তির সুসংবাদ শুনে রসুল আকদাস স. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য দুটি সেজদা করেছিলেন। সেজদা দুটি ছিলো সুদীর্ঘ। এতো দীর্ঘ যে মনে হচ্ছিলো যেনো তাঁর আত্মা তাঁর পবিত্র শরীর থেকে সম্পর্কছেদ করেছে। বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকদাস স. একবার এক দুর্বল, অক্ষম এবং পঙ্গু লোককে দেখতে পেয়ে তাঁর নিজের শারীরিক সুস্থতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সেজদায় শোকর

করেছিলেন। বোখারী শরীফে লিপিবদ্ধ হয়েছে, বদর যুদ্ধের সময় যখন অভিশপ্ত আবু জেহেলের কর্তিত মস্তক তাঁর নিকট আনা হলো তখন তিনি শুকরিয়ার সেজদা করেছিলেন এবং বলেছিলেন এই উম্মতের ফেরাউন মৃত্যুবরণ করেছে। এক বর্ণনায় রয়েছে, তখন তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের জীবন যাপন থেকেও সেজদায় শোকরের প্রমাণ রয়েছে। হজরত কায়াব ইবনে মালেক তাঁর তওবা গৃহীত হবার সুসংবাদ পেয়ে শুকরিয়ার সেজদা আদায় করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী এবং স্বনামধন্য কবি, যে তিনজন সাহাবী তবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অলসতা করেছিলেন ওই তিন জনের একজন ছিলেন তিনি। আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁদের তওবা কবুল হবার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ওই সুসংবাদ সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে−

وَعَلَي الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوْا حَتيّٰ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسَهُمْ –

আমিরুল মোমেনিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক মোসায়লেমা কাজ্জাবের নিহত হবার সংবাদ শুনে শুকরিয়া সেজদা করেছিলেন। হজরত আলী শুকরিয়া সেজদা করেছিলেন খারেজিদের নেতা জুচ্ছাদিয়াকে নিহত দেখে। বিভিন্ন গ্রন্থে এই ঘটনাটির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ঘটনাটির সংক্ষেপ বর্ণনা রয়েছে শরহে সফরুস সায়দাত এবং শরাহে মেশকাত গ্রন্থে।

জুমআর নামাজ

জুমআ উচ্চারণটিই প্রসিদ্ধ। আল্লামা সুয়ূতী পড়তেন জামায়া। জুজায পড়েছেন জিমআ। সাত ক্বেরাতে কোরআন মজীদ পড়ার বিধান রয়েছে। সেই বিধান অনুসারে জুমুয়া পড়া যায় আবার জুমআও উচ্চারণ করা যায়।

মূর্খতার যুগে জুমআর দিনকে বলা হতো ইয়াওমিল আরাবা। ইসলামের যুগে এর নাম হয়েছে জুমআ। এই দিনে নামাজের জন্য বিশেষ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাই এর নাম দেয়া হয়েছে ইয়াওমিল জুমআ। ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে এইদিনে বিশেষভাবে ইবাদত করার হুকুম দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তারা ছিলো বিরুদ্ধাচারী। ইহুদীরা শনিবারকে জুমার দিন হিসাবে গ্রহণ করলো। তারা বলতে লাগলো, আল্লাহ্পাক তাঁর সৃষ্টি কর্ম শেষ করে এই দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন কাজেই আমরাও সপ্তাহের ছয়দিন কাজ কর্ম করার পর শনিবার অবসর যাপনের সময় বিশেষ ইবাদতে লিপ্ত হবো। খৃষ্টানেরা বললো, রবিবার হচ্ছে ইবাদত শুরু হবার দিন। তাই রবিবারই বিশেষ ইবাদতের উপযোগী।

অধিকাংশ আলেম এই মতের প্রবক্তা যে, বিশেষভাবে ইবাদত করার জন্য ইহুদী ও নাসারাদেরকে জুমআর নির্দিষ্ট দিনের নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং তাদেরকে বলা হয়েছিলো– তারা যেনো সপ্তাহের যে কোনো একটি দিন বিশেষ ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করে নেয়। ইহুদীরা তাই জুমআর দিন হিসাবে শনিবারকে এবং নাসারা রবিবারকে নির্ধারণ করে নেয়। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীর জুমআর দিন আল্লাহ্পাকই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন, ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ইজা নুদিয়াতিস্ সলাতি মিন ইয়াওমিল জুমআতি ফাসআও ইলা জিকরিল্লাহ (হে ইমানদানগণ! জুমআর দিন যখন নামাজের জন্য আযান দেওয়া হবে তখন তোমরা আল্লাহ্তায়ালার স্মরণে দৌড়ে এসো)। এভাবে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য জুমআর দিনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই তাদেরকে আর নিজস্ব চিন্তাভাবনার পিছনে ছুটতে হয়নি। বস্তুতপক্ষে এই নির্ধারণ আল্লাহ্পাকের এক বিশেষ অনুকম্পা।

আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রথম পিতা হজরত আদম আ. কেও এই জুমআর দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এই দিনটি বিশেষ ইবাদতের দিন হিসাবে ধার্য হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অন্যান্য সৃষ্টিকে আল্লাহ্পাক অস্তিত্ব দান করেছেন সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে। আর হজরত আদম অস্তিত্ব পেয়েছেন শুক্রবারে। তাই সপ্তাহের অন্য দিনের চেয়ে শুক্রবারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অধিক উপযুক্ত।

বোখারী শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, রসুল আকরম স. মদীনায় আগমনের পর একদিন সাহাবা পরিবেষ্টিত অবস্থায় বললেন, ইহুদি এবং খৃষ্টানেরা সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে বিশেষ ইবাদত সম্পাদনার্থে একত্রিত হয়। আমরাও সপ্তাহে একদিন এরকম করবো। সবাই সেদিন একসঙ্গে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ্পাককে বিশেষ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে স্মরণ করবো। জানাবো বিশেষ কৃতজ্ঞতা। রক্ষা করবো ইবাদতের বিশেষ আদব। এরপর তিনি স. সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ওই বিশেষ দিন হিসাবে 'ইয়াওমি আরুবা' (শুক্রবারের প্রাচীন নাম) কে নির্ধারণ করলেন। পরবর্তীতে কোরআন মজীদের আয়াতের মাধ্যমে সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে জুমআর নামাজ ফরজ করা হয়।

হজরত আউস ইবনে অতিস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. বলেছেন, তোমাদের সকল প্রকার দিন অপেক্ষা উত্তম দিন হচ্ছে জুমআর দিন। আরাফা ও ঈদের মতো এই দিবসটিও বিশেষ ফযীলতসম্পন্ন।

আরাফা এবং জুমআর মধ্যে কোন দিবসটি উত্তম সে সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সপ্তাহের দিন হিসাবে জুমআ এবং বৎসরের দিন হিসাবে আরাফা উত্তম। বিষয়টি অবশ্য জটিল এবং চিন্তাসাপেক্ষ।

কদরের রাত্রি উত্তম না জুমআর রাতি– সে সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ বলেছেন, জুমাআর রাত্রিই উত্তম। কেননা তিনি স. ওই রাতেই তাঁর মহান পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর মহিয়সী মাতার গর্ভে আগমন করেছিলেন। এই বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হবে বেলাদাত শরীফের অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ তায়ালা।

এক হাদিসে এসেছে, জুমআর দিবস সকল দিবসের সর্দার। এই দিনেই সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছিলো। হজরত আদম জুমআর দিনে সৃষ্ট হয়েছিলেন। জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন জুমআর দিন। সেখান থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন জুমআর দিনেই এবং তিনি ইন্তেকালও করেছিলেন জুমআর দিন। জুমআর দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। জুমআর দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং জুমআর দিনেই সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে। এ সকল ঘটনার মাধ্যমে জুমআর দিনের গুরুত্ব অনুধাবনীয়। আর হজরত আদম আ. এই দিনে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে পর্দাপণ করেছিলেন– এই ঘটনাটি আল্লাহ্পাকের বিশেষ হেকমত ও রহস্যে আচ্ছন্ন। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

জুমআর দিনের বৈশিষ্ট্য

জুমআর দিনের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য অনেক। একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দার প্রার্থনা গ্রহণ করেন। তখন বান্দা যা চায় তাই পায়। ওই বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তৎপরবর্তী আলেমগণের মধ্যে দু'টি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই মুহূর্তটি কেবল রসুল আকরম স. এর যুগের জন্য নির্ধারিত ছিলো। পরে তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এই অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়।

হজরত আবু হোরায়রাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, জুমআ দিবসে দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্তটি কি উঠিয়ে নেয়া হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, যে এরকম বলবে সে মিথ্যা বলবে। সেই মুহূর্তটি এখনও বিদ্যমান। এই অভিমতটিই বিশুদ্ধ। এ সম্পর্কে আবার মন্তব্য রয়েছে দু'টি। ১. ওই মুহূর্তটি গোপন রাখা হয়েছে। যেমন গোপন রাখা হয়েছে শবে কদরকে রমজানের শেষ দশ দিবসের মধ্যে। ২. ওই মুহূর্তটি কোনো গোপন মুহূর্ত নয়। তবে মুহূর্তটির অবস্থান সম্পর্কে তিরিশেরও অধিক মতামত রয়েছে। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী শরহে বোখারীতে ওই সকল মতামত দাতাদের নাম তাঁদের উপস্থাপিত দলিলসহ উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাগুলি কোনোটি সহিহ কোনোটি জঈফ, কোনোটি মারফু আবার কোনোটি মাওকুফ। শায়েখ আসকালানী বর্ণনাগুলোর সামঞ্জস্য সাধন করেছেন। শরহে সফরুস সায়াদাত গ্রন্থে এগুলোকে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ওগুলোর মধ্যে দু'টি মতামত সর্বাধিক অগ্রগণ্য। ১. সেই মুহূর্তটি হচ্ছে ইমাম

মিম্বারে আরোহণ করার পর থেকে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত। ২. জুমআ দিবসের শেষ অংশ অর্থাৎ আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। এই দু'টি অভিমতের মধ্যে কোনটি অধিকতর প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী সে সম্পর্কে রয়েছে দু'টি বক্তব্য। অধিকাংশ আলেম শেষোক্ত অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন হাদিস ।

সফরুস সায়াদাত প্রণেতা লিখেছেন, সুনানে সাঈদ ইবনে মনসুর গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের একটি দল জুমআর ওই মুহূর্ত সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। অবশেষে নির্ধারিত হলো যে, সেই মুহূর্তটি হচ্ছে দিবা ভাগের শেষ অংশ। তাঁদের সভা শেষ হলো। কিন্তু এই ঐকমত্যের বিরুদ্ধে কেউই কথা বললেন না।

নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমাতুজ জোহরা থেকে বর্ণিত হয়েছে— একবার তিনি তাঁর পরিচারিকাকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, জুমআ দিবসের শেষাংশ উপস্থিত হলে তাঁকে যেনো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। নির্দেশিত সময় সমাগত হলে পরিচারিকা তাঁকে জানিয়ে দিলেন। তখন হজরত ফাতেমা দোয়ায় মশগুল হেয় গেলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, সেই মুহূর্তটি হচ্ছে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জুমআ দিবসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওই দিন রসুল আকরম স. এর উপর দরূদ পাঠ করলে সঙ্গে সঙ্গে কবুল করা হয়। অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই দিনের নামাজ শ্রেষ্ঠ ফরজগুলোর অন্যতম। এই ফরজ অর্থাৎ জুমআর নামাজ সম্পর্কে আলস্য প্রদর্শন করলে অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয় এবং তার ফলে মুনাফিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে (নাউজুবিল্লাহ)।

জুমআর দিন গোসল করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব। এই দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা, মেসওয়াক করা এবং উত্তম পোশাক পরিধান করা মোস্তাহাব। এই মোস্তাহাব অন্যদিনের মোস্তাহাবের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এই দিন মসজিদকে সুবাসিত করাও মোস্তাহাব। একদল আলেম বলেছেন, জুমআর দিন সূর্য মাথার উপর অবস্থান করলেও নফল নামাজ পড়া মাকরূহ নয়। হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, রসুল আকদাস স. ঠিক দুপুরে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। কিন্তু জুমআর দিন এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে। তিনি স. আরো বলেছেন, ঠিক দুপুরে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। কিন্তু জুমআর দিন এরকম করা হয় না। একারণেই সম্ভবত অনেক পাপাচারী জুমআর রাতে এবং দিবসে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে। এই দিন প্রকাশিত হয় আল্লাহ্‌র রহমতের বিশেষ নিদর্শন। অন্যান্য দিনের তুলনায় এই দিনকেই অধিক ইবাদত ও বিনয়ের জন্য পছন্দ করা হয়েছে। সকল মাসের তুলনায় রমজান মাসের মর্যাদা যেরূপ, সেই রূপ জুমআর দিনের মর্যাদা অন্যান্য দিনের তুলনায়। রমজানের শবে কদর যেরকম, জুমআর

দিনের দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্তটিও সেরকম। জুমআর দিন মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুলপাক স. বলেন, জুমআর দিন অন্য সকল দিনের নেতা সদৃশ। আল্লাহ্পাকের নিকট এই দিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার চেয়েও উত্তম।

জুমআর নামাজ পড়ার জন্য পদব্রজে মসজিদে গমন করলে সারা বছর নফল নামাজ ও রোজার সওয়াব পাওয়া যায়। এই দিন ক্ষমা প্রাপ্তির দিন। আকাশ পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত সমগ্র সৃষ্টি জুমআ দিবসকে ভয় করে। কারণ এই দিবসে সংঘটিত হবে কিয়ামত। মানুষ এবং জ্বিন কেবল এই বিষয়ে উদাসীন।

জুমআ দিবসে বিশ্ববাসীগণের আত্মা তাঁদের কবরের সন্নিকটবর্তী হয় এবং তাদের কবর জিয়ারতকারীদেরকে অন্য দিনের তুলনায় বেশী চিনতে পারে। তাই এই দিন কবর জিয়ারত করা অধিক মোস্তাহাব। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, দিবসের প্রথমভাগে জিয়ারতকারীদেরকে কবরবাসীরা অধিক উত্তমরূপে চিনতে পারে। মক্কা ও মদীনাবাসীরা সাধারণতঃ জুমআ দিবসের প্রথমভাগে জিয়ারত করে থাকেন।

অধিকাংশ আলেম বলেন, বিশেষভাবে জুমআর দিন রোজা রাখা মাকরূহ। কারণ এই দিন হচ্ছে আমাদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মাকরূহ নয়। কারণ এই দিনের বিশেষত্ব হচ্ছে ওয়াজ নসিহত করা এবং ওয়াজিব খুতবা শ্রবণের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া।

জুমআর রাতে আলমে আর ওয়াহে বিশ্বাসীদের রূহ একত্রিত হয়। অধিকাংশ আলেমের নিকট জুমআর দিন রোজা রাখা যেরকম মাকরূহ, তেমনি জুমআর রাতে সারারাত জেগে ইবাদত করাও মাকরূহ। এ সম্পর্কে আলেমগণ যে সকল কারণ বর্ণনা করেছেন তা অসম্পূর্ণ। এই মিসকিন (গ্রন্থকার) মনে করে ইবাদত বন্দেগী হওয়া প্রয়োজন নিয়মিত। বিশেষ কোনো সময়কে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা ঠিক নয়। হাদিস শরীফে এসেছে, জুমআর দিনে অথবা নিশীতে মৃত্যুবরণকারী কবরের আযাব থেকে সুরক্ষিত। আল্লামা সুয়ূ্যতী তাঁর জামউল জাওয়াম গ্রন্থে মসনদে ইমাম আহমদ এবং বায়হাকী থেকে এ প্রসঙ্গে হাদিস সংকলন করেছেন। রসুল আকরম স. বলেছেন, জুমআর দিন অথবা রাতে মৃত্যু বরণকারী বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসিনীকে আল্লাহ্পাক অবশ্যই কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আল্লামা শিরাজী তাঁর আলকাব গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর থেকে এবং আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া গ্রন্থে হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, জুমআর দিবসে অথবা নিশীথে মৃত্যুবরণকারী কবরের আযাব থেকে মুক্ত। ওই ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে হাশর প্রান্তরে এমন অবস্থায় উত্থিত হবে, যখন তার হাতে মুদ্রিত থাকবে শহীদের সিলমোহর। এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রতি জুমআর দিনে ছয় হাজার এবং রাতে তিন

হাজার মুসলমানকে ক্ষমা করা হয়ে থাকে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে সকল লোককে ক্ষমা করা হয়ে থাকে।

জুমআ দিবসে মসজিদের দরজায় বসে ফেরেশতাদের দপ্তর। তাঁরা মসজিদে আগমনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। যারা আগে আসেন তাদের নাম আগে এবং যারা পরে আসেন তাদের নাম পরে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইমাম খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করলে ফেরেশতারা তাঁদের দপ্তর বন্ধ করে মসজিদে প্রবেশ করেন। সমবেত মুসল্লির দুই রাকাত নামাজকে তাঁরা হাজার রাকাত নামাজের সতমুল্য করে এবং এক তসবিহকে হাজার তসবির সমান করে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে নিয়ে যান। আরো বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক যখন কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সমস্ত দিন সমূহকে বিশেষ আকারে ওঠাবেন তখন জুমআর দিনগুলোর জুমআর নামাজ আদায়কারীদের সম্মুখে ওঠাবেন আলোকোজ্জ্বল করে। ওই আলোকোজ্জ্বলতা পরিণত হবে একটি আলোকবর্তিকায়। সেই আলোর সাহায্যে পথ চলতে থাকবে জুমআর নামাজ পাঠকারীরা। ওই আলো হবে অতি শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন বরফ সদৃশ। তার সুবাস হবে মেশকের ন্যায়। জুমআ আদায়কারীরা উপবেশন করবেন কর্পুরের পাহাড়ের উপর। জ্বিন ও মানুষ তখন তাদেরকে দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে। অন্যেরা তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না। মিলিত হতে পারবে কেবল ওই মোয়াজ্জিন যিনি কেবল আল্লাহ্র ওয়াস্তে নামাজের জন্য আযান দিয়েছিলেন।

জুমআর আযানের পর ক্রয় বিক্রয় করা হারাম এবং মাকরূহ। আর নামাজের পর ক্রয় বিক্রয় করা মোস্তাহাব। জুমআর দিনের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য। জুমআর দিন ফজরের নামাজে সুরা আলিফ লাম মিম সেজদা এবং সুরা হাল আতা আলাল ইনসান পাঠ করা, জুমআর নামাজে সুরা জুমআ, সুরা মুনাফিকুন অথবা সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা এবং সুরা গাসিয়া, মাগরিবের নামাজে সুরা কুল ইয়া আয়্যিহাল কাফিরূন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এবং এশার নামাজে সুরা জুমআ এবং মুনাফিকুন পাঠ করা মাসনুন। শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীরা এই আমলকে অপরিহার্য মনে করে থাকেন। তাঁরা কখনই এর ব্যতিক্রম করেন না। হানাফী মাজহাবের অনুসারীগণ কোনো সুরাকে কোনো বিশেষ নামাজের জন্য নির্ধারণ করে নেয়াকে মাকরূহ মনে করেন। শায়েখ ইবনুল হেমাম বলেছেন, এরকম করা উচিত নয়। তবে বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে যেহেতু এ বিষয়ে বলা হয়েছে, তাই কখনও কখনও এরকম আমল করা যেতে পারে। বান্দা মিসকিন (গ্রন্থকার) বলেন, একথা সুস্পষ্ট যে, রসুল আকরম স. এধরনের আমল সবসময় করতেন না। কখনও কখনও তিনি এর ব্যতিক্রমও করেছেন। নফল নামাজের ক্ষেত্রে তাঁর রীতি ছিলো এরকমই। হানাফী মাজহাবের রীতিও সেরকমই। তাই অভিমত দেয়া হয়েছে, এ আমল করা যেতে পারে বটে, তবে মাঝে মধ্যে তা বাদ দিতে হবে। আল্লাহ্পাকের অবহিতিই সর্বোত্তম।

জুমআর রজনীতে এবং দিবসে সুরা কাহাফ পাঠ করার ফযীলত সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদিসসমূহে। তিনি স. বলেছেন, জুমআর দিবসে যে ব্যক্তি সুরা কাহাফ পাঠ করতে অভ্যস্ত হবে, সে কিয়ামত দিবসে পাবে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নূর। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তার প্রতি বায়তুল হাকিক থেকে আলো বিচ্ছুরিত হবে, এবং তার সকল সগীরা গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। হাদিসটিতে অবশ্য সগীরা বা কবীরা উল্লেখ না করে কেবল গোনাহ্ মাফের কথা বলা হয়েছে। তবে ওলামায়ে কেরাম এর অর্থ করেছেন সগীরা গোনাহ্ মাফ করা হবে। আল্লাহ্পাকই উত্তম পরিজ্ঞাতা।

আখেরাতে জুমআ দিবসের মর্যাদা

জুমআ দিবস ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই মর্যাদাশীল। জুমআর নামাজ পাঠকারীদের উপর পৃথিবীতে আল্লাহ্ দর্শনের নূর এবং আল্লাহ্পাকের আজমত ও বুজুর্গীর প্রতিচ্ছায়া পতিত হয়। এই অর্জনই আখেরাতে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও দীদার লাভকে নিশ্চিত করবে। ইমাম শাফেয়ী এবং অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। রসুল আকরম স. এরশাদ করেছেন, একটু আগেই আমার কাছে হজরত জিব্রাইল এসেছিলেন। তাঁর কাছে ছিলো একটি শ্বেতশুভ্র দর্পন। ওই দর্পনের কেন্দ্রে ছিলো একটি কালো বিন্দু। আমি বললাম, হে জিব্রাইল! স্বেতশুভ্র দর্পনটি কী? এবং তার মধ্যস্থিত কালো বিন্দুটিই বা কী? হজরত জিব্রাইল বললেন, দর্পনটি হচ্ছে সপ্তাহের সকল দিনের উদাহরণ যা শুভ্রতা ও ঔজ্জল্যের মাধ্যমে বিকশিত। আর এর কেন্দ্রস্থিত কালো বিন্দুটি হচ্ছে জুমআর দিবসের সেই বিশেষ মুহূর্তটির প্রতীক। শাদা কাগজে কালো কালির মর্যাদার মতো। হজরত জিব্রাইল আরো বললেন, আখেরাতে জুমআ দিবসের নাম দেয়া হবে ইয়াওমুল মাজিদ। আমি বললাম, ইয়াওমিল মাজিদ কী? আখেরাতে জুমআ দিবসকে ইয়াওমুল মাজিদ নাম দেয়া হবে কেনো? হজরত জিব্রাইল বললেন, জান্নাতসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাত হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস। জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রস্তুত রাখা হয়েছে একটি বিরাট প্রান্তর। ওই প্রান্তরটির পরিসর সম্পর্কে কেবল আল্লাহ্পাকই অবগত। অন্য কেউ তার সঠিক পরিমাপ জানে না। ওই সুবিশাল প্রান্তরে রয়েছে মেশক আম্বরের পর্বতরাজি। পবর্তগুলোর উচ্চতা পৃথিবী থেকে আকাশের উচ্চতার সমান। হাশর দিবসে যখন (পৃথিবীর সময় অনুসারে) জুমআ দিবসের আগমন ঘটবে তখন আল্লাহ্পাক যেমন ইচ্ছা করবেন, সেই পরিমাণ ফেরেশতা ওই সুবিস্তৃত ময়দানে প্রেরণ করবেন। বিস্তৃত ময়দানের একপাশে থাকবে নূরের মিম্বর। মিম্বরগুলোর পাশে স্বর্ণ, ইয়াকুত এবং জবরজদ নির্মিত আরো অনেক মিম্বর থাকবে। ওগুলোতে উপবেশন করবেন শহীদ ও সিদ্দিকগণ। নূরের মিম্বরগুলোর পশ্চাতে উপবিষ্ট থাকবেন তাঁরা। আর নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবেন নবী ও রসুলগণ। তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয়

এবং মস্তকের কেশপাশ চুম্বন করে আল্লাহ্পাক বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু প্রতিপালক। আমি তোমাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার আজ পূর্ণ করলাম। আমি তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে এসেছি। এখন তোমরা বলো তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের সকল অভিলাষ পূর্ণ করবো। নবী ও রসুলগণ তখন বলবেন, হে আমাদের প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালক! আমরা তোমার সন্তোষ চাই্। আল্লাহ্পাক বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন। যদি অপ্রসন্ন হতাম তবে তোমাদেরকে এই দরবারে অবস্থান করতে দিতাম না। এখন তোমরা এর চেয়ে অধিক কিছু চাও। আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক উচ্চ অনুগ্রহসম্ভার। আমার অনুগ্রহ সীমাহীন ও অগণিত। আর আজ হচ্ছে ইয়াওমুল মাজিদ। তখন সকলে সমস্বরে বলবেন, হে আমাদের প্রিয় পরোয়ারদিগার! আমাদেরকে তোমার অপরূপ অবয়ব দর্শনের সৌভাগ্য দান করো। আমরা তোমার দীদার চাই। তোমাকে দেখে নয়ন পরিতৃপ্ত করতে চাই। এটাই আমাদের চরমতম কামনা। এ ছাড়া আমরা অন্য কিছুই চাই না।

হজরত মুসা আ. বলেছিলেন, 'রব্বি আরেনী উনজুর ইলাইক'— হে প্রভু প্রতিপালক দেখা দাও। আমি তোমাকে দেখবো। আখেরাতে নূরের মিম্বরের অধিকারীরাও এরকম বলবেন এবং সফল হবেন। হজরত মুসা দেখতে চেয়েছিলেন অসময়ে। তাই তখন আল্লাহ্পাক বলেছিলেন, 'লানতারনি' (দেখতে পাবে না)। হজরত মুসা এ কথায় মর্মাহত হয়েছিলেন। আখেরাতেই আসবে দীদারের প্রকৃত লগ্ন। আর ঠিক তখনই আল্লাহ্পাক বলবেন, বলো কি চাও? আজ ইয়াওমুল মাজিদ। আল্লাহ্র প্রেমিকেরা তখন দীদারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। আর আল্লাহ্পাক তাঁর অতুলনীয় দীদার দানে তাদেরকে ধন্য করবেন। এই বিবরণটির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থনা করতে হয় নির্ধারিত সময়ে। নির্ধারিত লগ্নের পূর্বে প্রার্থনা বিফল হতে বাধ্য।

সকল বাতাবরণ অপসারিত হবে তখন। অনুষ্ঠিত হবে অভাবনীয় দীদার। পুনরায় নেমে আসবে যবনিকা। কারণ, জান্নাত চিরকালীন আবাস। নিরবচ্ছিন্ন দীদার ওই চিরস্থায়ী আবাসকেও ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। আল্লাহ্পাকের পরাক্রমের দীর্ঘস্থায়ী আবাসকেও ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। আল্লাহ্পাকের পরাক্রমের দীর্ঘস্থায়ী তাজাল্লী কোনো সৃষ্টির পক্ষে সহনীয় নয়। তাই তিনি তাঁর প্রেমিকদেরকে তাঁর স্থায়ী তাজাল্লীর বহ্নিতে ভস্মীভূত করবেন না। দীদার দানের পর আবার টেনে নিবেন আচ্ছাদন। অচিন্তনীয় রূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত প্রেমিকদেরকে তখন তিনি বলবেন, এখন স্বআবাসে স্থিত হও। এই ঘোষণাটিও তাঁর বান্দাদের প্রতি একটি অনন্য অনুগ্রহ। কারণ আল্লাহ্পাকের সার্বক্ষণিক দীদারে নিমগ্ন থাকা বান্দাদের ক্ষমতাবহির্ভুত। তাই আল্লাহ্পাকের ওই ঘোষণার পর তাঁরা মগ্ন হবেন বেহেশতের নেয়ামতসমূহে। নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করতে

থাকবেন সিফাতের তাজাল্লী। এ কথার অর্থ– ইয়াওমুল মাজিদে হবে আল্লাহ্পাকের জাতের দর্শন এবং অন্য সময় হবে সিফাতের দর্শন। জাতের দর্শনের পর তাঁরা তাদের নির্ধারিত আবাসে প্রত্যাবর্তন করবেন ঠিকই। কিন্তু তাঁরা তখন হবেন দীদার পূর্ব সময়ের চেয়ে আরো অধিক মর্যাদাশালী। তাঁরা তখন হবেন দ্বিগুণ রূপ ও লাবণ্য-সৌন্দর্য ও নূরের অধিকারী। জাতের দীদারের সময় বেহেশতের নারী ও পুরুষেরা কেউ কাউকে দেখতে পাবেন না। কারণ, জাত পাকের নূর তখন তাদের আকারকে দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে দিবেই না। ওই নূরের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে অতিক্রান্ত হয়ে যাবে একটি বিশাল অধ্যায়। তারপর একসময়ে তাঁরা ফিরে পাবেন আপন আপন দৃষ্টিগ্রাহ্যতা। তখন একে অপরকে দেখতে পারবেন এবং চিনতেও পারবেন। তাঁদের সহধর্মিণীগণ তখন বলবেন, আমরা তখন তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের অন্যরূপ। এ রূপ তোমরা কেমন করে পেলে? পুরুষগণ বলবেন, আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলাম আল্লাহ্পাকের অন্তহীন সৌন্দর্যচ্ছটার সংক্ষুব্ধ তরঙ্গে। আমরা পেয়েছি তাঁর অতুলনীয় দীদার।

বর্ণিত অবস্থা সম্পর্কে রসুল আকদাস স. এরশাদ করেছেন, ওই পবিত্র সত্তার শপথ, কোনো সৃষ্টি তাঁকে বেষ্টন অথবা ধারণ করতে পারবে না। তাঁর প্রকৃত রহস্যে উপনীত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে ইয়াওমুল মাজিদে আল্লাহ্পাক যেরকম চাইবেন সেরকম অনির্বচনীয় নিয়মে উন্মোচন করবেন তাঁর আজমত ও জালাল। এ অতুল অবস্থার নামই দীদার। এ বর্ণনার মাধ্যমে এ কথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, দীদারাভিলাষীরা দর্শন করবেন আল্লাহ্পাকের আজমত ও জালালের নূর যা আল্লাহ্পাকের সত্তাজাত– প্রকৃত সত্তা বা জাত নয়। আজমত ও জালাল হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সিফত বা গুণবত্তা। এরকম গুণবত্তার দর্শন পৃথিবীতেও সংঘটিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ইহাতা বা বেষ্টনকে অস্বীকার করা হয়েছে, দর্শনকে অস্বীকার করা হয়নি। আর পৃথিবীতে যে দর্শন সংঘটিত হয় তা হচ্ছে অন্তরদর্শন, চর্ম চক্ষুর দর্শন বা প্রত্যক্ষ দর্শন নয়। মোদ্দাকথা এই যে, প্রকৃত বান্দাগণের সকল প্রকার দর্শনই সত্য। তবে দর্শিত সত্তাকে তাঁরা বেষ্টন ও ধারণ করতে সক্ষম নয়। তাঁদের দুনিয়ার দর্শন অবশ্যই অন্তরের দর্শন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেউ যদি মানুষের শরীর বর্ণ আকৃতি ও রূপ দর্শন করে তবে একথা বলা যাবে না যে, সে ওই মানুষের হকিকত (প্রকৃত সত্তা) দর্শন করেছে। কারণ সে যা কিছু দেখেছে তা হচ্ছে ওই মানুষটির সিফাত বা বৈশিষ্ট্য (গুণবত্তা)। তবে তার ওই দর্শনও এক প্রকার দর্শন, অদর্শন নয়। অতএব বিশ্বাস রাখতে হবে যে, বিশ্বাসীরা আখেরাতে

আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভে ধন্য হবে। আর সেই দর্শন প্রতিভাসিত হবে তাদের প্রকাশ্য দৃষ্টির মাধ্যমেই, যেমন পৃথিবীতে ওই দর্শন বিম্বিত হয়েছিলো অন্তরের আয়নায়। এই বিশ্বাসকে যথেষ্ট জেনে মৌনতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবহিত।

রসুল আকদাস স. বলেছেন, বেহেশতবাসীরা প্রতিটি জুমআর দিবসে উপরে বর্ণিত দর্শনের অবস্থা প্রাপ্ত হবেন। তবে দুই জুমআর মধ্যবর্তী সময় হবে অতিদীর্ঘ। বিশ্বাসীরা জুমআর দিবসকে ভালোবাসে। ভালোবাসে এই কারণে যে, আল্লাহ্পাক তাঁর খায়ের বরকত ফজল ও করম দ্বারা এই দিবসটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এই দিবসটির অনন্যমর্যাদা সম্পর্কে তাঁদের যথাঅবিহিতি থাকবে না। তাই আল্লাহ্পাক তখন তাঁদেরকে বলবেন, বলো কি চাও? আজ ইয়াওমুল মাজিদ। আজ তোমরা যা চাবে তাই পাবে।

রসুল আকদাস স. ইয়াওমুল মাজিদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেই। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তিই জানে না, কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের দৃষ্টির শীতলতার মধ্যে। তা হচ্ছে আপনাপন কৃত আমলের পুরস্কার।

খুতবা

রসুল আকদাস স. খুতবা বা ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরে উপবেশন করলে হজরত বেলাল তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। তখন এই আযানই ছিলো জুমআর নামাজের একমাত্র আযান। এই নিয়মটি জারী ছিলো হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের জামানাতেও। হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় মসজিদে জনসমাগম গেলো বেড়ে। তখন প্রচলন করা হলো আরেকটি আযানের। এই আযান দেয়া হতো মদীনার বাজারে জাওরা নামক স্থান থেকে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর এই আযানের প্রবর্তন করেছিলেন– যা হজরত ওসমানের জামানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, হজরত ওসমানই প্রথম এই আযানের প্রবর্তন করেছিলেন। হজরত ওমরের সময় অবশ্য নামাজের ঘোষণা দেয়ার প্রচলন করা হয়েছিলো। কিন্তু ওই ঘোষণায় আযানের বাক্যাবলী ব্যবহৃত হতো না। পরে প্রচলিত আযানের নাম সানি আযান। আর খতিবের সামনে যে আযান দেয়া হয় তার নাম আযানে আউয়াল (বর্তমানে এর নাম হয়েছে বিপরীত)। একামতকে যদি আযানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে এর নাম হবে আযানে ছালেছ (তৃতীয় আযান)। রসুলপাক স. বলেছেন, দুই আযান (আযান ও একামত) এর সঙ্গে রয়েছে নামাজ। কেউ কেউ বলেছেন, যে আযান শুনলে কেনাবেচা হারাম এবং মসজিদের দিকে দৌড়ে আসা ওয়াজিব– ওই আযান হচ্ছে খতিবের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থার আযান। আর আযানের সঙ্গে নামাজ মিলিত

থাকার কথা বলা হয়েছে ওই আযান প্রসঙ্গে যা খতিবের মিম্বরে উপবেশন করার পর দেয়া হয়। 'ইজা নুদিয়াতিস্‌সলাতি মিন ইয়াওমিল জুমআ' আয়াত দ্বারা ওই আয়াতকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম বলেন, ওই আযান হচ্ছে প্রথম আযান যা মসজিদের বাহিরে দেয়া হয়।

আযান দিতে হবে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পরার পর। প্রথম আযান দেয়া হয় আহবানের জন্য। আর খুতবার পূর্বক্ষণে আযান দেয়া হয় খুতবার প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য। এই আযানের অর্থ হচ্ছে– ইমাম খুতবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত। এখন নিশ্চুপ থাকতে হবে এবং বিরত থাকতে হবে অন্যসকল নামাজ থেকে।

কোনো কোনো দেশে সুন্নত পড়ার জন্য আরেকটি আযান দেয়ার প্রথা রয়েছে। এরকম আযান রসুল পাক স. এর সময় ছিলো না। সাহাবায়ে কেরামের সময়েও ছিলো না। এমনকি পরবর্তী যুগেও ছিলো না। অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এই প্রথাটির প্রচলন নেই। এ ধরনের আযানের আবিষ্কারক কে তাও জানা যায়নি। কখন থেকে এ প্রথা শুরু হয়েছে সে কথার অবগতি লাভও অসম্ভব। কাজেই এই প্রথাটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সুন্নত পড়তে হবে প্রথম আযানের পর এবং খুতবায় মনোনিবেশ করতে হবে দ্বিতীয় আযানের পর।

কোনো কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, মসজিদের বাইরের প্রথম আযানের উদ্ভব ঘটেছিলো বনী উমাইয়াদের আমলে। সত্যাধিষ্ঠিত আলেমগণ বলেছেন, হজরত ওসমান জাওরা নামক স্থানে ওই আযান দেয়ার হুকুম জারী করেছিলেন। পরে হিশাম ইবনে আবদুল মালিক ওই আযানকে স্থানান্তরিত করেছেন মসজিদের অভ্যন্তরে। তবে এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেই মসজিদের বাইরে মানুষকে আহবানের জন্য প্রথম আযানটি প্রচলিত হয়েছিলো। সুতরাং একে বেদাত বলার অবকাশ মাত্র নেই। অবশ্য সলফে সালেহীনের কেউ কেউ একে বেদাত নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাদের এই শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিলো এইযে, রসুল পাক স. এর জামানায় এই আযানটি প্রবর্তিত হয়নি। কিন্তু এই প্রথাকে নিন্দাবাদ করার জন্য তাঁরা এক্ষেত্রে বেদাত শব্দটি লিপিবদ্ধ করেননি। যেমন হজরত ওমর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তারাবীর নামাজের জামাত। তখন বলা হয়েছিলো, এই বেদাতটি কতই না উত্তম। এ সকল বেদাতকে বলা হয় বেদাতে হাসানা। হজরত ওসমান কর্তৃক প্রচলিত নতুন আযান সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য। এই ঐকমত্য হচ্ছে এজমায়ে সুকুতী (মৌন সম্মতিসূচক ঐকমত্য)। তাঁর এই প্রথাকে কেউ অস্বীকার করেছেন– এরকম তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

রসুল আকরম স. ভাষণ প্রদান করতেন উচ্চস্বরে– যাতে করে উপস্থিত জনতা সহজেই তাঁর বক্তব্য শুনতে পারেন। বক্তব্য প্রদানের সময় তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে উদ্ভাসিত হতো আল্লাহ্‌পাকের আজমত ও জালালের নূর। তখন তাঁর চক্ষুদ্বয়

ধারণ করতো রক্তিম বর্ণ। তিনি তাঁর ভাষণে ধর্মের মর্যাদা এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যাতে করে মনে হতো তিনি যুদ্ধাংদেহী সৈন্যদেরকে উজ্জীবিত করছেন। আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও পবিত্র বর্ণনা করার পর তিনি বলতেন, (অতঃপর) সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোত্তম পথপ্রদর্শন হচ্ছে মোহাম্মদ স. এর পথপ্রদর্শন। এর অতিরিক্ত সংযোজনের নাম বেদাত। আর প্রতিটি নতুন সংযোজন স্পষ্টতঃই পথভ্রষ্টতা। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, মুসলিম। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, প্রতিটি পথভ্রষ্টতাই নরকাগত। ভাষণের শুরুতে আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও প্রশস্তি বর্ণনার পর আম্মাবাদ (অতঃপর) বলা সুন্নত। বোখারী শরীফে এ প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। ফতহুল বারী গ্রন্থে আম্মাবাদ কথাটি সর্বপ্রথম কে বলেছেন সে বিষয়ের মতানৈক্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তিবরানী গ্রন্থে হজরত আবু মুসা আশ'আরী থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এ কথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন হজরত দাউদ। শা'বী থেকে মারফু রূপে বর্ণিত হয়েছে, উত্তম ভাষণ হচ্ছে হজরত দাউদের ভাষণ। তাঁর সম্পর্কে কোরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে, আমি তাকে হেকমত দান করেছি। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বপ্রথম যিনি ভাষণ দিয়েছেন তার নাম হচ্ছে ইয়ারুব ইবনে কাহতান। কেউ বলেছেন, কা'ব ইবনে লুওয়াই। আবার কেউ বলেছেন, মুবহান ইবনে ওয়ায়েল। কারো কারো মতে কা'ব ইবনে মায়েদা। তবে একথাটি সুসাব্যস্ত যে, সর্বপ্রথম ভাষণদানকারী হচ্ছেন হজরত দাউদ আ.। উপরোক্ত মতামতগুলোর মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য সাধন করা যেতে পারে যে, হজরত দাউদই ছিলেন সর্বপ্রথম বক্তৃতা প্রদাতা। আর অন্যরা ছিলেন তাঁদের নিজ নিজ যুগে অথবা অঞ্চলে প্রথম বক্তৃতা দানকারী।

বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি স. লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়াতেন। তলোয়ার বা তীর হাতে নিতেন না। কেউ কেউ বলেছেন, সমর প্রান্তরে ভাষণদানের সময় তিনি স. ধনুক বা তলোয়ারে ভর করে দাঁড়াতেন এবং জুআর খুতবার সময় দাঁড়াতেন লাঠির উপর ভর করে। কোনো কোনো হানাফী ফেকাহ গ্রন্থে রয়েছে, তলোয়ার বা লাঠিতে ভর করে দাঁড়ানো মাকরূহ। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে মাকরূহ নয়। কেননা এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এরকম করা সুন্নত। কেউ কেউ বলেছেন, যুদ্ধের মাধ্যমে যে শহর জয় করা হয়েছে (যেমন মক্কা মোয়াজ্জমা), সে সকল স্থানে তিনি স. অস্ত্রের উপর ভর করে বক্তব্য প্রদান করতেন। আর যে শহর বিজিত হয়েছে সন্ধির মাধ্যমে সেই শহরে তিনি ভাষণ দিতেন লাঠিতে ভর করে। হানাফী মাজহাব অনুসারে লাঠির উপর ভর করে খুতবা দেয়া সুন্নত। সফরুস সায়াদাত প্রণেতা বলেছেন, মিম্বর প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে তিনি বক্তব্য প্রদানের সময় লাঠি ব্যবহার করতেন। তবে মিম্বর প্রস্তুত হওয়ার পর তিনি লাঠি ব্যবহার করতেন, না ধনুক ব্যবহার করতেন– সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবহিত।

রসুল আকদাস স. তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতেন সংক্ষেপে। দুই রাকাত নামাজ পড়তে যে সময় ব্যয় হয় তার চেয়েও কম সময়ে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করতেন। ভাষণের চেয়ে তাঁর নামাজ ছিলো দীর্ঘ। মুসলিম ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, রসুল পাক স. তাঁর নামাজকে সুদীর্ঘ করতেন না। আবার অতি সংক্ষিপ্তও করতেন না। আবু দাাউদের বর্ণনায় এসেছে, তাঁর নামাজ ও খুতবা ছিলো মধ্যম প্রকৃতির (প্রলম্বিত কিংবা হ্রস্ব নয়)। এ প্রসঙ্গে তিনি স. বলেছেন, খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং নামাজ তদপেক্ষা প্রলম্বিত হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয়বাহী। একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দুই চার কথা বলেই তিনি স. তাঁর বক্তব্য শেষ করতেন। বরং তিনি ছিলেন জামে কালামের (নির্যাসপূর্ণ বাণীর) অধিকারী এবং সূক্ষ্ম প্রজ্ঞাসম্পন্ন। প্রত্যেকের উচিত তাঁর উপসনারীতি ও আদর্শের অনুসারী হওয়ার চেষ্টা করা। তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈভবে আপনাকে সুসজ্জিত করা। তিনি স. বলেছেন, কথা নয় কাজই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সকল কাজেই রয়েছে উম্মতের জন্য শিক্ষা। সেই শিক্ষাকে গুরুত্বশীল করার কথাই তিনি বলতেন তাঁর বক্তব্যে।

ইমাম আবু হানিফার মতে, খুতবার ফরজ আদায় হওয়ার জন্যে আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ অথবা সুবহানাল্লাহ পরিমাণ বলাই যথেষ্ট। এর অধিক হলে তা হবে সুন্নত এবং মোস্তাহাব। তাঁর যুক্তি হচ্ছে– কোরআন মজীদে বলা হচ্ছে "আল্লাহ্তায়ালার জিকিরের দিকে দৌড়ে এসো।" একথার অর্থ– খুতবা শ্রবণ করো। আর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লিল্লাহ ইত্যাদি শব্দ জিকিরে ইলাহী হিসাবে গণ্য। তাছাড়া হজরত ওসমানের আমল ছিলো, তিনি আলহামদুল্লিল্লাহ বলে খুতবা সমাপ্ত করতেন। উপরোক্ত মতের পক্ষে এতটুকু দলিলই যথেষ্ট। হেদায়া গ্রন্থে এ রকম উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনুল হেমাম তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন, হজরত ওসমান যে এরকম করতেন সে কথা হাদিস শরীফের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই। কোনো কোনো ফেকাহ গ্রন্থে অবশ্য এরকম বলা হয়েছে।

রসুল আকরম স. মসজিদে প্রবেশ করে উপস্থিত জনতাকে সালাম বলতেন। মিম্বরে আরোহণের পর জনতার মুখোমুখি হয়ে পুনরায় সালাম বলতেন। এরপর তিনি মিম্বরে উপবেশন করতেন। খুতবা প্রদানের পূর্বে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে তা পূরণ করতেন অথবা কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তার জবাব দিতেন। শিশু ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন তাঁর দিকে আসার চেষ্টা করছে দেখলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে গিয়ে তাদেরকে উঠিয়ে আনতেন।

একদিন একলোক ধর্ম সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করে বসলো। তিনি স. মিম্বার থেকে অবতরণ করে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেন। পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করে তার ভাষণ শেষ করলেন। মিম্বরে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত কেউ এলে তিনি স. উপস্থিত জনতাকে দান খয়রাত করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজেও সাধ্যমত বস্ত্র অথবা নগদ অর্থ দান করতেন। ভাষণ দানের সময় ভাষণ

স্থগিত রেখে এরকম কিছু করা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এধরনের কাজ কেবল তাঁর জন্যে শোভনীয় ছিলো। অন্যদের জন্যে খুতবার সময় এ সকল কাজ করা বৈধ নয়। আল্লাহ্পাকই অধিক অবগত।

মুসল্লীরা সবাই উপস্থিত হলে তিনি স. তাঁর হুজরা শরীফ থেকে বের হতেন এবং মিম্বরে গিয়ে বসতেন। আর তিনি আগে থেকে মসজিদে উপস্থিত থাকলে নামাজের কাতার থেকে উঠে গিয়ে মিম্বরে গিয়ে বসতেন। মিম্বরের দিকে গমনের সময় তাঁর অগ্রভাগে কোনো খাদেম থাকতো না। ইমাম মিম্বরের দিকে গমনকালে কোনো খাদেম বা ঘোষক থাকার রেওয়াজ পরবর্তী কালে শুরু হয়েছে। রসুল পাক স. এর সময়ে এ রকম কেউ থাকতো না। "সরে দাঁড়ান খতিব আসছেন"– এরকম কথাও তখন কেউ বলতো না।

সফরুছ সায়াদাত রচয়িতা বলেছেন, চাদর, রুমাল এবং কালো পোশাক রসুল পাক স. সাধারণত ব্যবহার করতেন না। মেশকাত শরীফে উদ্ধৃত মুসলিম বর্ণিত হজরত আমর ইবনে হারেসের হাদিসে রয়েছে রসুল আকরম স. যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর পবিত্র মস্তকে কালো পাগড়ী থাকতো। সেই পাগড়ীর পুচ্ছ ঝুলতে থাকতো দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থলে। এ কারণেই জুমআর দিন কালো পাগড়ী ব্যবহার করা মোস্তাহাব। তবে হানাফি মাযহাবের মত হচ্ছে সব সময় কালো পাগড়ি ব্যবহার করা মোস্তাহাব। তিনি স. তাঁর ভাষণের সময় নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দিতেন এবং মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য শুনতে বলতেন। এরশাদ করতেন, ইমামের বক্তৃতার সময় যে কথাবার্তা বলে সে ওই গর্দভের ন্যায়, যার পৃষ্ঠদেশে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কিতাবের বোঝা। এ কথার মাধ্যমে ইঙ্গিত থাকতো কোরআন মজীদের ওই আয়াতের প্রতি যেখানে বলা হয়েছে এদের (ইহুদীদের) উদাহরণ হচ্ছে গর্দভের মতো যারা কেবল বহন করে কিতাবের ভার"। ইহুদীরা খুতবার সময় কথাবর্তা বলতো। তাদের আলেমেরাও ছিলো বেআমল। তারা কেবল গাধার মতো কিতাবের ভার বহন করতো। কিতাবের দ্বারা কোনো উপকার লাভ করতে পারতো না। রসুল আকরম স. বলেছেন, জুতআর বক্তৃতার সময় 'বসে পড়ো' অথবা 'চুপ করো' এরকম যে বলে– সেও অনর্থক কথা বলে। এর রকম কথা হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। তিনি স. আরো বলেছেন, জুমআর বক্তৃার সময় 'বসে পড়ো' অথবা 'চুপ করো' এরকম যে বলে– সে-ও অনর্থক কথা বলে। এরকম কথা হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। তিনি স. আরো বলেছেন, জুমআর বক্তৃতার সময় যে অনর্থক কথা বলে তার জুমআ হয় না। অভিধান গ্রন্থে অনর্থক কথাবার্তাকে বলা হচ্ছে 'লগব'। খুতবার সময় লগব নিষিদ্ধ।

অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে খুতবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফাও এ অভিমত প্রদাতাদের মধ্যে একজন। ইমাম মালেকও এরকম

বলেছেন। কারো কারো মতে, খুতবার সময় চুপ থাকা মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ীও এই অভিমত পোষণকারী। মাওহয়াবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে রয়েছে, এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী থেকে দু'টি অভিমতের সন্ধান পাওয়া যায়। ইমাম আহমদেরও এ সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে। তিনি বলেছেন, ইবনে আবদুল বার কর্তৃক সংকলিত হয়েছে যে, জুমআর বক্তৃতার সময় মৌন থাকা সম্পর্কে তাবেয়ীগণের ঐকমত্য রয়েছে। তবে এ ঐকমত্য পোষণকারী তাবেয়ীগণের সংখ্যা বেশী নয়।

খুতবার সময় সালাম কিংবা হাঁচির জবাব দেয়া যাবে কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণের মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ এ রকম করাকে মাকরূহ বলেছেন। আবার কেউ কেউ জবাব দেয়ার অবকাশ রেখেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ইমাম বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে গমনের সময় থেকে জুমআর নামাজ শেষ করা পর্যন্ত অন্য কোনো নামাজ পড়া বা কথাবার্তা বলা হারাম। যদি তখন কেউ নামাজরত অবস্থায় থাকে তবে তাকে সংক্ষেপে দু'রাকাতের মধ্যে নামাজ শেষ করতে হবে। সাহেবাঈনের অভিমত হচ্ছে, ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে ইমামের মিম্বরের দিকে গমনের সময় ভাষণ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত এবং ভাষণ শেষে নামাজের তাকবির বলার পূর্ব পর্যন্ত কথা বললে কোনো দোষ হবে না। কেননা এ সময়ে শ্রবণ করার কিছু নেই। কিন্তু নামাজের অবস্থাটি অবশ্যই এর ব্যতিক্রম। নামাজ শেষ করতে সময় লাগে। তাই নামাজরত ব্যক্তিকে ভাষণ শুরু হয়ে গেলেও নামাজ শেষ করতে হয়। আর ভাষণ শুরু হয়ে যাওয়ার পর কাজা নামাজও আদায় করা যাবে না। এরকম করা মাকরুহ নয়, বরং জায়েয।

দূরে উপবিষ্ট মুসল্লি যিনি ইমামের খুতবা শুনতে পান না তার পক্ষেও নিশ্চুপ থাকা জরুরী কিনা সে সম্পর্কে মতপৃথকতা রয়েছে। তবে এরকম ক্ষেত্রে চুপচাপ থাকাই উত্তম। পরবর্তী সময়ের কোনো কোনো আলেম বলেছেন, দূরবর্তীদের জন্য জিকির ও তসবিহ তাহলিলে লিপ্ত থাকাই উত্তম। ইমাম যদি তার বক্তব্যে সমকালীন রাজা বাদশাহ্‌র প্রশংসা করে, সেক্ষেত্রেও জিকির তসবিহ পাঠ করা ভালো। শরহে ইবনুল হিমাম গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, খুতবার সময় কথা বলা হারাম– যদিও তা সদুপদেশ হয় কিংবা তসবিহ তাহলিল হয়। পানাহার করা এবং কোনো কিছু লিখাও হারাম। আর সালাম ও হাঁচির জবাব দেয়া মাকরূহ। ইমাম আবু ইউসুফের এক বর্ণনানুসারে মাকরূহ নয়। আর খুতবার সময় দরূদ পাঠ করতে চাইলে মনে মনে পাঠ করতে হবে। যাতে করে খুতবা শ্রবণে বিঘ্ন না হয়। হাঁচির জবাবও মনে মনে দেয়া উচিত। হাত বা চোখের ইশারায় কোনো কিছু নিষেধ করা হলে মাকরূহ হবে না। লিখিত কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং কলম দ্বারা কোনো কিছু লেখাতে সংশোধন করা মাকরূহ নয় বলে ইমাম আবু ইউসুফের একটি বর্ণনায় রয়েছে।

রসুল আকদাস স. জুমআর নামাজের প্রথম রাকাতে সুরা জুম আ এবং দ্বিতীয় রাখাতে সুরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন। কখনও কখনও পাঠ করতেন সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতকা হাদিসুল গাসিয়া। দুই ঈদের নামাজে তিনি এরকম পাঠ করতেন। ঈদের নামাজ জুমআর দিনে অনুষ্ঠিত হলে ঈদ ও জুমআ উভয় নামাজে তিনি উক্ত সুরাসমূহ পাঠ করতেন।

তাহাজ্জুদের নামাজ

তাহাজ্জুদ শব্দটি এসেছে হুজুদ থেকে। হুজুদ অর্থ নিদ্রা। আর তাহাজ্জুদের অর্থ নিদ্রা পরিত্যাগ করা। এক্ষেত্রে তাহাজ্জুদের অর্থ হবে নিদ্রাভঙ্গের পর বিনিদ্র রজনী যাপন করা। কেননা ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ করতে হয়। এই নামাজ রসুল আকদাস স. এর উপর ওয়াজিব ছিলো না সুন্নত ছিলো– সে সম্পর্কে মতপৃথকতা রয়েছে। ওয়াজিব ও সুন্নত উভয় অভিমতের প্রবক্তাগণ ফাতাহাজ্জাদবিহি নাফিলাতাল্লাক– এই আয়াতকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যাঁরা এ নামাজকে সুন্নত বলেন, তাঁরা নাফিলা শব্দটির অর্থ করেন নফল অর্থাৎ অতিরিক্ত। আর যাঁরা ওয়াজিব বলেন, তাঁরাও নাফিলা শব্দটির অর্থ করেন 'অতিরিক্ত', কিন্তু তাঁরা 'অতিরিক্ত' শব্দটি প্রয়োগ করেন এভাবে– ওয়াজিবের উপর আরো অতিরিক্ত কিছু ওয়াজিব। তাঁদের মতে নাফিলা যদি কেবলই নফল হতো তবে আল্লাহ্পাক 'আপনার জন্য নফল' এরকম বলতেন না। কারণ নফল কেবল রসুল আকদাস স. এর জন্য নির্ধারিত নয়। অন্যদের জন্যও নফলের সুযোগ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, নাফিলা অর্থ মর্যাদার অতিরিক্ততা। তিনি স. মাগফুর ও মাসুম (ক্ষমাকৃত ও নিষ্পাপ)। কাজেই তাহাজ্জুদের নামাজ দ্বারা তাঁর ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রসঙ্গটি অকল্পনীয়। তাই বুঝতে হবে এখানে নাফিলা শব্দটি মাধ্যমে তাঁর মর্যাদার প্রতুলতাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর এই সমুচ্চ বিশেষত্বটি কেবল তাঁর জন্যই সুনির্দিষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্যদের বেলায় এই নামাজ হচ্ছে গোনাহ্ মাফের অসিলা।

তিনি স. কোনো অবস্থাতেই কিয়ামে লাইল বা তাহাজ্জুদের নামাজ পরিত্যাগ করতেন না। ভ্রমণে, আপন আবাসে– সকল সময়েই তিনি তাহাজ্জুদের নামাজের হেফাজত করতেন। অসুস্থতার কারণে অথবা অপ্রতিরোধ্য তন্দ্রালুতার কারণে তাহাজ্জুদের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তিনি দ্বিপ্রহরের পূর্বেই বরো রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন। তাঁর এই আচরণটিও তাহাজ্জুদ ওয়াজিব হওয়ার একটি দলিল। এই নামাজে তিনি দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকতেন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পবিত্র পদযুগল ফুলে যেতো। জননী আয়েশার হাদিসে রয়েছে, তখন তাঁর মোবারক কদম ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো। কোনো কোনো মোফাসসির

আলিমা আল্লান তুহসুহু ফাতাবা আলাইকুম– এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ ওয়াজিব। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল পাক স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ এক বছর ধরে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েছেন। পরে বর্ণিত আয়াতটির বিধান রহিত করে দেয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, এই বিধানটি কি রসুল পাক স. সহ সকল উম্মতের জন্য রহিত হয়েছে, না রহিত হয়েছে কেবল উম্মতের জন্য। তিনি স. কি তবে এই রহিত বিধানের ব্যতিক্রম? আল্লাহ্পাকই উত্তম পরিজ্ঞাতা।

আলেমগণ বলেছেন, তিনি স. রাতে তেরো রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। দুই দুই রাকাত করে দশ রাকাত এবং বিতির তিন রাকাত। কেউ কেউ বলেছেন, বিতির এক রাকাত। আমাদের মাজহাবের বিধান হচ্ছে বিতিরের রাকাত সংখ্যা তিন। আর শাফেয়ী মাজহাবের বিধান হচ্ছে বিতির নামাজ এক রাকাতবিশিষ্ট। আর এই নামাজ পড়তে হবে এভাবে– পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে তারপর এক রাকাত বিতির পড়তে হবে। ইমাম আহমদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, অধিকাংশ এবং সুদৃঢ় সূত্রসম্বলিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বিতির নামাজ এক রাকাতবিশিষ্ট। আমিও এই অভিমতেরই প্রবক্তা। তিনি আরো বলেছেন, দুই রাকাত নামাজ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে। তারপর এক রাকাত বিতির পড়তে হবে। দুই রাকাতের পর সালাম না ফিরালে নামাজ তিন রাকাতই হয়ে যাবে। আর আমার মনে হয় এরকম করলেও কোনো ক্ষতি হবে না। সফরুস সায়াদাত গ্রন্থে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে, বিতির নামাজ যদি এক রাকাতের বেশী না হয় তবে তিন রাকাতের চেয়ে কমও হবে না। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন।

এক রাকাতের প্রবক্তারা বিতির পড়েন এভাবে– প্রথমে দুই রাকাত পড়ে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে নেন, তারপর এক রাকাত আদায় করেন। আর তিন রাকাতের প্রবক্তারা দুই রাকাতের পর সালাম না ফিরিয়ে এক সঙ্গে মিলিয়ে তিন রাকাত আদায়ের পর সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করেন। স্মতর্ব্য যে, হাদিস শরীফে এক রাকাত নামাজ পড়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, আগের দুই রাকাত না পড়ে শুধু এক রাকাত পড়লে এই নিষেধাজ্ঞাটি প্রযোজ্য হবে। প্রথমে দুই রাকাত নামাজ পড়ার পর যে এক রাকাত নামাজ পড়া হয় তা আসলে স্বতন্ত্র কোনো নামাজ নয়।

কোনো কোনো মোহাদ্দেছ বলেছেন, রসুল আকদাস স. এর কিয়ামে লাইল নামাজ এগারো রাকাতের অধিক হতো না। তবে তেরো রাকাতের বর্ণনাও বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত। তবে এই গণনায় ফজরের দুই রাকাত সুন্নতকেও ধরা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামে লাইল এগারো, তার সাথে ফজরের সুন্নত দুই– এই মিলে তেরো।

কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, ফজরের সুন্নত ব্যতিরেকেই কিয়ামে লাইলের নামাজের রাকাত সংখ্যা ছিলো তেরো। এরকম দুষ্প্রাপ্য বর্ণনাও রয়েছে যে, বিতিরসহ কিয়ামে লাইলের রাকাত সংখ্যা ছিলো সাত অথবা পাঁচ । কখনও কখনও আবার রাতের সকল নামাজকেই বিতির বলা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা বেজোড়। তাই বেজোড় সংখ্যা তাঁর পছন্দনীয়– এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিতির নামাজ ফযীলতপূর্ণ। কখনও কখনও আবার মাগরিবের নামাজকেও বিতির বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, মাগরিবের নামাজ হচ্ছে দিনের বিতির।

রসুল আকদাস স. কিয়ামে লাইলের নামাজ দীর্ঘ ক্বেরাত সহযোগে দণ্ডায়মান অবস্থায় পাঠ করতেন। সুদীর্ঘ ক্বেরাতে তিনি পাঠ করতেন সুরা বাকারা। সুরা আল-ইমরান, সুরা নিসা, সুরা মায়েদা, সুরা আনআ'ম ইত্যাদি। এই নামাজে তিনি তাঁর রুকু, সেজদা ও কওমাকেও ক্বেরাত অনুসারে প্রলম্বিত করতেন। কোনো কোনো রাতে কোনো একটি বিশেষ আয়াত বারংবার আবৃত্তি করতে করতে রাত্র অতিবাহিত করতেন। সেই বিশেষ আয়াতটি হচ্ছে, "তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দিতে চাও তবে তো তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে চাও তবে তো তুমিই মহাপরাক্রান্ত এবং মহাপ্রজ্ঞাধিকারী"। তিনি স. এই নামাজের দ্বিতীয় রাকাতকে প্রথম রাকাত অপেক্ষা কম দীর্ঘ করতেন। অধিক বয়সের সময় তিনি এই নামাজ উপবিষ্ট অবস্থায়ও পাঠ করেছেন। তখন উপবিষ্ট অবস্থা থেকেই তিনি রুকুতে যেতেন এবং সেজদা আদায় করতেন। কখনও কখনও বসে বসে কোরআন আবৃত্তি করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তেলাওয়াত করার পর রুকু ও সেজদায় যেতেন। দ্বিতীয় রাকাতও আদায় করতেন এভাবে। আবার কখনও এমন হতো যে, দ্বিতীয় রাকাত তিনি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে পড়তেন অথবা সম্পূর্ণ বসেই পড়তেন। জননী হাফসা থেকে তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে– আমি কখনও রসুল আকদাস স. কে বসে নফল নামাজ পড়তে দেখিনি। তবে ইন্তেকারের পূর্বে কয়েক বছর যাবত এরকম করতে দেখেছি। সহিহাইন কিতাবে জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, শেষ বয়সে কষ্ট হতো বলে তিনি স. অধিকাংশ নামাজ বসে বসে আদায় করতেন।

এক হাদিসে এসেছে, বসে নামাজ পড়ার সময় তিনি স. চার জানু হয়ে বসতেন। হাফেজে হাদিসগণ এই হাদিসটিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন। উপবেশনের মোস্তাহাব, জায়েয এবং মাকরূহ পদ্ধতি সম্পর্কে ফকিহগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উপবেশন করতে হবে তাশহহুদের উপবেশনের মতো। অন্যান্য বর্ণনায় এহতেবা (ডান দিকের দুই পা বের করে নিতম্বর উপর বসা) এবং তারাববু (চারজানু) এর কথাও এসেছে। তারাববু এর কথা রয়েছে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের বর্ণনাতেও। তবে তাশাহহুদের মতো বসা যে সর্বোত্তম, সে ব্যাপারে সকলে একমত। তিনি স.

উপবিষ্ট অবস্থায় নামাজ পাঠকালে ছোট সুরা পাঠ করতেন। কিন্তু ওই সুরা এতো ধীরে সুস্থে পাঠ করতেন যে, তাতে দীর্ঘ ক্বেরাতের অনুরূপ সময় ব্যয় হতো। ওই পরিমাণ সময় তিনি সেজদাতেও ব্যয় করতেন। এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বসে নামাজ আদায়কারীকে ক্বেরাত, রুকু, সেজদা ইত্যাদি যথানিয়মে পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে– যাতে করে দণ্ডায়মান না হওয়ার ক্ষতিটুকু পূরণ হয়ে যায়। যারা মূর্খ তারাই কেবল যথানিয়ম ও পরিপূর্ণতা আদায় করতে অনীহ। তারা সুন্নতের নয় বরং স্বকপোল কল্পনার অনুসারী।

কিয়ামে লাইলের শুরুতে তিনি স. সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। তারপর পরের রাকাতগুলোকে করতেন প্রলম্বিত। তাঁর এই নামাজের প্রকৃতি, রীতি, রাকাতসংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা রয়েছে। যারা এই নামাজ পড়তে চান তাদেরও রসুল পাক স. এর এই রীতিসমূহের অনুসরণ করা উচিত। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রীতিতে রসুল পাক স. এর অনুসরণে নামাজ সম্পাদন করতে হবে। কারণ ওই রীতিগুলো হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত।

শরহে সফরুস সায়াদাত গ্রন্থে এব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি স. বিতির নামাজ পড়তেন কখনও রাতের প্রথম অংশে কখনও দ্বিতীয় অংশে, কখনও শেষ অংশে। অধিকাংশ সময় তিনি অবশ্য বিতির আদায় করতেন রাতের শেষ প্রহরে। জামেউল উসুল গ্রন্থে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. শেষ বয়সে মধ্য রাত্রিতে বিতির আদায় করতেন। তিরমিজি শরীফে রয়েছে হজরত জাবের বলেছেন, রসুল করীম স. বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে, রাতের শেষ অংশে জাগ্রত হতে পারবে না, সে যেনো রাতের প্রথম প্রহরেই (এশার নামাজের পর) আদায় করে নেয়। আর যদি শেষরাতে জেগে উঠতে পারবে বলে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয় তবে বিতির তখনই পাঠ করবে। শেষ রাতের নামাজ আল্লাহ্পাকের দরবারে বিশেষভাবে উপস্থাপিত করা হয় তাই শেষ রাতের নামাজই উত্তম। সুফিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে জানা যায় যে, শেষ রাতের নামাজ আল্লাহ্পাকের নৈকট্যলাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক শেষ রাতে জাগতে পারবেন কিনা এই আশংকায় রাতের প্রথম অংশে বিতির নামাজ পড়ে নিতেন এবং হজরত আলী সম্পর্কে এসেছে, তিনি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন বলে বিতির নামাজ বাকি রেখেই নিদ্রাভিভূত হতেন। প্রকৃত কথা এই যে, রসুল পাক স. অধিকাংশ সময় শেষ রাতে সুবহে সাদেকের পূর্বে বিতির নামাজ আদায় করতেন। আবার কখনও কখনও আদায় করতেন রাতের প্রথমাংশে কিংবা মধ্যমাংশে। প্রথমাংশে বিতির পড়লে তাহাজ্জুদের পরে আর বিতির পড়তেন না। তিরমিজি শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এক রাতে দুই বিতির নেই। হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থে শায়েখ ইবনুল হেমাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রের প্রথমাংশে বিতির আদায় করে নেবে, সে তাহাজ্জুদের পর আর বিতির পড়বে না। দু'বার

বিতির পাঠ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার একটি কারণ এই যে, এরকম করলে একটি বিতির হয়ে যাবে নফল। আর বেজোড় নফল শরিয়ত সমর্থিত নয়।

বিতিরের পর তিনি স. সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। ওই নামাজে ইযাযুল যিলাতুল আরদ্ এবং কুল ইয়া আইউহাল কাফিরূন সুরা দু'টি পড়তেন। ইমাম মালেক এই দুইরাকাত নামাজকে গ্রহণ করেননি। ইমাম আহমদ বলেছেন বিতিরের পরে দুই রাকাত নামাজ আমি নিজে পড়ি না। তবে কেউ পড়লে তাকে নিষেধও করি না। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, বিতিরের পর নফল নামাজ জায়েয– এ কথা বুঝানোর জন্যই তিনি স. এই আমল করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, ওই দু'রাকাত নামাজ আসলে ফজরের সুন্নত নামাজ। আবার কেউ কউ বলেছেন, বিতিরের পরের ওই দুই রাকাত নামাজ কিয়ামে লাইলের স্থলাভিষিক্ত। আর তা হচ্ছে ওই ব্যক্তির জন্য যে রাতের প্রথমাংশে বিতির আদায় করে নেয়।

তিনি স. বিতিরের প্রথম রাকাতে সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকাতে পাঠ করতেন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে তৃতীয় রাকাতে পাঠ করতেন কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযুবি রব্বিল ফালাক এবং কুল আউযুবি রব্বিন্নাস। তবে প্রথমোক্ত পদ্ধতিটিই উত্তম। শায়েখ ইবনুল হিশাম বলেছেন, সাধারণ্যে প্রচলিত প্রথম রাকাতে ইন্না আন যালনা ফি লাইলাতিল কৃদরী পড়ার রীতিটি হাদিস সমর্থিত নয়। এরকম বিবৃত হয়েছে কোনো কোনো ফেকার গ্রন্থে। বিতির নামাজের সালাম ফিরোনোর পর তিনি স. সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস তিনবার পড়তেন। শেষবার পড়তেন শব্দ করে এবং হরফসমূহ টেনে টেনে।

ফজরের সুন্নত

রসুল আকদাস স. ফজরের সুন্নত নামাজ পাঠ করে ডান কাত হয়ে মাটিতে শুয়ে অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে জননী আয়েশা বলেছেন, তিনি স. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায়ের পর আমাকে জেগে থাকতে দেখলে আমার সঙ্গে কথা বার্তা বলতেন নতুবা শুয়ে পড়তেন। ফরজ নামাজ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এভাবে শায়িত থাকতেন। বোখারী শরীফে বলা হয়েছে, ডান কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। ইমাম তিরমিজি তাঁর জামে তিরমিজি গ্রন্থে "ফজরের সুন্নতের পর কথোপকথন " এই শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. ফজরের দু'রাকাত সুন্নত আদায়ের পর প্রয়োজন হলে আমার সঙ্গে কথা বলতেন অথবা নামাজের জন্য মসজিদে চলে যেতেন। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। তিনি আরো বলেছেন, কোনো কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী বলেছেন, সোবহে সাদেকের শুরু থেকে ফজরের নামাজ

শেষ হওয়া পর্যন্ত কথা বার্তা বলা মাকরূহ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসময় জিকির আজকার কিংবা প্রয়োজনীয় কথা বার্তা কোনোটাই মাকরূহ নয়। তিনি পুনরায় বলেছেন, ইমাম আহমদ এবং ইসহাকও এরকম বলেন। জননী আয়েশার হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি স. তখন প্রয়োজন দেখা দিলেই কেবল কথা বলতেন। কিন্তু কেউ যদি প্রয়োজন ছাড়াও কথাবার্তা বলেন, তবুও পঠিত সুন্নত নামাজ বাতিল হবে এমন নয়। তবে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ফেললে কেউ যদি পরিপূর্ণতা ও সাবধানতার জন্য পুনরায় সুন্নত নামাজ পড়ে নেয় তবে তাতে কোনো দোষ হবে না। একবার মক্কার বিখ্যাত মুফতী শায়েখ আলী ইবনে কাযী জারুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলো, আমাদের শহরের লোকেরা মনে করে ফজরের সুন্নতের পর কথাবার্তা বললে সুন্নত বাতিল হয়ে যায় এ বিষয়ে বিধান কী? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্, কথা বার্তাতো হয়েছে নামাজের বাইরে সুতরাং নামাজ বাতিল হলো কি করে। কোনো কোনো আহলে জাওয়াহের (যারা কোরআনও হাদিসের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অর্থের অনুসারী) ফজরের সুন্নতের পর শয়ন করাকে ফরজ মনে করে থাকেন। দলিল হিসাবে তারা গ্রহণ করে থাকেন তিরমিজি শরীফের ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে, ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করে সে যেনো তার ডান পার্শ্বে কাত হয়ে শয়ন করে। কেউ কেউ এই হাদিসটিকে এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তাঁরা মনে করেন ফজরের ফরজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এরকম শয়ন করা একটি শর্ত। আলেমগণের একটি দল আবার এরকম শয়ন করাকে মাকরূহ মনে করেন এবং একে বেদাত বলে জানেন। উপরোক্ত দুটি মতই চরম মনোভাবাপন্ন। তাই সত্য থেকে দূরবর্তী। এরকম শয়ন সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বলে একে কিছুতেই বেদাত বলা যায় না। আর এই শয়নকে ফরজ সাব্যস্ত করা যায় না এই কারণে যে, এই বিষয়ের সকল হাদিসে শয়নের কথা নেই। জমহুর ওলামা এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থাকে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, এরকম শয়ন করা মোস্তাহাব। ইমাম মালেক বলেছেন, বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সামান্য সময়ের জন্য শয়ন প্রশংসনীয়। ইমাম আবু হানিফাও এরকম বলেন। তিনি আরো বলেন, রসুল পাক স. তখন শয়ন করতেন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। প্রশ্ন হতে পারে যে, ডান কাত হয়ে শয়ন করতে হবে কেনো? এর উত্তর এই যে, এভাবে শয়ন করাই ছিলো তাঁর পবিত্র স্বভাব। এভাবে শয়ন করলে অতি গভীর নিদ্রার আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকা যায়। এরকম শয়ন শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার সহায়ক।

শবে বরাতের নামাজ

শাবান চন্দ্র মাসের মধ্যবর্তী রাতে রসুল আকদাস স. রাত জেগে নামাজ আদায় করতেন। আমাদের দেশে এই রাত্রিকে বলা হয় শবে বরাত। এই রাত্রির ইবাদত সম্পর্কে মা আয়েশা সিদ্দিকার বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেছেন, রসুল পাক স. এই রাত্রিটি ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে সেজদাবনত থাকতেন। মনে হতো তাঁর পবিত্র আত্মা বুঝি তার পবিত্র শরীরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছিন্ন করেছে। একবার আমি একথা মনে করে কাছে গিয়ে তাঁর আঙ্গুল নাড়াচাড়া করলাম। তখন তিনি স. কিঞ্চিত আন্দোলিত হলেন এবং সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসলেন। নামাজ শেষে বললেন, হে হোমায়রা, তুমি কি মনে করেছো আল্লাহ্র রসুল তোমার অধিকার খর্ব করেছেন কিংবা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল, এরকম ভাবনা আমার নেই। আপনার সুদীর্ঘ সেজদা দেখে আমি মনে করেছিলাম, আপনার প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করেছে। তিনি বললেন, তুমি কি জানো না, এটা কোন রজনী? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই উত্তমরূপে অবগত। তিনি স. বললেন, এই যামিনী হচ্ছে শাবানের মধ্যবর্তী যামিনী। এই নিশীথে আল্লাহ্পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, মনোনিবেশ করেন সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত। এ কথার অর্থ– অন্যান্য রাত্রির তুলনায় আল্লাহ্পাক এই রাত্রিতে অধিক অনুগ্রহপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করেন। অন্যান্য রাতের শেষভাগে আল্লাহ্পাকের বিশেষ মনোনিবেশ ঘটে। আর এই রাতে ঘটে সমস্ত রাত্রি জুড়ে। এই রজনীতে তিনি ক্ষমা প্রার্থীকে ক্ষমা করেন এবং রহমত যাচ্ঞাকারীকে দান করেন বিশেষ রহমত। তবে এই মহিমময় রাত্রিতে তিনি হিংসুকদেরকে ক্ষমা করেন না।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একরাতে তিনি স. আমার নিকটে এলেন, কিন্তু একটু পরেই দ্রুত উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। রাতটি ছিলো আমার অধিকারের রাত। অথচ তিনি আমাকে এভাবে রেখে চলে গেলেন বলে আমিও তাঁর পিছুপিছু চললাম। এভাবে চলতে চলতে একসময়ে দেখলাম তিনি জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন করে প্রর্থানা করছেন। এক সময় আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি স. বললেন, হে আয়েশা, তুমি কি মনে করেছো যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল তোমার প্রতি জুলুম করেছেন? আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ, আমি ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো আপনার অন্য স্ত্রীর নিকট গমন করছেন। তিনি স. বললেন, আজ মধ্যবর্তী শাবানের রজনী। এই রজনীতে আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন এবং বনু কিলাব গোত্রের বকরীগুলোর পশমের সমপরিমাণ মানুষকে ক্ষমা করে দেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্পাক সকলকেই ক্ষমা করে দেন। কেবল ক্ষমা করেন না অংশীবাদীকে, চোগলখোরকে, রক্তের বন্ধন ছিন্নকারীকে, মানুষকে কষ্টদানকারীকে, পিতা-মাতার অবাধ্যকে, মদ্যপানকারীকে এবং হিংসুককে। এ রজনীতে

আল্লাহ্পাক তাঁর বান্দাদের রিজিক ও আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করেন। কে কে এ বৎসর হজে গমন করতে পারবে সে কথাও এই রিজনীতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

শাবানের মধ্যবর্তী রাত্রির ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। মর্যাদার দিক দিয়ে 'শবে কদর' রাত্রির পরই এই রাত্রির মর্যাদা। হাদিস শরীফে এসেছে চারটি রাত্রিতে আল্লাহ্পাক তাঁর বিশেষ রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন– ঈদুল আযহার রাত্রি, ঈদুল ফিতরের রাত্রি, শাবানের রাত্রি এবং আরাফার রাত্রি। শাবানের রাতে ইবাদত করা এবং দিনে রোজা রাখার বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। শাম দেশের তাবেয়ীগণের মধ্যে খালেদ ইবনে মা'দান, নোমান ইবনে আমের এবং মাকনুল এইরাত্রে অধিক ইবাদত করতে সচেষ্ট থাকতেন। তখন তাঁরা উত্তম পোশাক পরিধান করতেন, আগর রাতি জ্বালাতেন, সুরমা ব্যবহার করতেন এবং মসজিদে গিয়ে ইবাদত করতেন। তবে হেজাজ ও মদীনার আলেমগণ তাঁদের অনুসরণ করতেন না। তাঁরা মনে করতেন, এই রাতে মসজিদে সমবেত হয়ে ইবাদত করা বেদাত। শাম দেশের ইমাম আওজায়ী এই রাতে একা একা নামাজ পড়াকে মকরূহ মনে করেননি। রসুল পাক স. থেকে এই রাত্রের আমল কিয়ামে লাইল, দীর্ঘ সেজদা এবং জান্নাতুল বাকীর কবরবাসীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা– এগুলো ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইবাদতের কথা বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি। জননী আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, সেদিন ছিলো মধ্য শাবানের রজনী। রসুল আকদাস স. আমার কাছে ছিলেন। গভীর নিশীথে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আমি দেখলাম তিনি আমার শয্যায় নেই। আমি তখন ঈর্ষান্বিত হলাম এই ভেবে যে, তিনি হয়তো তাঁর অন্য স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে তাঁর সন্ধানে বের হলাম। কিন্তু তাঁকে কোথাও পেলাম না। যখন আপন প্রকোষ্ঠে ফিরে আসছিলাম তখন হঠাৎ দেখলাম তিনি স. মসজিদে শুভ্র বস্ত্রের ন্যায় সেজদাবনত হয়ে প্রার্থনা করছেন– হে আমার আল্লাহ্! আমার চিন্তা চেতনা এবং কৃষ্ণ কেশপাশ তোমাকে সেজদা করেছে। আমার অন্তর এখন বিশ্বাসে পূর্ণ নিমগ্ন। আমার অঙ্গপ্রতঙ্গ এবং সত্তা সবছিুই এখন তোমাতে নিমিজ্জিত। হে মহান! আমি সকল মহান কর্মের অভিলাষী, তুমি সকল বৃহৎ পাপ ক্ষমা করে দাও। আমার অবয়ব এখন ওই সত্তায় সমর্পিত যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব দান করেছেন এবং দান করেছেন শ্রুতি এবং দৃষ্টি। এভাবে প্রার্থনার পর তিনি সেজদা থেকে মস্ত ক উত্তোলন করলেন। তারপর পুনরায় সেজদাবনত হয়ে বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তোমার প্রসন্নতার সঙ্গী হয়ে আমি তোমার অপ্রসন্নতা থেকে পরিত্রাণ চাই, তোমার ক্ষমার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে তোমার রোষ থেকে নিরাপত্তা চাই, তুমি যেরূপ প্রশংসার উপযোগী সে রকম প্রশংসা করার সাধ্য আমার নেই। আমি আমার ভ্রাতা দাউদের মতো তাই বলি, আমার এই সেজদাবনত অবস্থায়

তুমি ক্ষমা করে দাও। হে আমার পরমতম প্রভু! দাসতো কেবল সেজদা করার অধিকারই পেয়েছে। এরপর মস্তক উত্তোলন করলেন রসুল আকদাস স.। তারপর বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে এমন পবিত্র হৃদয় দান করো যা অংশীবাদিতা থেকে মুক্ত। এই অন্তর যেনো কখনো অনাচারী ও হতভাগ্য না হয়। এভাবে ইবাদত শেষ করে তিনি স. আমার নিকট এলেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছিলাম। তিনি স. বললেন, হোমায়রা, তুমি এমন করছো কেনো? আমি সকল কিছু খুলে বললাম। তিনি স. আমার উরুদেশে আলতোভাবে হাত রেখে বললেন, আক্ষেপ এই উরুদ্বয়ের জন্য, এরা কতই না কষ্ট করেছে। হে হোমায়রা! আজকের রজনী হচ্ছে শাবানের মহিমময় রজনী। এ রাতে আল্লাহ্তায়ালা নিম্নতম আকাশে অবতরণ করেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু এই ক্ষমা প্রাপ্তির বাইরে থাকে মুশরিক ও হিংসুক।

মাশায়েখগণের অজিফার গ্রন্থসমূহে এই রাতে একশ' রাকাত নফল নামাজ পড়ার কথা রয়েছে। প্রতি রাকাতে দশবার করে সুরা এখলাস পড়ার কথাও বলা হয়েছে। তবে মোহাদ্দেছগণের নিকট এরকম আমল বিশুদ্ধ সূত্রে সমর্থিত নয়। শায়েখ আবুল হাসানের বর্ণনায় রয়েছে আমিরুল মুমিনিন হজরত আলী বলেছেন, আমি রসুল আকরম স. কে শাবানের রাতে চৌদ্দ রাকাত নামাজ পড়তে দেখেছি। সালাম ফিরানোর পর তিনি স. চৌদ্দবার সুরা ফাতেহা, চৌদ্দবার সুরা এখলাস, চৌদ্দবার সুরা নাস এবং একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করেছেন। তারপর পাঠ করেছেন 'লাক্বদ জায়াকুম রসুলুম মিন আন ফুসিকুম' এই আয়াতটি। এই আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি স. আমাকে বলেছিলেন, যে এরকম আমল করবে সে বিশটি মকবুল হজ এবং বিশ বৎসরের মকবুল রোজার সওয়াব লাভ করবে। আর পরদিন রোজা রাখলে পাবে দুই বৎসরের মকবুল রোজার সওয়াব। মোহাদ্দেছগণ এই হাদিসের সূত্র সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, প্রকাশ থাকে যে, হাদিসটি মারফু। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আমাদের দেশে শবে-বরাতের রাতে আলোকসজ্জা ইত্যাদি করার যে রীতি রয়েছে তা শরিয়তসিদ্ধ নয়। এ সকল রীতি হিন্দুদের দেওয়ালী পূজার অনুকরণ অথবা অগ্নি পূজকদের অসৎরীতির অনুরূপ।

চাশতের নামাজ

সূর্য উদিত হওয়ার পর ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে থাকার সময়কে বলে দোহা। চাশতের নামাজের এক নাম সালাতে দোহা। উল্লেখ্য যে, দিবসের প্রথম ভাগে দু'টি নফল নামাজ পড়া হয়ে থাকে। একটির সময় সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে দুই তীর পরিমাণ উচ্চে অবস্থান করা পর্যন্ত। এই নামাজের নাম এশরাকের নামাজ। অন্য নফল নামাজটির সময় সূর্য আকাশের এক চতুর্থাংশ উচ্চে অবস্থান

করার সময় থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। এই নামাজের নাম সালাতে দোহা বা চাশতের নামাজ। অধিকাংশ হাদিসে এই দু'টি নামাজের সময় বোঝাতে 'দোহা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো হাদিসে আবার বলা হয়েছে সালাতুল এশরাক। তিবরানী থেকে আল্লামা সুয়ূ্যতী উদ্ধৃত করেছেন, রসুল আকরম স. বলেছেন, হে উম্মে হানী! এ হচ্ছে এশরাকের নামাজ। তাফসীরে বায়যাবীতে রয়েছে, রসুল পাক স. একবার চাশতের নামাজ আদায় করার পর বলেছেন, এ হচ্ছে এশরাকের নামাজ। মক্কাবিজয়ের দিন রসুল আকরম স. হজরত উম্মে হানীর গৃহে গমন করেছিলেন চাশতের সময়। অথচ তখন বলেছিলেন, হাজা সালাতুল এশরাক (এটা এশরাকের নামাজ)।

আল্লামা সুয়ূ্যতীর জামে কবীর গ্রন্থ থেকে শায়েখ আজাল্ল আলী মুত্তাফী এই মর্মে হাদিস উদ্ধৃতি করেছেন– যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত জিকির আযকারে লিপ্ত থাকে এবং তারপর এশরাকের দুই রাকাত নামাজ আদায় করে সে ব্যক্তি একটি হজ ও একটি ওমরার সমান সওয়াব পায়।

এশরাকের পরের নামাজের নাম চাশতের নামাজ। এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছেছে যে, রসুল পাক স. ওয়াজিবরূপে পৃথকভাবে এই নামাজ দু'টি পাঠ করেছেন এবং উম্মতকে এই নামাজ পাঠে উৎসাহ প্রদানার্থে বলেছেন মোস্তাহাব।

চাশতের নামাজ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ এই নামাজকে গ্রহণ করেছেন, কেউ পরিত্যাগ করেছেন। কেউ বলেছেন সুন্নত। আবার কেউ বলেছেন বেদাত। কেউ এই নামাজ পাঠ করার ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ প্রাধান্য দিয়েছেন না পাঠ করাকে। তবে এ কথাটি সুস্পষ্ট যে, এই মতভিন্নতা রয়েছে কেবল চাশতের নামাজের বেলায়। এশরাকের নামাজ সম্পর্কে কোনো মতদ্বৈধতা নেই। কেউ কেউ তো এশরাকের নামাজকে বলেছেন সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এই নামাজের রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কেও বিভিন্ন রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। কোনো কোনো বর্ণনায় দুই রাকাত,আবার কোনো কোনো বর্ণনায় চার রাকাত। কোথাও ছয়, কোথাও আট, কোনো স্থানে দশ আবার কোনো স্থানে বারো রাকাতের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি বর্ণনায় রয়েছে অনেক সওয়াবের কথা।

মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়ায় শায়েখ ওলীউদ্দিন ইবনে এরাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, চাশতের নামাজ অনেক বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে সুসাব্যস্ত। মোহাম্মদ ইবনে জারীর বলেছেন, এ প্রসঙ্গের হাদিসগুলো অর্থগত দিক দিয়ে মুতাওয়াতির (সুবিদিত)। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী বলছেন, চাশতের নামাজ ছিলো রসুল পাক স. এর পূর্ববর্তী নবীগণের নামাজ। আল্লাহ্তায়ালা হজরত দাউদ এর প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি পাহাড়সমূহকে তাঁর অধীনস্থ করে দিয়েছিলাম, তারা

সকাল সন্ধ্যায় তসবিহ্ পাঠ করতো।' ওই তসবিহ্ পাঠকেই আল্লাহ্তায়ালা হজরত মোহাম্মদ স. এর ধর্মে আসরের নামাজ এবং এশরাকের নামাজের আকারে রেখে দিয়েছেন। এক হাদিসে এসেছে, হজরত দাউদের অধিকাংশ নামাজই ছিলো চাশতের নামাজ। অন্য এক হাদিসে এসেছে চাশতের নামাজের প্রতি যত্নবান ছিলেন হজরত আদম, হজরত নূহ, হজরত ইব্রাহীম, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসা।

বান্দা মিসকিন (গ্রন্থকার) বলেন, এ হচ্ছে আল্লাহ্পাকের এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তাঁর বান্দাগণের প্রতি তাঁর প্রবর্তিত বিধান সহজ করে দিয়েছেন। ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত মানুষকে জাগতিক কর্মকাণ্ডে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। তাই এ সময়ের মধ্যে সাধারণ জনতাকে অবকাশ দিয়েছেন তিনি। আর তাঁর বিশেষ বান্দাগণের জন্য তিনি এইমর্মে সুযোগ প্রদান করেছেন যাতে করে তারা এই সময় এশরাক ও চাশতের মাধ্যমে ইবাদতে মশুগুল থাকতে পারেন। তাই এই নামাজ দু'টোকে ওয়াজিব করা হয়নি। করা হয়েছে মোস্তাহাব। মাজহাবের আলেম ও মাশায়েখগণ অধিকাংশই এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। চাশতের নামাজ প্রমাণকারী হাদিসসমূহ, রহিতকারী হাদিসসমূহের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার লাভ করেছে। প্রমাণকারী হাদিসসমূহে রয়েছে জ্ঞানচর্চার নিদর্শন। আর রহিতকারী হাদিসসমূহে রয়েছে অস্পষ্টতা। উসুলে ফেকার বিধান এরমকই।

আলেমগণের একটি দল চাশতের নামাজকে মাকরূহ বলে থাকেন। তাঁদের মতে চাশতের নামাজ পড়া বেদাত। কেননা এই নামাজের প্রচলন ঘটেছে রসুল আকদাস স. এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানার পর। এই আমলটিকে বেদাত প্রমাণ করতে যেয়ে তাঁরা কতিপয় হাদিসকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন– বোখারী শরীফে হজরত ওমর থেকে বর্ণিত হাদিসটি। তৃতীয় যুগের এক তাবেয়ী মুওয়াররেক আজালী বলেছেন, আমি হজরত ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি চাশতের নামাজ পড়েন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, হজরত ওমর কি পড়তেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, হজরত আবু বকর সিদ্দিক কি পড়তেন? তিনি বললেন, না। আমি পুনরায় বললাম, রসুল পাক স. কি পড়েছেন? তিনি বললেন, আমি যতদূর জানি তিনিও স. এরকম নামাজ পড়েননি।

প্রবীণ সাহাবী হজরত আবু বকর সাকাফী একদিন একদল লোককে চাশতের নামাজ পড়তে দেখে বলেছিলেন, তোমরা এমন এক নামাজ পড়লে যা রসুল আকরম স. কোনোদিন পড়েননি, তাই সাহাবীগণও পড়েননি।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, রসুল আকদাস স. চাশতের নামাজ পড়েননি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সফরের সময়ে পড়েননি এবং গৃহবাসের সময়ও পড়েননি। তবে আমি পড়লে তা তিনি পছন্দ করতেন। উম্মতের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে এই আশংকায় তিনি এ নামাজ পড়েননি।

হজরত কায়েস ইবনে উবায়দা বলেছেন, আমি এক বছর ধরে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট গমনাগমন করেছি। কিন্তু আমি তাঁকে কখনও চাশতের নামাজ পড়তে দেখিনি। মাসরুক বলেছেন, আমরা হজরত ইবনে মাসউদের সম্মুখে কোরআন মজীদ পাঠ করতাম। তিনি চলে যাবার পর আমরা বসেই থাকতাম। কিছুক্ষণ পর আমি উঠে চাশতের নামাজ পড়তাম। এই আমল সম্পর্কে জানতে পেরে হজরত ইবনে মাসউদ বলেছিলেন, মানুষেরা অযথা তাদের কষ্ট বাড়ায়। অথচ আল্লাহ্পাক এরকম নির্দেশ করেননি। কেউ যদি এই নামাজ পড়তে চায় তবে সে যেনো তার ঘরে গিয়ে নামাজ পড়ে।

মুজাহিদ বলেছেন, একবার আমি এবং উরওয়া ইবনে যোবায়ের মসজিদে নববীতে গেলাম। দেখলাম, হজরত ইবনে ওমর, হজরত আয়েশা সিদ্দিকার হুজরা শরীফের কাছে বসে আছেন। আর অন্যান্য লোক চাশতের নামাজ পড়ছেন। আমি হজরত ইবনে ওমরকে বললাম, এরা যে নামাজ পড়ছে তা সুন্নত না বেদাত। তিনি বললেন, বেদাত। তবে এই বেদাতটি একটি উত্তম বেদাত। এই বেদাতের চেয়ে উত্তম বেদাত মুসলমানেরা এ পর্যন্ত আবিষ্কার করেনি।

উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে চাশতের নামাজের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু চাশতের নামাজের পক্ষেও কতিপয় হাদিস রয়েছে। এই পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে মোহাদ্দেছগণ বলেছেন, রসুল পাক স. চাশতের নামাজ সব সময় পড়তেন না। যদিও তিনি স. উম্মতকে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন। উম্মতের উপর ওয়াজিব হওয়ার আশংকায় তিনি এই নামাজ নিয়মিত পড়েননি। হজরত আয়েশা সিদ্দিকার বক্তব্য থেকে একথাটিই প্রতীয়মান হয়। তাই একথা ঠিক নয় যে, এই নামাজ সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন। বিশুদ্ধ হাদিসসমূহে এ বিষয়টির প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং যারা এ নামাজ পড়তে নিষেধ করেন তারা হয় বিশুদ্ধ বর্ণনাকে অস্বীকার করেন, না হয় নিয়মিত এই নামাজ পড়তে নিষেধ করেন। সুতরাং যে সকল বর্ণনায় রসুল পাক স. এই নামাজ পড়তেন না বলা হয়েছে, সে সকল বর্ণনার আসল অর্থ হবে– তিনি স. নিয়মিত এরকম আমল করতেন না। তাই হজরত ইবনে মাসউদ এই নামাজে অভ্যস্ত ছিলেন না। হজরত কায়েস ইবনে উবায়েদ তাই বলেছেন, তিনি হজরত ইবনে মাসউদের সঙ্গে এক বৎসর অতিবাহিত করা সত্ত্বেও তাঁকে এই নামাজ পড়তে দেখেননি। এর কারণ এই হতে পারে যে, হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকিহ। তিনি সবসময় জ্ঞান চর্চায় বিভোর থাকতেন। যেহেতু জ্ঞানানুশীলনে মগ্ন থাকা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম, তাই তিনি চাশতের নফল নামাজের চেয়ে জ্ঞান চর্চাকেই প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহ্পাক উত্তমরূপে অবহিত।

এরকমও হতে পারে যে, বিরোধী হাদিসসমূহের নির্ভরযোগ্যতা কম হওয়ায় চাশতের নামাজকে অস্বীকার করা হয়েছে। যেমন হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আতি যতদুর জানি তিনি স. চাশতের নামাজ পড়েননি। তিনি হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের চাশতের নামাজ না পড়া সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু রসুল পাক স. সম্পর্কে সেরকম দৃঢ়তা ব্যক্ত করতে পারেননি। তাই বলেছেন– আমি যতদূর জানি।

যারা চাশতের নামাজকে বেদাত বলেছেন তাঁদের কথা হচ্ছে, এই নামাজের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া এবং নামাজের জন্য পূর্ব ঘোষণা দেয়া বেদাত। প্রকৃত কথা হচ্ছে নামাজ শরিয়তেরই হুকুম। কিন্তু এর জন্য আহবান করা এবং সমবেত হওয়া কেবল ফরজ নামাজের জন্যই নির্ধারিত। নফর নামাজের জন্য এরকম করা বেদাত। নফল নামাজ পাঠের সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, এই নামাজ পড়তে হবে স্বগৃহে এবং গোপনে। এর মধ্যেই রয়েছে নফলের ফযীলত। মোট কথা হাদিস শরীফে এরকম বর্ণিত হয়নি যে, চাশতের নামাজ শরিয়তসম্মত নয়। নিষেধাজ্ঞা এসেছে মূলতঃ পাঠপদ্ধতির উপর অর্থাৎ এই নামাজের জন্য কাউকে আহবান করা যাবে না এবং সমবেত হওয়াও যাবে না। তাই ইবনে আবী শায়বা হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হজরত ইবনে মাসউদ) একদল লোককে চাশতের নামাজ পড়তে দেখে বলেছিলেন, এই নামাজ যদি পড়তেই হয় তবে তারা তাদের ঘরে পড়ে নিলেই পারে। তাঁর নিকট থেকে মাসরুকও এরকম বর্ণনা করেছেন। আলেমগণের একটি দল পরস্পরবিরোধী অভিমতের সমন্বয় সাধনার্থে বলেছেন, মোস্তাহাব হচ্ছে এই যে, চাশতের নামাজ কখনও কখনও পড়বে, কখনও ছেড়ে দেবে। এই দলটি প্রখ্যাত তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক কর্তৃক বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রসুল পাক স. কি চাশতের নামাজ পড়েছেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, সাধারণতঃ পড়তেন না, তবে কখনও কখনও সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর পড়তেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, রসুল পাক স. কখনও কখনও চাশতের নামাজ নিয়মিত পড়তেন। তখন মনে হতো তিনি স. হয়তো এই নামাজ আর পরিত্যাগ করবেন না। আবার যখন এই নামাজ নিয়মিত পড়া থেকে বিরত থাকতেন তখন মনে হতো, তিনি বুঝি এই নামাজ আর পড়বেনই না। অধিকাংশ নফল ইবাদতের বেলায় তিনি স. এরকমই করতেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের অভ্যাসও এরকমই ছিলো। হজরত ইকরামা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের অভ্যাস ছিলো তিনি চাশতের নামাজ একদিন পড়লে পরের দুদিন পড়তেন না। মানসুর ইবনে মা'সার সালমা বলেছেন, পূর্ববর্তী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণ ফরজ নামাজের মতো চাশতের নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া

এবং নিয়মিত পাঠ করাকে মাকরূহ মনে করতেন। তাঁরা এই নামাজ কখনও পড়েছেন। কখনও ছেড়ে দিয়েছেন। আর সলফে সালেহীন আলেমগণের রীতি ছিলো, নফল প্রতিপালন করতে যেয়ে যেনো ধর্মজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন বিঘ্নিত না হয়। তাঁরা বর্তমান সময়ের আবেদ ও জাহেদ ব্যক্তিদের বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। বর্তমানের ইবাদত প্রিয় লোকেরা নফল ইবাদতের সঙ্গে অতি সম্পৃক্ত বলে এলেম ও মারেফত অর্জনে অসমর্থ। তারা জানে না, নফল নামাজের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও পুণ্যের আমল রয়েছে। সফরুস সায়াদাত প্রণেতা বলেছেন, চাশতের নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া মোস্তাহাব। নিয়মিত এই নামাজ পড়া যেতে পারে। তবে এর জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া ভালো নয়। চাশতের নামাজ একা একা ঘরে পড়াই উত্তম। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, আমার পিতা মাতাকে যদি জীবিত করে দেয়া হয় তবুও আমি চাশতের নামাজ পরিত্যাগ করবো না।

চাশতের নামাজের রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। স্থান কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো এই তারতম্য ঘটে থাকবে। এটা স্বাভাবিক। কারণ এই ইবাদতটি নফল। অধিকাংশ আলেম চৌদ্দ রাকাতের বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন। কেননা চৌদ্দ রাকাতের হাদিসগুলো বিশুদ্ধসূত্রসম্ভূত। অন্য হাদিসগুলোর কোনো কোনো সূত্র বিশুদ্ধ আবার কোনো কোনোগুলোর সূত্র শিথিল। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন।

এই নামাজের ক্বেরাত হিসেবে মাশায়েখগণ গ্রহণ করেছেন সুরা ওয়াশ্শামস, ওয়াদ্দুহা, ওয়াল্লাইলি ইজা ইয়াগসা, আলাম নাশরাহ ইত্যাদিকে। হাদিস শরীফে নামাজ শেষে এই দোয়া একশবার পাঠ করার কথা বলা হয়েছে– আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ার হামনি ও আতুবু আলা ইন্নাকা আনতাত্ তাওওয়াবুর রহীম। রসুল আকদাস স. থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা।

ঈদের নামাজ

ঈদ শব্দটি এসেছে আওদুন থেকে। আওদুন অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। বারংবার ফিরে আসা। দিনটি বার বার ফিরে আসে বলে ঈদের দিবসকে ঈদ বলা হয়েছে। এটাই ঈদের প্রচলিত অর্থ। বিভিন্ন মৌসুম ও ঋতু বার বার ফিরে এলে সেগুলোকেও এই অর্থে ঈদ বলা চলে। তাই বিশেষভাবে ঈদ বুঝাতে গেলে এর অর্থ হবে যা আনন্দের আবহ নিয়ে বার বার ফিরে আসে তারই নাম ঈদ। রমজানের রোজা পূর্ণ করার আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা হিসেবে আসে ঈদুল ফিতর। আর ঈদুল আযহা আসে আরাফা প্রান্তরের সর্বোত্তম সমাবেশের আনন্দে পূর্ণ হয়ে। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের এই অনন্য সাধারণ সমাবেশের পূর্ণতার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পরের

দিন অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল আযহা। তেমনি সাপ্তাহিক ঈদের দিন জুমআ আসে এক সপ্তাহের নামাজের পূর্ণতা ও কৃতজ্ঞতার আনন্দ নিয়ে। সুতরাং ইসলামের সকল বিধানের পূর্ণতা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঈদের দিবসকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পূর্ণতা ও কৃতজ্ঞতাই মুসলমানদের আনন্দিত সমাবেশের কারণ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, "তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও তবে আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত বাড়িয়ে দেবো।" এ কারণেই ঈদের কৃতজ্ঞতাকে ইবাদত হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

জাকাত দাতাদেরকে সম্মিলিতভাবে জাকাত দিতে হয় না। জাকাত দেয়ার জন্য তাদের কোনো পৃথক সমাবেশও নেই। তাই জাকাত প্রদাতাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন ঈদ নেই। সহায় সম্বলহীনদেরকে জাকাত দিয়ে জাকাত প্রদাতারা যে আত্মিক আনন্দ অনুভব করে সেই আনন্দই তাদের ঈদ। কেউ কেউ বলেছেন, ঈদ নিয়ে আসে সৌভাগ্যের নতুন বছর। তাই ওই সৌভাগ্যশীলতার নাম ঈদ। হেদায়া গ্রন্থে কোনো কোনো টীকা ভাষ্যে বলা হয়েছে, এই দিনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বান্দাদের সঙ্গে আনন্দ, ফজল ও করমের অঙ্গীকার করেছেন। তাই এই দিনের নাম ঈদ। এই অর্থটি গ্রহণীয় হলে 'ওয়াদুল' শব্দ থেকে ঈদ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মানতে হবে। কিন্তু এরকম অর্থ সুসঙ্গত নয়।

রসুল আকদাস স. ঈদের নামাজ পড়তেন ঈদগাহে। ঈদগাহ ছিলো মদীনা মনোয়ারার বাইরে পশ্চিম দিকে। এদিক দিয়েই মক্কা মোয়াজ্জমার কাফেলা মদীনায় প্রবেশ করে থাকে। ওই ঈদগাহ এবং মসজিদে নববীর মধ্যে দূরত্ব ছিলো এক হাজার গজ। এতে করে সহজেই বুঝা যায় যে, ঈদের নামাজ মসজিদে পড়ার চেয়ে ঈদগাহ ময়দানে পড়া উত্তম। মসজিদে নববীর বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তিনি স. ঈদগাহে গমন করতেন। একারণে বিভিন্ন দেশে ও শহরে ঈদের নামাজ ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো শহরে ঈদের নামাজ পড়া হয় মসজিদে। এরকম করা সুন্নতের খেলাপ। তবে কোনো ওজর বশতঃ এরকম করা যেতে পারে। রসুল আকদাস স.ও অতিবৃষ্টির কারণে জীবনে একবার এরকম করেছিলেন। মক্কাবাসীগণ প্রথম থেকেই মসজিদে হারামাইনে ঈদের নামাজ আদায় করতেন। পরবর্তীতে মদীনাবাসীগণও মসজিদে নববীতে ঈদের নামাজ আদায় শুরু করেন। তাঁরা রসুল আকরম স. এর বরকত থেকে পৃথক হওয়াকে সঙ্গত মনে করেননি। আর বর্তমানে তো মসজিদে নববী সুপ্রশস্ত। রসুল আকরম স. এর সময়ে মসজিদে নববী এরকম প্রশস্ত ছিলো না। ইবনুল হেমাম তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন, সুন্নত পদ্ধতি এই যে, ইমাম শহরের যুবক ও সুস্থ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করবেন। আর দুর্বল ব্যক্তিদের নামাজের জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন। একই শহরে দুই স্থানে ঈদের নামাজ

সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। ইমাম মোহাম্মদের মতে তিন স্থানে ঈদের জামাত হলেও জায়েয। ইমাম যদি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত না করে যান তবুও।

রসুল আকদাস স. ঈদের দিন সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। একটি অভিজাত হুল্লা ছিলো তাঁর। সেই মূল্যবান পোশাকটি তিনি ইসলামের শান শওকত প্রদর্শনার্থে জুমআ ও ঈদের দিন পরিধান করতেন। যুগল পরিচ্ছদকে বলা হয় হুল্লা। ওই পরিচ্ছদে ইজার ও চাদর সম্মিলিত থাকে। রেশমী কাপড়ের হুল্লা তিনি ব্যবহার করতেন না। পরিধান করতেন সবুজ ও লাল কারুকার্য খচিত চাদর। ইয়ামেনে প্রস্তুত করা হতো বলে ওই চাদরের নাম ছিলো বুরদা ইয়ামানী।

ঈদের দিন সাজসজ্জা করা মোস্তাহাব। কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ শরিয়তসম্মত হতে হবে। তিনি স. ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটি খেজুর ভক্ষণ করতেন। খেজুরের সংখ্যা হতো বেজোড়। অর্থাৎ তিনি তখন তিন, পাঁচ অথবা সাত খানা খেজুর খেতেন। আলেমগণ বলেছেন, খেজুর ভক্ষণ করা মোস্তাহাব হওয়ার কারণ এই যে, খেজুরের মিষ্টতা চোখের জ্যোতিকে শক্তিশালী করে। রোজা দৃষ্টিশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। খেজুর সেই শক্তিকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম। তাছাড়া মিষ্টি হচ্ছে ইমানী স্বভাবের অনুকূল। তাই বলা হয়েছে, মুমিনগণ সুমিষ্ট। স্বপ্নে কোনো সুমিষ্ট বস্তু দর্শন করলে তার অর্থ হবে স্বপ্ন দর্শনকারী ইমানের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। মিষ্টি মানুষের অন্তরকে নম্র করে। তাই মিষ্ট বস্তু দ্বারা ইফতার করা উত্তম। ঈদগাহে গমনের পূর্বে তিনি স. বেজোড় সংখ্যক খেজুর ভক্ষণ করতেন। কারণ তিনি বেজোড় সংখ্যাকেই পছন্দ করতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্পাক বেজোড় এবং তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।

ঈদুল আযহার দিন তিনি স. ঈদগাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে আহার করতেন না। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ঈদুল ফিতরের দিন তিনি কিছু না খেয়ে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। এ সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন ফরজ রোজা সম্পাদনের পর ফেতরা আদায় করা ওয়াজিব। তাই তিনি ঈদুল ফিতরের দিন ফিৎরত বা স্বাভাবিকতা দ্রুত সম্পাদন করতেন। তাঁর এরকম আচরণ ছিলো আল্লাহ্পাকের বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অনুকূল। বিধানকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না হলে তিনি তখন পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করতে পারতেন। কেউ কেউ বলেছেন, দুই ঈদের খাদ্য গ্রহণের তারতম্যের বিষয়টি ছিলো সদকা প্রদানের সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঈদুল ফিতরের সদকা দিতে হয় নামাজের পূর্বে। তাই তিনি নামাজের পূর্বে আহার করতেন। আর ঈদুল আযহার সদকা (কোরবানী) আদায় করতে হয় নামাজের পর। তাই তিনি স. নামাজের পর কোরবানীর পশু জবেহ করে তার গোশত সদকা (দান) করতেন এবং নিজেও আহার করতেন।

ঈদের গোসল

ঈদের গোসল সম্পর্কে দু'টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। একটি এই– রসুল পাক স. এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ধন্য হজরত ফাকা ইবনে সা'য়াদ বলেছেন, তিনি স. ঈদুল ফিতরের দিন, কোরবানীর দিন এবং আরাফার দিন গোসল করতেন। হাদিসটি বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত জিয়াদ ইবনে আয়াজ আশআরী থেকে। তিনি এক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি রসুল পাক স. কে যেমন করতে দেখেছি তোমরা তেমনি করে থাকো। কিন্তু তোমরা দুই ঈদের দিন গোসল করো না, রসুলপাক স. করতেন। মোহাদ্দেছগণ অবশ্য দু'টি হাদিসকেই দুর্বল বলেছেন। আমি (গ্রন্থকার) বলি, ঈদের গোসল সম্পর্কে ওই দু'টি হাদিস ছাড়া অন্য কোনো হাদিস আমি কোনো গ্রন্থেই পাইনি। সিহাহসিত্তার মধ্যে এ সম্পর্কে উল্লেখ মাত্র নেই। তবে হজরত ইবনে ওমরের আচরণ সম্পর্কে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়– যা মুয়াত্তা গ্রন্থ থেকে জামেউল উসুল পুস্তকে সংকলিত হয়েছে। ওই বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। তাঁর এই আমলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টি বিশুদ্ধ। হাদিস বিশেষজ্ঞগণ এরকমও বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর ঈদগাহের পথে যেতে যেতে উচ্চস্বরে তকবির বলতেন। সর্বসম্মতিক্রমে ইদুল আযহার দিন সশব্দে তকবির উচ্চারণ করা সুন্নত। কিন্তু ঈদুল ফিতরের দিন উচ্চস্বরে তকবির বলা সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা মতানৈক্য করেছেন। তবে ওই দিন অনুচ্চস্বরে তকবির বলাতে কোনো দোষ নেই।

রসুল পাক স. ঈদগাহে গমন করতেন পদব্রজে। তাই পদব্রজে ঈদগাহে গমন করা সুন্নত। অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া মোস্তাহাব। কোনো বাহন বা যানবাহনে গমন করা শোভনীয় নয়। তবে ওজর বশতঃ এরকম করা যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমার নিকট জুহুরী থেকে এই মর্মে বর্ণনা পৌঁছেছে যে, রসুল আকরম স. ঈদের ও জানাযার নামাজে গমনকালে কোনোকিছুতে আরোহী হননি।

তিনি স. ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়তেন বিলম্বে এবং ঈদুল আযহার নামাজ পড়তেন তাড়াতাড়ি। ঈদুল ফিতরের নামাজ বিলম্ব করার কারণ এই হতে পারে যে, এতে করে নামাজের আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা, কিছু আহার করা এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা যায়। আর এর মধ্যে জনসাধারণের উপস্থিতি যেনো বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু ঈদুল আযহার নামাজ তিনি এরকম বিলম্ব করে পড়তেন না। আল্লাহ্পাকই উত্তমরূপে অবহিত।

তিনি স. ঈদগাহে পৌঁছার পর পরই নামাজ শুরু করে দিতেন। নামাজ অনুষ্ঠিত হতো আযান ও ইকামত ছাড়াই। তখন আসসালাতু জামেআতুন

(নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে) এরকম ঘোষণার ব্যবস্থাও তিনি করতেন না। ঈদের নামাজের তকবিরের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। হানাফী মাজহাবে অতিরিক্ত তকবির হিসাবে ছয়টি তকবিরকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম রাকাতে ক্বেরাতের পূর্বে তিনটি এবং পরের রাকাতে ক্বেরাতের শেষে তিনটি। আমাদের মাশায়েখ ও ওস্তাদগণ বলেছেন, ঈদের তকবিরের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা রয়েছে। আমরা সেগুলো থেকে ন্যূনতম সংখ্যা অর্থাৎ ছয় তকবিরকেই পছন্দ করেছি।

রসুল আকরম স. এর সময়ে ঈদগাহে কোনো মিম্বর থাকতো না। মারওয়ান ইবনুল হাকাম সর্বপ্রথম ঈদের ময়দানে মিম্বরের প্রচলন করেছেন। তখন তিনি ছিলেন হজরত আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে মদীনার প্রশাসক। এক বর্ণনায় রয়েছে, ঈদগাহে সর্বপ্রথম মিম্বরের প্রচলন হয়েছিলো আমিরুল মুমিনীন হজরত ওসমানের জামানায়। হজরত কাসীর ইবনুস সালত থেকে এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর গৃহ ছিলো মদীনার ঈদগাহের সন্নিকটে।

রসুল আকদাস স. ঈদের নামাজ পড়তেন খুতবার পূর্বে। নামাজ শেষে তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা শুরু করতেন। দুই ঈদেই তিনি খুতবা দিতেন নামাজের পর। এটা ঐকমত্য। হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরও এরকম করতেন। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, এই আমলের ব্যাপারে সকল বিজ্ঞ সাহাবীগণ ছিলেন একমত। কথিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে মদীনার প্রশাসক মারওয়ান সর্বপ্রথমে ঈদের নামাজের পূর্বে খুতবা পাঠ করেছে। ফাতহুল বারী গ্রন্থে রয়েছে, সর্বপ্রথম ঈদের নামাজের পূর্বে খুতবার প্রচলন কে করেছে, সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে মারওয়ানই সর্বপ্রথম এরকম করেছিলো। এ সম্পর্কে সহিহ হাদিস গ্রন্থে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিস বর্ণিত হয়ে কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর পূর্বে হজরত ওসমান এরকম করেছিলেন। তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে তিনি নামাজ পড়ার পর খুতবা দিতেন। কিন্তু শেষ দিকে তিনি দেখলেন সকল মানুষ নামাজে উপস্থিত হতে পারে না। সেদিকে লক্ষ্য করে তিনি খুতবাকে এনেছিলেন নামাজের আগে। কিন্তু মারওয়ানের উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন। তার উদ্দেশ্য ছিলো নামাজের জন্য অপেক্ষমান মানুষদেরকে যথেচ্ছ বক্তৃতা শুনানো। তার বক্তৃতায় থাকতো স্বনামধন্য মানুষের প্রতি নিন্দাবাদ এবং আযোগ্য ও অখ্যাত লোকের গুণকীর্তন। হজরত আবু সাইদ খুদরীর হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেছেন, মারওয়ান বলতো, নামাজের পর মানুষ খুতবা শোনার অপেক্ষা করে না বলেই আমি নামাজের আগে খুতবা দেই। হজরত ওসমানও হয়তো এ কারণে কখনও কখনও নামাজের আগে ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু মারওয়ান সবসময় এরকম করতো। তাই এই আমলের

প্রবর্তক হিসাবে মারওয়ানই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সর্বপ্রথম নামাজের পূর্বে খুতবা দিয়েছেন হজরত আমীর মুয়াবিয়া। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন।

ইবনুল হেমাম হেদায়ার ব্যাখ্যা পুস্তক ফতহুল কাদিরে বলেছেন, হান্নান কাঠের মিম্বর বানানোর ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মাকরূহ। আবার কেউ কেউ বলেছেন উত্তম। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এতে কোনো দোষ নেই।

রসুল আকরম স. যে পথ দিয়ে ঈদগাহে যেতেন সে পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন না। প্রত্যাবর্তন করতেন অন্য পথ দিয়ে। ওলামায়ে কেরাম এর রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দা– জ্বিন, ইনসান, ফেরেশতারা যাতে এই ইবাদতের সাক্ষী হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি এক পথে যেতেন, ফিরতেন অন্য পথে। অথবা দুটি পথই যেনো তাঁকে সালাম করে ধন্য হতে পারে। তাই তিনি যাওয়ার আসার সময় দু'টি পথ ব্যবহার করতেন, আর এতে করে উভয় পথের পাশে বসবাসকারী মানুষও তাঁর সঙ্গে সালাম বিনিময় করে ধন্য হতো ও সওয়াব লাভ করতো কিংবা মানুষেরা তাঁর শুভাগমনের ফযীলত ও বরকতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করতো। তাঁর পবিত্র সংসর্গের সুবাস যাতে সকলেই পায় সে কারণেও হয়তো তিনি স. এরকম পথ বদল করতেন। এরকমও হতে পারে যে, হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মানুষের প্রয়োজন পূরণ, শিক্ষা দান প্রদর্শন, সদকা প্রদান, আপন সৌন্দর্য দর্শনের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি। উভয় রাস্তায় ইসলামের বিধি-বিধানের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো– আল্লাহ্র জিকিরের সঙ্গে তাঁর বাস্তব ও স্থিতি বা উল্লেখিত সকল কারণেই তিনি হয়তো যাওয়া আসার রাস্তা পরিবর্তন করতেন। উভয় রাস্তার পাশে বসবাসকারী কাফের ও মুশরিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাও তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে। আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে মুসলমানদের বিশাল সমাবেশ ও শানশওকত দৃষ্টে কাফের ও মুনফিকেরা যেনো লজ্জিত ও চিন্তিত হয়।

আলেমগণ বলেছেন, রসুলপাক স. ঈদগাহে গমন কালে রাস্তার ডানদিক দিয়ে হাটতেন। ওই একই পথে ফিরতে গেলে তাঁকে ফিরতে হতো বাম পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে, তাই তিনি অন্য পথ দিয়ে ফিরতেন। পথ পরিবর্তনের যে কারণটি সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ তা হচ্ছে ধর্মের শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পেতে তিনি এ রকম করতেন। মুসলমানদের সম্মিলিত উপস্থিতি দেখে তাঁরা যেনো ষড়যন্ত্র করতে ভয় পায়। এই অভিমতটির প্রসঙ্গে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কাফেরদের ষড়যন্ত্র রুখবার জন্যেই যদি তিনি এরকম করতেন, তবে এ আমলটি তিনি নিশ্চয় বার বার করতেন না। কারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে বার বার একই কৌশল অচল। কিন্তু এক্ষেত্রেও কথা উঠতে পারে যে, তাঁর গমন ও নিগর্মনের পথ সুনির্দিষ্ট ছিলো না।

সুতরাং এই অভিমতটি নির্দ্বিধ নয়। আরেকটি কারণে হতে পারে যে, জীবিত ও মৃত নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে ঈদের সৌহার্দ বিনিময়ই ছিলো তাঁর পথ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। জনতার ভীড় এড়াবার জন্যেও তিনি এরকম করে থাকতে পারেন। কেননা তিনি স. যখন কোথাও গমন করতেন তখন সহায়হীনদেরকে দান খয়রাত করতেন। তাদের কেউ যেনো বাদ না পড়ে তাই তিনি ফিরতেন অন্য পথে। অথবা ফকির মিসকিনদের পুনঃযাচ্‌ঞা এড়ানোই ছিলো এই পথ বদলের উদ্দেশ্য। এভাবে ঈদের দিন তিনি তাদেরকে ভৎর্সনা প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করতেন। মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া প্রণেতা শেষোক্ত মতটিকে দুর্বল ও সুদূর পরাহত বলেছেন। উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, গমনের সময় লক্ষ্য ছিলো আল্লাহ্‌পাকের মাগফিরাত, রেজা, নৈকট্য ও মিলন। প্রত্যাবর্তনের পথে এই লক্ষ্যগুলো থাকতো না। তাই তিনি অন্য পথে ফিরে আসতেন। এ কারণটি সূক্ষ্মতা ও অস্পষ্টতামুক্ত নয়। আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, গমন পথ হতো দীর্ঘ, ইবাদতের উদ্দেশ্যে গমন করলে অধিক পদ বিক্ষেপের জন্যে অধিক পুণ্যের সুসংবাদ রয়েছে। প্রত্যাবর্তনের পথ সেরকম সুসংবাদমণ্ডিত নয়। তাই তাঁর গমন পথ হতো দীর্ঘ এবং প্রত্যাবর্তনের পথ হতো সংক্ষিপ্ত। ওলামায়ে কেরাম এ অভিমতটির বিষয়েও উচ্চাবাচ্য করেছেন। কেননা ইবাদত থেকে প্রত্যাবর্তনের পদবিক্ষেপেও পুণ্য থাকবে বলে প্রমাণ রয়েছে। হজের বেলায়ও এরকম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

উপরে বর্ণিত সকল কারণগুলোই সম্ভাব্য। কারণগুলোর কোনোটাই পূর্ণ বিশ্বাস্য ও সংহত নয়। ইবনে হামজা বলেছেন, হজরত ইয়াকুবের উপদেশের আনুকূল্য রক্ষা করাই ছিলো তাঁর এরকম আমলের উদ্দেশ্য। কোরআন মজীদে রয়েছে, 'হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন তোমরা (রাজ দরবারে) এক দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। 'কুদৃষ্টি' থেকে বেঁচে থাকবার জন্যে তিনি এরকম বলেছিলেন। আল্লাহ্‌পাকই প্রকৃত তথ্য অবহিত।

এস্তেস্কার নামাজ

এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, এস্তেস্কার নামাজ সুন্নত। তবে ইমাম আবু হানিফা ওই সকল হাদিসের আলোকে এই নামাজকে সুন্নতের খেলাপ বলেছেন, সে সকল হাদিসে এই নামাজের উল্লেখ নেই। জমহুর ওলামা বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে এস্তেস্কার নামাজকে সাব্যস্ত করেছেন, ওই সকল হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. এস্তেস্কার দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন। আর তাঁরা নামাজের উল্লেখবিহীন হাদিসগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ওগুলোতে বর্ণনাকারীর ভুলের কারণে নামাজ শব্দটি বাদ পড়েছে। ওই বর্ণনাগুলোর কোনো কোনোটি আবার জুমআর খুতবা বিষয়ক। এ কথা সকলেই জানে যে, খুতবার পর

রয়েছে নামাজ। তাই ওগুলোতে নামাজের কথা উল্লেখই করা হয়নি। আর ওই হাদিসগুলো যদি জুমআ সম্পর্কিত না হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে নামাজ পাঠ ব্যতিরেকে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্যে দোয়ার সমাবেশ করা জায়েয। এই জায়েয বুঝাতে গিয়েই নামাজের কথা আর উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এস্তেস্কার নামাজ যে বৈধ সে সম্পর্কে কোনোরূপ মতানৈক্য নেই। উসুলে হাদিসের রীতি হচ্ছে, সাব্যস্তকারী বর্ণনা অস্বীকারকারী বর্ণনার তুলনায় অগ্রগণ্য। এই অভিমতটি শাফেয়ী মাজহাবের।

এস্তেস্কার জন্যে বিধিবদ্ধ কোনো নামাজ নেই। আল্লাহ্‌পাকের এরশাদে রয়েছে কেবল এস্তেস্কার জন্যে এস্তেগফার এবং দোয়া করার কথা। বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাপরবশ। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করবেন।" ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বৃষ্টিপ্রার্থনা বিষয়ক হাদিসগুলোতে নামাজ পড়ার কথা বলা নেই। কেবল একটি বর্ণনায় রয়েছে, রসুলপাক স. নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত প্রান্তরে গমন করেছিলেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামাজ পড়ার পর বক্তৃতা করেছিলেন। এই হাদিসটি তার আপন বৈশিষ্ট্যে শুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি। যদি এটিকে শুদ্ধ বলে মেনে নেয়াও যায়, তবে বুঝতে হবে ওই নামাজ ছিলো কেবল তার জন্যে সুনির্দিষ্ট। ওই আমলকে সুন্নত বলা যায় যা তিনি নিয়মিত আমল করেছেন (দুই একবার বাদ পড়লেও), কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নামাজ না পড়ার বর্ণনাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেবল একটি বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি জীবনে মাত্র একবার এ নামাজ পড়েছেন। হাদিসটি আবার বিশুদ্ধতার স্তরেও উন্নীত হয়নি। আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুকও এস্তেস্কার আমল করেছেন কিন্তু তিনি কেবল দোয়া ও এস্তেগফার করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, নামাজ পাঠ করেননি। এস্তেস্কার নামাজের বিধান থাকলে তিনি নিশ্চয় তা জানতেন, অন্য সাহাবীগণও জানতেন। আর জানা সত্ত্বেও কোনো সুন্নত আমল ত্যাগ করাও সুসংগত নয়। এস্তেস্কার নামাজের পক্ষ ও বিপক্ষ অভিমতের সামঞ্জস্য বিধান করতে যেয়ে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা এস্তেস্কার নামাজ অস্বীকার করেছেন এই অর্থে যে, জামাতবদ্ধ হয়ে অথবা ঈদের নামাজের মত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অবস্থায় এস্তেস্কার বিধিবদ্ধ কোনো নামাজ নেই। যদি কেউ একা একা এস্তেস্কার নামাজ পড়ে, কান্নাকাটি করে ও দোয়া এস্তেগফারে লিপ্ত হয় তবে তা হবে বৈধ, সুন্দর এবং প্রশংসনীয়।

এস্তেস্কা সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর মধ্যে এবং সেগুলোর সনদে কিছু কিছু ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা তাই বর্ণনাগুলোর মূল উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করেছেন। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দোয়া ও এস্তেগফার। নামাজ পড়াকেও তিনি জায়েয

রেখেছেন। তবে অন্যান্য আমল যেমন খুতবা ইত্যাদি নিঃসন্দিগ্ধ না হওয়ার কারণে সেগুলোকে সমর্থন করেননি। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন।

সাহেবাঈন এবং তিন ইমামের মতে নামাজের জামাত এবং খুতবা জায়েয। কেউ কেউ বলেছেন, এই মতটি গ্রহণ করেছেন কেবল ইমাম মোহাম্মদ। ইমাম আবু ইউসুফ এক্ষেত্রে ইমামে আজমকেই সমর্থন করেছেন। হানাফী মাজহাবের অভিমত সাহেবাঈনের (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের) মতানুসারে হয়ে থাকে।

রসুল আকরম স. ইস্তেস্কার নামাজ ও দোয়ার সময় অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে রোদন করতেন। মোনাজাতের সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন অনেক উর্ধ্বে। এতে করে তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হতো। হস্তদ্বয় উঠে যেতো মাথার উপরে। আলেমগণ বলেছেন, পরিস্থিতিটি যেহেতু কঠিন তাই তাঁর নিবেদন ও যাচ্ঞাও হতো হৃদয়বিদারক। সেকারণেই প্রার্থনার সময়ে তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় উত্তোলিত হতো অনেক উর্ধ্বে।

মেশকাত শরীফে মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল পাক স. এস্তেস্কার নামাজে রহমতের বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থনার সময় তিনি দুই হাতের পিঠ আকাশের দিকে বিস্তৃত করে দিতেন। অন্য সকল দোয়ার সময় তাঁর হাতের দুই তালূ থাকতো আকাশের দিকে। কিন্তু এস্তেস্কার প্রার্থনায় হতো এর বিপরীত। অর্থাৎ দুই হাতের তালু থাকতো মাটির দিকে আর হাতের পৃষ্ঠদেশ থাকতো আকাশের দিকে। আবু দাউদের বর্ণনায় এরকম বলা হয়েছে। আলেমগণ বলেছেন, সকল দোয়ায় দুই হাতের তালু আকাশের দিকে রাখতে হয়। আর ফেতনা ও বালামুসিবত দূর করার জন্য দোয়া করা হলে দুই হাতের পৃষ্ঠদেশ রাখতে হয় আকাশের দিকে। এরকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেতনা ও বালামুসিবতের উত্তাপকে আল্লাহ্পাক যেনো শীতল করে দেন। আর সেই মুসিবত যদি মৃত্তিকা থেকে উদগত হওয়ার উপক্রম হয় তবে আল্লাহ্পাক তাকে যেনো মৃত্তিকার মধ্যেই তা প্রোথিত করে দেন।

তাইয়েবী বলেছেন, ইস্তেস্কার দোয়ায় কেবল হাত নয়, পরিধেয় চাদর ও জামাও উল্টিয়ে পরতে হয়। হাদিস শরীফে এরকম বর্ণনা রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, উল্টা করে চাদর পরিধান করার মধ্যে রয়েছে বৃষ্টিহীনতার প্রতীক। এর মধ্যে আরও রয়েছে, ফল ও ফসল দ্বারা দুর্ভিক্ষকে এবং রহমতের বৃষ্টি দ্বারা অনাবৃষ্টিকে অপসারিত করার নিবেদন। কেউ কেউ বলেছেন, রসুল পাক স. এরকম করতে নির্দেশ দিয়েছেন বলেই এরকম করতে হয়। তিনি স. বলেছেন, এরকম করো যদি, তবে তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হবে। এরকম

বিপরীত ভঙ্গির সঙ্গে প্রার্থনাও করতে হবে। প্রার্থনা ব্যতিরেকে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

তিনি স. কয়েকবার এস্তেস্কার নামাজ আদায় করেছেন। একবার আদায় করেছেন দুর্ভিক্ষের সময়। তিনি সেদিন জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন দণ্ডায়মান হয়ে বিনেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার মাল মাত্তা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত। আমাদের জন্য দোয়া করুন। তখন রসুল পাক স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করুন। এরকম প্রার্থনার পরক্ষণেই আকাশে জমা হতে থাকলো পাহাড়ের মতো পুঞ্জিভূত মেঘ। একটু পরেই শুরু হলো বৃষ্টি। পরের শুক্রবার খুতবার সময় সেই বেদুঈন পুনরায় দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাদের বাড়ীঘর তো ধ্বংস হওয়ার উপক্রম। আর আমাদের আসবাবপত্র সব পানিতে ডুবে যাচ্ছে। তিনি পুনরায় দোয়া করলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, আদম সন্তানের মতিগতির এই পবির্তন দেখে তিনি মৃদু হাসলেন এবং হস্ত উত্তোলন করে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। বৃষ্টি বর্ষণ করুন আমাদের শস্য প্রান্তরে, উপত্যকায়– আমাদের উপর নয়। দোয়ার পর তিনি হাতের আঙ্গুল দ্বারা যেদিকে ইশারা করেছিলেন, সেদিকেই ছুটে যাচ্ছিলো উড়ন্ত মেঘমালা। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, মদীনার উপর থেকে মেঘসম্ভার সরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করলো। বৃষ্টির একটি ফোঁটাও পড়লো না মদীনার মাটিতে।

দ্বিতীয় বার ইস্তেস্কার নামাজ পড়ার জন্য রসুল পাক স. অত্যন্ত বিনম্র পদবিক্ষেপে উন্মুক্ত প্রান্তরে উপনীত হলেন। সেখানে রক্ষিত মিম্বরের উপর উঠে তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলির উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। বক্তৃতায় বললেন–

সকল স্তবস্তুতি আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি বিশ্বসমূহের প্রতিপালক। তিনি অসীম দয়াময় ও করুণাপরবশ। তিনি বিচার দিনের অধিকর্তা। আল্লাহ্‌ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তেমনই করেন যেমন তাঁর অভিপ্রায়। হে আল্লাহ্! তুমিই আল্লাহ্। তুমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। তুমি যেরকম ইচ্ছা করো, সেরকমই করো। হে আমাদের আল্লাহ্! তুমিই একমাত্র আল্লাহ্। তুমি ছাড়া উপাসনা লাভের অধিকারী কেউ নেই। তুমি বিত্তশালী আর আমরা সহায়হীন। আমাদের উপর অবতীর্ণ করো তোমার রহমতের বৃষ্টি। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই বৃষ্টির মাধ্যমে আমাদেরকে শীতল করো, পরিপূর্ণ করো।

এভাবে বক্তৃতা ও প্রার্থনা করার পর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। তারপর আযান ও ইকামত ছাড়া দুই রাকাত নামাজ পড়লেন। নামাজে কোরআন পাঠ করলেন উচ্চস্বরে। প্রথম রাকাতে পড়লেন সুরা ফাতেহা, তারপর

সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পর হালআতাকা হাদিসুল গশিয়া। তাঁর ওই কোরআন পাঠ ছিলো জুমআ ও ঈদের নামাজের কোরআন পাঠের মতো। নামাজ শেষ হতে না হতেই আকাশ ভরে গেলো মেঘে। শুরু হলো বজ্র ও বিদ্যুতের গর্জন। আকাশ জুড়ে নামলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি। মসজিদে নববীর নিকট ফিরে আসতে না আসতেই পথে প্রান্তরে বয়ে যেতে লাগলো পানির স্রোত। রসুল আকরম স. দেখলেন বৃষ্টিসিক্ত মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। তিনি নিজেও হাসলেন। বললেন, আশহাদু আল লা ইলাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর ওয়াআন্না আবদুহু ওয়া রসুলুহু (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্‌তায়ালা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁরই বান্দা ও রসুল)। ইমামগণ এই হাদিস দ্বারাই এস্তেস্কার নামাজের দলিল পেশ করে থাকেন।

তৃতীয়বার তিনি স. মদীনার মসজিদে মিম্বরে বসে এস্তেস্কার দোয়া করেছিলেন। তখন কিন্তু জুমআর খুতবা ছিলো না। এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী তাঁর দালায়েলুন নবুওয়াত পুস্তকে বর্ণনা করেছেন— রসুল পাক স. তবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন বনী কারারা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়ে দুর্ভিক্ষের কথা জানালো, বললো ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি যেনো আপনার সুপারিশ কবুল করেন। তাদের কথা শুনে রসুল পাক স. বললেন, 'ওয়ায়লাকুম' তোমাদের জন্য আক্ষেপ! তোমরা হক তায়ালাকে অভিযুক্ত করেছো। কে আছে এমন যে, তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি সমুন্নত ও মহিমান্বিত। একটু পরেই তিনি পুনরায় বললেন, তোমাদের এই ফরিয়াদ ও ভয়-ভীতির কারণে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রসন্ন হয়েছেন। তাদের একজন তখন বললেন, সত্যিই কি আমাদের প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন। তিনি স. বললেন, হাঁ। বেদুঈন বললেন, তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট যাচ্‌ঞা করবো না কেনো? তিনিতো আমাদের প্রতি প্রসন্ন। বেদুঈনের কথা শুনে রসুল করীম স. মৃদু হাসলেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে দুই হাত তুলে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। বৃষ্টিপাত শুরু হলো এবং বৃষ্টি বর্ষণ চললো এক সপ্তাহ ধরে। এই হাদিসে এস্তেস্কার নামাজ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই। বর্ণনা রয়েছে কেবল খুতবা ও দোয়া সম্পর্কে।

চতুর্থবার তিনি স. মসজিদে নববীতে কেবল দোয়াই করেছিলেন। দোয়ার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হননি। মিম্বরেও আরোহণ করেননি। তিনি স. তখন প্রার্থনা করেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করো। ওই বৃষ্টি যা আমাদের ক্লেশ

অপসারিত করে এবং যা আসে অতি দ্রুত, বিলম্বে নয়। আমাদেরকে দান করো ওই বৃষ্টি যা আমাদের জন্য বয়ে আনে উপকার, ক্ষতি নয়।

তিনি স. পঞ্চমবার বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন মদীনা মনোয়ারার নিকটবর্তী 'য়াজারুজ্যায়াত' নামক স্থানে। ওই স্থানে দাঁড়িয়ে মুখমণ্ডল বরাবর হাত উঠিয়ে তিনি দোয়া করেছেন। দোয়ার সময় কখনও কখনও তার হাত মাথার উপরে উঠে যাচ্ছিলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো এক যুদ্ধের সময়। তখন মুশরিক বাহিনী পানির স্থান ঘিরে রেখেছিলো। মুসলিম বাহিনী ছিলো পানি থেকে বঞ্চিত। পিপাসার্ত যোদ্ধাগণ তখন রসুল পাক স. কে তাদের দুরবস্থার কথা জানালেন, ইহুদি মুনাফিকেরা মুশরিক বাহিনীতে গিয়ে বললো মোহাম্মদ যদি নবী হতো, তবে তার সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যে পানির ব্যবস্থা করে দিতো। হজরত মুসা ছিলেন সত্য নবী। তাই তিনি তাঁর সঙ্গীদের জন্যে পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। একটি পাথরে তাঁর লাঠি দ্বারা তিনি আঘাত করেছিলেন। ফলে ওই লাঠি থেকে নির্গত হয়েছিলো বারটি ঝর্ণা। বনী ইসলাইলেরা ছিলো বারটি গোত্রে বিভক্ত। বারটি গোত্রের জন্যেই প্রবাহিত হয়েছিলো বারটি ঝর্ণা। কোরআন মজীদেও এ রকম বর্ণনা রয়েছে।

ইহুদিদের অপপ্রচার কানে এলে তিনি সাহাবীগণকে বললেন, ঠিক আছে তোমরা চিন্তা কোরো না। আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চয় তোমাদেরও পানি দান করবেন। একথা বলেই তিনি স. দোয়ার জন্যে হাত ওঠালেন। দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে মেঘে মেঘে ভরে গেলো আকাশ। অন্ধকার হয়ে গেলো চরাচর। শুরু হলো মুষল ধারায় বৃষ্টি। নিম্নভূমি ও উপত্যকাগুলো সয়লাব হয়ে গেলো পানিতে।

উপরে বর্ণিত বৃষ্টি প্রার্থনার প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলো বিভিন্নভাবে বিবৃত হয়েছে বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি শরীফে। এরকম আরও একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো মক্কা শরীফে। কুরায়েশেরা তখন ক্রমাগত প্রচণ্ড বিরোধিতা করে যাচ্ছিলো ইসলামের। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে তিনি তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! হজরত ইউসুফের জামানার মতো দুর্ভিক্ষ তুমি তাদের প্রতি আপতিত করো। তাঁর এই প্রার্থনার ফলে দুর্ভিক্ষ নেমে এলো কুরায়েশদের উপর। খাদ্যাভাবে তখন তারা মৃত পশু, চামড়া, হাড় ইত্যাদি খাওয়া শুরু করে দিলো। একদিন দেখলো আকাশে ধুম্রকুণ্ডলীর মতো বস্তু উড়ে চলে যাচ্ছে, তখন নিরুপায় আবু সুফিয়ান বললো, 'হে মোহাম্মদ! তুমি তো প্রেরিত হয়েছো সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে, অথচ দ্যাখো তোমার সম্প্রদায় ধ্বংস হতে চলেছে। তুমি বৃষ্টির জন্যে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করো। রসুল পাক স. দোয়া করলেন। বৃষ্টি হলো। দূর হয়ে গেলো দুর্ভিক্ষ। এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে সুরা 'আদদু খান' এর তাফসিরে।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, রসুল পাক স. এর বদদোয়ার কারণে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিলো। তখন থেকে যখন মুশরিকেরা নামাজরত অবস্থায় তার উপর চাপিয়ে

দিয়েছিলো উটের নাড়িভুড়ি। তারা আরো বলেছেন, হজরত আবু তালেব তাঁর স. প্রশস্তি গাইতে গিয়ে ওই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন– তাঁর অসিলায় মেঘমালা থেকে বৃষ্টি যাচ্ঞা করা হয়। অন্য ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছিলো মদীনায়। হজরত আবু তালিব তখন জীবিত ছিলেন না। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আবু তালেবের উপরোক্ত বক্তব্যে হজরত আবদুল মোত্তালেবের সময়ের দুর্ভিক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স. তখন ছিলেন বালক। এই বালক বয়সে তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁর অসিলায় মেঘমালা থেকে বৃষ্টি যাচ্ঞা করা হয়– আবু তালেবের সেই উক্তি দ্বারা রসুল পাক স. এর বৃষ্টি প্রার্থনার কথা বলা হয়নি। বরং বক্তব্যটির মর্ম ছিলো এই যে– রসুল আকরম স. অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাশালী। তিনি যদি বৃষ্টি প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ্পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বৃষ্টিবর্ষণের অধিকারী আল্লাহ্। তিনি তাঁর হাবীব স. দোয়ার অসিলায় ওই বৃষ্টি দান করে থাকেন। অতএব এ কথাটি প্রমাণিত যে, তিনি স. দুনিয়া ও আখেরাতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল রিজিকের অসিলা। তাঁর অসিলাতে আল্লাহ্পাক সৃষ্টিকে সকল প্রকার রিজিক দান করে থাকেন।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের নামাজ

চন্দ্রগ্রহণকে বলা হয় 'খুসুফ' এবং সূর্য গ্রহণকে বলা হয় 'কুসুফ'। এরকম বলাই অভিধানসম্মত। কিন্তু হাদিস শরীফের বর্ণনায় উভয় স্থলে 'কসুফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনও উভয় স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে 'কুসুফ' শব্দটি। মোহাদ্দেছগণ চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে খুসুফ এবং সূর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কুসুফ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস ব্যতীত অন্য সকল হাদিসে সূর্যগ্রহণের নামাজের কথা বলা হয়েছে। একটি হাদিসে কেবল রয়েছে চন্দ্রগহণের কথা, যা শায়েখ ইবনে হাজার তাঁর মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তোমরা নিদর্শন দু'টি দেখলে আল্লাহ্তায়ালাকে স্মরণ কর। হজরত আয়েশা সিদ্দিকার বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা তখন আল্লাহ্তায়ালাকে ডাক, তকবীর দাও, নামাজ পড়ো এবং দান খয়রাত করো। কিন্তু রসুলপাক স. ওই সময় কী করতেন তা বর্ণিত হাদিস দু'টি থেকে অবহিত হওয়া যায় না। হজরত আয়েশা সিদ্দিকার অন্য একটি বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রসুল পাক স. সূর্য গ্রহণের নামাজ অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। স্বাভাবিক নামাজের চেয়ে ওই নামাজের ক্বেরাত, রুকু ও সেজদা হতো দীর্ঘ। ওই নামাজে তিনি পাঠ করতেন সুরা 'বাকারা'র মতো দীর্ঘ ক্বেরাত। রুকু সেজদা করতেন দীর্ঘক্ষণ ধরে।

হাদিস শরীফে রয়েছে ওই নামাজে তিনি দুইবার রুকু করতেন। এক বর্ণনায় রয়েছে তিনবার, চার বার অথবা পাঁচ বার রুকু করতেন। একবার রুকুর পর মাথা তুলে দাঁড়াতেন, পুনর্বার রুকুতে যেতেন, এরকম তিন চার বার করতেন তিনি। রুকু অবস্থায় থাকতেনও দীর্ঘক্ষণ ধরে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সূর্যগ্রহণের নামাজের প্রতি রাকাতে দুই রুকু করতে হবে এবং নামাজ আদায় করতে হবে খুতবা সহযোগে। ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ উক্তিও এরকম। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবীর মতে– সূর্যগ্রহণের নামাজ প্রতি রাকাতে এক রুকুসহ পড়তে হয় এবং সেই নামাজের জামাত হয় না। খুতবাও পড়তে হয় না। এর প্রমাণ রয়েছে হজরত ইবনে ওমরের হাদিস। ওই হাদিসটি আমাদের মাজহাবের দলিল।

হেদায়া পুস্তকে বলা হয়েছে, পুরুষদের উপর সূর্যগ্রহণের নামাজের হাল অধিক উদ্ভাসিত হয়, কেননা তারা প্রথম কাতারে দাঁড়ান। আর রমণী ও অপ্রাপ্ত বয়স্করা দাঁড়ায় পিছনের কাতারে। শায়েখ ইবনে হেমামও এই বিষয়ে বিশুদ্ধ ও উত্তম বর্ণনাগুলোকে বর্ণনা করেছেন। ওই বর্ণনাগুলো হানাফী মাজহাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর এক রাকাতে একাধিক রুকু'র বর্ণনাসম্বলিত হাদিসগুলো শুদ্ধসূত্রসম্বলিত নয়। হাদিসগুলোর বর্ণনাকারীগণ ছিলেন দোলায়িতচিত্ত। তাঁরা দোদুল্যমান ছিলেন বলেই কেউ দুই, কেউ তিন, কেউ চার, আবার কেউ পাঁচ রুকুর কথা বলেছেন। তাই এক্ষেত্রে নামাজের স্বাভাবিক নিয়মকেই অপরিহার্যরূপে মান্য করাই সংগত। কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, বর্ণনাকারীগণের বিভিন্ন রকম বর্ণনার কারণ ছিলো সন্দেহ। ওই নামাজে ভীড় হত অত্যাধিক। তাই যারা পিছনের কাতারে ছিলেন, তারা প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। আর এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, রসুল আকরম স. এর সময়ে গ্রহণ লেগেছিলো কেবল একবার। একাধিক গ্রহণ সম্পর্কে কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

ওই গ্রহণ হয়েছিলো রসুল আকরম স. এর প্রিয় পুত্র হজরত ইব্রাহীমের ইন্তেকালের সময়। হজরত ইব্রাহীম অষ্টম হিজরীতে জননী মারীয়া কিবতীয়ার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর ইন্তেকাল করেছিলেন দুগ্ধ পানের বয়সে দশম হিজরীতে। তাঁর তিরোধানের পর লোকমুখে একথাটি প্রচারিত হয়েছিলো যে, সূর্যগ্রহণ লেগেছে হজরত ইব্রাহীমের ইন্তেকালের কারণে। ভয়াবহ কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে সূর্যগ্রহণ হয়– এই ছিলো তখনকার জনবিশ্বাস। তাই সকলেই তখন মনে করেছিলো, রসুল পাক স. এর পুত্রবিয়োগের ভয়াবহ ও শোকাবহ পরিস্থিতির কারণেই গ্রহণ লেগেছে সূর্যে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌পাকের অপার ক্ষমতার দু'টি বিস্ময়কর নিদর্শন। বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের জন্যে এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ গ্রহণের উৎস। আল্লাহ্‌তায়ালা চন্দ্র ও সূর্যের প্রোজ্জ্বলতাকে মুহূর্তে নিভিয়ে দিতে পারেন। আলোর বদলে প্রতিষ্ঠিত করতে

পারেন অন্ধকারকে। ইমানের আলোকে ঠিক তেমনি এক মুহূর্তে ম্লান করে দিতে পারেন, যদি ইচ্ছা করেন।

বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইব্রাহীম পরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন দশই মহরমে অথবা দশই রবিউল আওয়ালে। এ বর্ণনার দ্বারা গণকদের অসৎ বিশ্বাসও পরিত্যাজ্য প্রমাণিত হয়। তারা বলে থাকে, গ্রহণ সংঘটিত হয় মাসের শেষ তিনটি দিবসের মধ্যে। তারা যদি বলে থাকে সাধারণত এ রকম হয়, তবে তা সম্ভব। কিন্তু যদি বলে থাকে মাসের শেষ তিনদিন ছাড়া অন্য সময় গ্রহণ অসম্ভব– তবে তা বাতিল। নিশ্চয় বাতিল। 'আল্লাহু আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বদীর' (আল্লাহ্‌পাক সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান)।

ভীতিকালীন অবস্থার নামাজ

শত্রুভীতির কারণে নামাজ আদায় করা কিতাব ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। কোরআন মজীদে এরশাদ করা হয়েছে, "আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন, অতঃপর আপনি তাদের নামাজ কায়েম করবেন, তখন একটি দল যেনো নামাজে দাঁড়িয়ে যায়।" অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে, "যখন তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো, তখন নামাজে কসর করাতে কোনো দোষ নেই।" অধিকাংশের মতে চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজকে দুই রাকাতে কসর করতে হবে। কেউ কেউ শেষোক্ত আয়াত দ্বারা ভীতিকালীন নামাজকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁদের মতে ভীতিকালীন অবস্থায় নামাজকে কসর করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফের এক বর্ণনানুসারে হাসান ইবনে জিয়াদ আহনাফ থেকে এবং মজনী শাওয়াকে থেকে উদ্ধৃত হয়েছে এই নামাজ রসুল পাক স. এর জামানার জন্য নির্ধারিত ছিলো। তাঁর পশ্চাতে আদায় করার উপরই রয়েছে এই নামাজের ফযীলত। 'আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন'– এ কথার প্রকাশ্য অর্থ এরকমই। জমহুর ওলামার পছন্দনীয় মত হচ্ছে, নবী পাক স. এর জামানার পরেও এই নামাজ পাঠ বৈধ। কারণ পরবর্তীতে হজরত আলী, হজরত আবু মুসা আশআরী এবং হজরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান এই নামাজ কায়েম করেছেন। 'আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন'– এ কথার অর্থ আপনি অথবা আপনার কোনো প্রতিনিধি যখন তাঁদের মধ্যে অবস্থান করবেন'– এরকমও হতে পারে। যেমন, হাজা মিন আসওয়ালিহিম আয়াত দ্বারা বিত্তশালীদের নিকট থেকে জাকাত আদায় করার জন্য নবীপাক স. কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশ তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমেও প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব। ভীতিকালীন অবস্থায় ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় নামাজ আদায়ের তাগিদ দেয়া হয়েছে। এর অন্যথা করার অবকাশ নেই। শত্রুর সম্মুখে কৌশলগত কারণে নবী পাক স. এই নামাজ পাঠ করেছেন। এই নামাজের কয়েকটি পদ্ধতি হাদিস শরীফ দ্বারা সুসাব্যস্ত। ওই পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে ইমামগণ একেক জন একেক রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। হজরত ওমর বর্ণিত পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা। বর্ণনাটি সিয়াহ সিত্তার

সবকয়টি গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। হজরত ওমর বলেছেন, আমরা নবী পাক স. এর সঙ্গে নজদের দিকে এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা নামাজের জন্য সারিবদ্ধ হলাম। নবী পাক স. ইমাম হয়ে আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পাঠ করলেন এভাবে– আমাদের একটি দল নবীপাক স. এর সঙ্গে এক রাকাত নামাজ আদায় করলেন। অপর দলটি তখন শত্রুদের গতিনিধি পর্যবেক্ষণ করছিলো। নামাজে অংশগ্রহণকারী প্রথম দলটি এক রাকাত নামাজ শেষে দ্বিতীয় দলের অবস্থানে গিয়ে দাঁড়ালো এবং শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকলো। দ্বিতীয় দলটি নবী পাক স. এর সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়লেন। এভাবে তিনি স. দু'রাকাত নামাজ পড়ে সালাম ফিরালেন। তারপর প্রথম ও দ্বিতীয় দলটি তাঁদের বাদ পড়ে যাওয়া এক রাকাত নামাজ আদায় করে নিলেন। হাদিসটি বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সিয়াহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থেও অনুরূপ হাদিস রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এই পদ্ধতিটি কোরআন মজীদে উল্লেখিত নির্দেশনার অধিক অনুকূল। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এ কথাটি পরিষ্কার নয় যে, ওই নামাজ কোন ওয়াক্তের নামাজ ছিলো। তবে বর্ণনাদৃষ্টে এতটুকু অনুমিত হয় যে, ওই নামাজ পঠিত হয়েছিলো সফর অবস্থায়। এ ব্যাপারে হানাফী মাজহাবের নিয়মে রয়েছে অধিক ব্যাপকতা। হানাফী মাজহাব অনুসারে সফরের অবস্থায় হোক অথবা গৃহবাসের অবস্থায়– সকল অবস্থায় ভীতির নামাজ জায়েয। দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাজ সকল অবস্থায় উপরোক্ত নিয়মে ইমাম এক দলকে নিয়ে প্রথম রাকাত এবং অপর দলকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবেন। এই নিয়ম সফর অথবা গৃহবাস উভয় অবস্থায় প্রতিপালিত হবে। আর মুকিম অবস্থায় চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে ইমাম প্রথম দলকে নিয়ে প্রথম দুইরাকাত এবং দ্বিতীয় দলকে নিয়ে শেষ দুই রাকাত আদয় করবেন। মাগরিবের নামাজ হলে প্রথম দলকে নিয়ে আদায় করবেন দুই রাকাত এবং দ্বিতীয় দলকে নিয়ে আদায় করবেন শেষ এক রাকাত। ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব এরকম। তবে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওই জামাতের ইমাম হতে হবে নবী পাক স. কে। আর ইমাম মালেকের মতে ভীতির নামাজ কেবল সফরের সময় পড়া জায়েয, মুকিম অবস্থায় জায়েয নয়।

বিভিন্ন গ্রন্থে বিশুদ্ধসূত্র পরম্পরায় ভীতির নামাজের আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সকল বর্ণনা উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই এখানে একটি মাত্র পদ্ধতি উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করা হলো। পরিস্থিতি যদি আরো বেশী ভয়ংকর হয় তবে যেভাবে উত্তম সেভাবেই নামাজ আদায় করে নিতে হবে। মাটিতে অথবা আরোহী অবস্থায় তখন ইশারায় রুকু, সেজদা আদায় করেও নামাজ পড়া যাবে। আর কোনো প্রকারেই নামাজ আদায় করা সম্ভব নয় এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে নামাজ কাযা করতে হবে। খন্দকের যুদ্ধে এরকম করতে হয়েছিলো। রসুল আকরম স. তখন বলেছিলেন, অবিশ্বাসীরা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামাজ (আসরের নামাজ) আদায় করতে দিলো না। আল্লাহ্তায়ালা তাদের গৃহ ও

সমাধিকে আগুন দ্বারা ভরপুর করে দিন। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, উহুদ যুদ্ধে তিনি স. এর চেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছেন। তখন তাঁর পবিত্র দন্ত উৎপাটিত হয়েছিলো। রক্তরঞ্জিত হয়েছিলো পবিত্র অবয়ব। অথচ তখন তিনি কাফেরদের জন্য দোয়া করেছিলেন এই বলে যে, হে আল্লাহ্! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কেননা তারা আমার প্রকৃত পরিচয় জানে না। তাই প্রশ্ন জাগে, খন্দকের যুদ্ধে তিনি ওইরূপ বিপদগ্রস্ত না হলেও কাফেরদের জন্য বদদোয়া করলেন কেনো? প্রশ্নটির জবাবে এই বলা যেতে পারে যে, উহুদে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে। ব্যক্তিগত কষ্টকে তিনি তখন কষ্টই মনে করেননি। তাই তাদের জন্য দোয়া করেছেন। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে কাফেরেরা হস্তক্ষেপ করেছিলো আল্লাহ্পাকের অমোঘ নির্দেশ নামাজের উপর, তাই তিনি তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে– অবিশ্বাসীরা তখন বলাবলি করছিলো, মুসলমানদের নামাজ পাঠের সময় যদি আক্রমণ করতে পারি তবে আমরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারবো। তারা তখন এমনও বলেছিলো, মুসলমানদের নিকট আসরের নামাজ তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়। সুতরাং আসরের সময়েই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাদের এই কথোপকথন সম্পর্কে হজরত জিব্রাইল নবী পাক স. কে অবহিত করলেন। তখন তিনি স. ভীতির (খওফের) নামাজ আদায় করলেন।

সফরকালীন ইবাদত

সফর অবস্থায় তিনি স. যে সকল ইবাদত করেছেন, যেভাবে সফরের আদব রক্ষা করে বাহনে আরোহণের সময়, বাহন থেকে অবতরণের সময়, কোনো স্থানে অবস্থাকালে এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যে সকল দোয়া ও জিকির আজকার করেছেন, সে সকল বিষয়ের বর্ণনা হাদিস গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান। এখানে কেবল সফর সংক্রান্ত দুটি মাসআলার সমালোচনা করা হবে– কসর এবং জমা (দুই ওয়াক্তের নামাজ একীভূত করা)। সফরে চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে দুই রাকাত পাঠ করতে হয়। এই মাসআলাটি ঐকমত্যসম্ভূত। মতানৈক্য কেবল এতটুকু যে, হানাফী মাজহাব অনুযায়ী কসরের বিধানটি অনমনীয় (আজিমত)। অর্থাৎ চার রাকাতের ক্ষেত্রে দু' রাকাত পড়তে হবে। পূর্ণ চার রাকাত পড়লে জায়েয হবে না। যদি দুই রাকাতের পর বসে তাশাহহুদ পাঠ করে তারপর দুই রাকাত পড়ে তবে জায়েয হবে (তখন শেষের দুই রাকাত হয়ে যাবে নফল)। আর যদি দুই রাকাতের পর না বসে তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মালেকের মাজহাবও এরকম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মাজহাবে কসর করার বিধানটি নমনীয় (রুখসত)। অর্থাৎ কেউ যদি চার রাকাত ও আদায় করে তবু তা জায়েয হবে।

অবশ্য রসুল পাক স. সফরে চার রাকাত নামাজ পুরোপুরি আদায় করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু জননী আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, রসুল পাক স. সফর অবস্থায় কখনও নামাজ কসর পড়েছেন আবার কখনও পুরা পড়েছেন। কখনও রোজা রেখেছেন। আবার কখনও ভেঙেছেন। এই হাদিসটি বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত উপনীত হয়নি। সাহাবীগণের কেউ সফরে চার রাকাত নামাজ পড়েননি। কিন্তু আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী তাঁর খেলাফতের শেষ দিকে হজের সময় চার রাকাত নামাজ পুরা পড়েছেন। ওলামায়ে কেরাম এর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, হজরত আয়েশা সিদ্দিকাও এরকম পড়তেন। রসুল পাক স. সফরের সময় কেবল ফরজ নামাজ আদায় করতেন, তখন ফজরের সুন্নত ও বিতির ছাড়া অন্য সুন্নতগুলো তিনি আদায় করেছেন বলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জোহরের পরের দুই রাকাত সুন্নত পড়েছেন এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এরকম প্রমাণও রয়েছে যে, সাহাবীগণ সফর অবস্থায় সুন্নত নামাজ পড়তেন বলে প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া এরকমও প্রমাণ রয়েছে যে, কেউ সুন্নত পড়লে তাকে নিষেধ করতেন না। কেউ কেউ বলেছেন, সুন্নতে মোয়াক্কাদার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে নফল ও সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদার ব্যাপারে মতানৈক্য নেই। তিনি স. সফরের সময়েও তাহাজ্জুদ নামাজ পরিত্যাগ করতেন না। আরোহী অবস্থায় কখনও কখনও তিনি ইশারায় তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করেছেন। বিতিরও পড়েছেন। আরোহী অবস্থায়, ইশারায় নফল নামাজ আদায় করা জায়েয। বাহন যেদিকেই ধাবিত হোক এবং আরোহী যেদিকেই মুখ করে থাকুক, সে দিকে মুখ রেখেই চলন্ত অবস্থায় ইশারায় নফল পড়া যাবে। তবে তকবিরে তাহরীমার সময় কেবলামুখী হতে হবে।

একবার রসুল পাক স. তাঁর সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে একটি সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো। তাই মৃত্তিকা ছিলো কর্দমাক্ত। সকলেই ছিলেন তাঁদের আপন বাহনের আরোহী। নামাজের সময় হলো। আযান ও ইকামত বলা হলো। রসুল পাক স. তাঁর বাহনকে সকলের সামনে নিয়ে এলেন এবং সাহাবীগণকে নিয়ে জামাতবদ্ধ হয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করলেন। ওই নামাজে তিনি স. তাঁর সেজদাকে করেছিলেন রুকুর চেয়ে অধিক নিচু।

দ্বিতীয় মাসআলাটি হচ্ছে দুই ওয়াক্তের নামাজ একীভূত করা প্রসঙ্গে। এই একীভূতিকে বলা হয়েছে 'জমা'। রসুল আকরম স. দ্বিপ্রহরের পূর্বে সফরে বহির্গত হলে জোহরের নামাজ ওয়াক্তের শেষ অংশে পড়তেন। চলন্ত কাফেলাকে ওই সময় থামাতেন, যেনো জোহরের নামাজ আদায় করার পরপরই আসরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। এভাবেই তিনি জোহরের নামাজ শেষ করার পর পর আসরের নামাজ শেষ করে নিতেন। এভাবে দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রিত করাকে বলা হয় 'জমায়ে তাখীর।' কখনও কখনও তিনি এরকম করতেন যে,

সফর শুরু করার পূর্বে জোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে জোহর পড়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করতেন। পথে আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে বাহন থেকে অবতরণ করে আসরের নামাজ পড়ে নিতেন। 'জমা' করতেন না। আবার কখনও কখনও তিনি জোহরের ওয়াক্তেই জোহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। এ রকম একত্রীকরণকে বলা হয় 'জমায়ে তাকদীস'। কখনও কখনও মাগরিব ও এশার নামাজকে জমা করতেন তিনি। সূর্যাস্তের পূর্বে যাত্রা শুরু করলে মাগরিবের নামাজ বিলম্বিত করে এশার সময় মিলিয়ে পড়তেন। অর্থাৎ 'জমায়ে তাখীর' করতেন। আর যাত্রার প্রারম্ভে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে গেলে মাগরিব ও এশা এক সঙ্গে পড়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করতেন। অর্থাৎ জমায়ে তাকদীস করতেন।

দুই ওয়াক্তের নামাজ একীভূত করা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে সাধারণভাবে একভিূত করার কথা। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় যাত্রারম্ভ এবং যাত্রার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একীভূত করার কথা এসেছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় দু'টো পথ পরিক্রমণের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে একীভূতির প্রসঙ্গটি। এই একীভূতি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন। সাধারণভাবে এ রকম করা যাবে, না কোনো বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এ রকম করা জায়েয হবে– তাই নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মতানৈক্য। কেউ কেউ বলেছেন, যাত্রার প্রাক্কালে অথবা পরিভ্রমণরত অবস্থায় একীভূত করার আমলটি নির্ধারিত। তারা একথাও বলেছেন যে, তিনি স. নিয়মিত এরকম করতেন না। কখনও কখনও কোনো কোনো সফরে এরকম করতেন। বিশেষ করে সুদীর্ঘ সফরে তিনি দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে পড়ে নিতেন। যাত্রা স্থগিত করার পর নির্বিঘ্ন পরিস্থিতিতে তিনি কখনও দুই ওয়াক্তের নামাজকে সম্মিলিত করতেন না। কেউ কেউ দ্রুত দূরত্ব অতিক্রম করার প্রয়োজন দেখা দিলে 'জমা' করা যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে বর্ণিত ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ অভিমতটি এরকমই। কেউ কেউ আবার 'ওজর' এবং অতিরিক্ত সফর করার ক্ষেত্রে জমা জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ 'জামায়ে তাখীর'কে জায়েয বলেছেন। কিন্তু জামায়ে তাকদীসকে বলেছেন নাজায়েয। ইমাম আহমদ এই অভিমতের প্রবক্তা। তবে তিনি এই মর্মে মত আরোপ করেছেন যে, 'জমায়ে তাখীর' হতে হবে পরিভ্রমণরত অবস্থায়। তিনি অবশ্য এই একীভূতির বিষয়টি কোনো বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। সাধারণভাবে জায়েয বলেছেন। তার এই অভিমতটিও প্রসিদ্ধ। 'ফতহুল বারী'তে উল্লেখিত রয়েছে ইমাম মালেক জায়েয বলেছেন 'জমায়ে তাখীর'কে। 'জমায়ে তাকদীস' কে নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে, জমা সাধারণভাবে জায়েয নয়। তিনি বলেছেন, নামাজের ওয়াক্ত সুনির্ধারিত ও সুবিদিত। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্রই নেই। নির্ধারিত সময় থেকে

নামাজকে এগিয়ে বা পিছিয়ে নেয়া যায় না। এরকম করা গোনাহের কাজ। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমাদের নিকট হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে এই মর্মে বর্ণনা পৌঁছেছে যে, তিনি নামাজের সকল বিধি-বিধান সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। ওই সকল পত্রে তিনি দুই ওয়াক্তের নামাজকে একীভূত করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, এক নামাজের ওয়াক্তে দুই ওয়াক্তের নামাজ সম্মিলিতভাবে পাঠ করা কবিরা গোনাহ্। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এই বিজ্ঞপ্তিটি নির্ভরযোগ্য আলেমগণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন ইবনুল হারেজ এবং মাকহুল থেকে। নামাজের ওয়াক্ত সুনির্ধারিত ও সুবিদিত (মোতাওয়াতির)। কাজেই কোনো একক বর্ণনা (খবরে ওয়াহেদ) এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি রসুল পাক স. কে নির্ধারিত ওয়াক্ত ছাড়া অন্য সময়ে নামাজ পড়তে দেখিনি। শুধু মুজদালিফায় মাগরিব ও এশার নামাজকে একত্রে আদায় করতে দেখেছি। অবশ্য তিনি স. আরাফাতের ময়দানে জোহর ও আসর একত্রে পড়েছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। আরাফায় ও মুজদালফায় এভাবে দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে পাঠ করা সফরের কারণে হতো না। এরকম করা হতো হজের বিধান হিসাবে। নিয়মিত তিনি স. এরকম করতেন না। তবুক যুদ্ধের বর্ণনায় নামাজ একত্রিকরণের প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানেও এরকম কোনো কথা নেই যে, তখন প্রতিদিন তিনি এরকম করেছেন। জামেউল উসুল পুস্তকে ইমাম আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, নবী পাক স. মাত্র একবার ছাড়া অন্য কখনও সফরের সময় মাগরিব ও এশার নামাজকে একীভূত করেননি। হজরত ইবনে ওমর আরও বলেছেন, তিনি স. এক রাত ছাড়া অন্য কখনও দুই নামাজকে একত্র করে পড়েননি। সেই রাতে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তাঁর সহধর্মিণী ইন্তেকাল করেছেন। এই সংবাদ পেয়ে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করে তিনি স. গৃহাভিমুখে রওনা দিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি স. এরকম আমল করেছেন দুইবার। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর কি কখনো কোনো সফরের রাতিকালে দুই নামাজ এক সঙ্গে পড়েছেন? তিনি বললেন, না। তবে মুজদালিফায় পড়েছেন।

জমায়ে তাকদিস সম্পর্কিত হাদিস সিহাহসিত্তা কিতাবসমূহে খুবই কম বর্ণিত হয়েছে। বোখারীতে বর্ণিত এই বিষয়ের হাদিসগুলো সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। তাই অনেক আলেম এরকম একত্রিকরণের পক্ষপাতি নন। তবে জমায়ে তাখীরের আমল সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এই একীভূতির ধারণাটি এরকম–

প্রথম নামাজকে ওয়াক্তের সর্বশেষে এবং দ্বিতীয় নামাজকে ওয়াক্তের সর্বপ্রথমে এনে দুই নামাজ একত্রে পাঠ করতে হবে। জমায়ে তাখীরের এই পদ্ধতিটিকে কেউ কেউ বলেছেন জমায়ে সুয়ী। প্রকাশ্যতঃ একীভূত মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে কিন্তু দুই নামাজকে একীভূত করা হয় না (দুই নামাজই তাদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আদায় করা হয়– একটি ওয়াক্তের শেষ দিকে, অন্যটি ওয়াক্তে প্রথম দিকে)। যে ধরনের জমা বা একীভূতিকে হানাফী মাজহাবে জায়েয বলা হয় তা হচ্ছে এই জমায়ে সুয়ী। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী সূর্যাস্তের পর দূরবর্তী সফর শুরু করলে চতুর্দিক অন্ধকার হওয়ার সময় বাহন থেকে অবতরণ করে মাগরিবের নামাজ পড়তেন। তারপর রাতের খাবার খেয়ে নিতেন। আহারের পর পড়তেন এশার নামাজ তারপর আবার যাত্রা শুরু করতেন। তিনি বলতেন রসুল পাক স. এরকম আমল করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমার নিকট হজরত ইবনে ওমর থেকে একথাটি পৌঁছেছে যে, তিনি মাগরিবের নামাজ মাগরিবের ওয়াক্তে আদায় করতেন। আকাশের লাল আভা দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত তিনি মাগরিবের নামাজকে বিলম্ব করতেন। কিন্তু ইমাম মালেকের বর্ণনায় রয়েছে– আকাশের রক্তিম বর্ণ দূর হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। জামেউল উসুল গ্রন্থে হজরত নাফে এবং আবদ ইবনে ওয়াফেদী থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, এক সফরে হজরত ইবনে ওমরের মোয়াজ্জিন বলে উঠলেন, আসসালাত (নামাজের সময় হয়েছে)। হজরত ইবনে ওমর বললেন, বলো বলতে থাকো। এরপর আকাশের রক্তিম আভা দূর হওয়ার পূর্বক্ষণে তিনি তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করে মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন। একটু পরেই রক্তিম আভা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হলো। তখন তিনি পড়লেন এশার নামাজ। তারপর বললেন, সফরে কোনো তাড়া থাকলে রসুল পাক স. এরকম করতে বলতেন– যেমন আমি করলাম। নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, রক্তিম আভা শেষ হওয়ার সময় যখন হতো। উপরোক্ত হাদিসগুলো ইমাম আবু হানিফার অভিমতের অনুকূলে। শায়েখ ইবনে হাজার তাঁর ফতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, কোনো কোনো শাফেয়ী মতাবলম্বী বলেন, জমা না করাই উত্তম। ইমাম মালেকের বর্ণনায় রয়েছে, জমার আমল করা মাকরূহ। রসুল পাক স. এর এ সম্পকির্ত আমল ছিলো কেবল বৈধতা বোঝানোর জন্য। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এ পর্যন্ত মুসাফিরদের জমার আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এখন আলোচনা করা হবে মুকিম ব্যক্তির জমা সম্পর্কে। তিরমিজি বলেছেন, কোনো কোনো ক্বারী বলেন, পীড়িত ব্যক্তির বেলায় জমার আমল বৈধ। ওই তাবেয়ীগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক। কেউ কেউ বলেছেন, ঝড়-বৃষ্টির সময় জমার আমল করা যেতে পারে। এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাফেয়ী কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির জমার আমলের পক্ষপাতি নন। হজরত ইমাম আব্বাস বলেছেন, কোনো বিশেষ ওজর ছাড়া দুই নামাজকে সম্মিলিতভাবে আদায়

করা নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহ্। জমহুর উম্মতের ঐকমত্য এই যে, দুই নামাজকে একীভূত করা যাবে কেবল আরাফাতে ও মুজদালিফায়। আর সফর অবস্থায় জায়েয হবে কেবল জমায়ে সুয়ী।

জানাযার নামাজ

জানাযার নামাজের ভূমিকা, মাসায়েল, আদব, পীড়িত হওয়ার ফযীলত ও সওয়াব, পীড়িত ব্যক্তির সেবা শুশ্রুষার সওয়াব ইত্যাদি সম্পর্কে ফেকাহ ও হাদিসের গ্রন্থাবলীতে বিশদ আলোচনা রয়েছে। রসুল আকরম স. রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শুশ্রুষা করার জন্য বিশেষ কোনো সময় নির্ধারণ করেননি। কেউ কেউ ধারণা করেন শনিবার ও মঙ্গলবারে অসুস্থ ব্যক্তির সেবা ও শুশ্রুষা করা ভালো নয়। মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে রয়েছে, শনিবারে রোগীর সেবা করা যায় না এরকম ধারণা সুন্নতের খেলাপ অর্থাৎ বেদাত। এই বেদাতটির আবিষ্কারক জনৈক ইহুদী চিকিৎসক। পরবর্তীতে এই ধারণাটি সাধারণ্যে ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। সেই বেদাত সৃষ্টির ঘটনাটি এরকম– এক বাদশাহ্ পীড়িত হয়েছিলো। বাদশাহ্ ওই ইহুদী চিকিৎসককে সব সময় নিজের কাছে থেকে চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছিলো। বলেছিলো, সে বাইরে গেলে তার মস্তক ছেদন করা হবে। ইহুদী চিকিৎসক ভাবলো, শনিবার তাদের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন। এ কথা ভেবে সে বাদশাহ্র নিকট নিবেদন করলো, শনিবার সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত। তাই শনিবার চিকিৎসা বা সেবা যত্ন করলে রোগীর অকাল মৃত্যু হওয়ার আশংকা রয়েছে। একথা শুনে বাদশাহ্ ভয় পেয়ে তার জন্য শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ করলো। এ ঘটনাটি পরে এভাবে প্রচলিত হলো যে, শনিবার রোগীর চিকিৎসা বা সেবা-যত্ন করা যায় না। রসুল আকরম স. চোখের পীড়ায় আক্রান্তদেরকেও সেবাযত্ন করতেন। আহমদ ও আবু দাউদ হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বলেছেন, রসুল পাক স. আমার চোখের অসুখের সময় আমার শুশ্রুষা করেছেন। এই হাদিসটি ওই সকল ব্যক্তির অভিমতের বিরুদ্ধে দলিল যারা মনে করে, চক্ষু রোগীদের শুশ্রুষা করা মাসনুন ও মোস্তাহাব নয়। তারা বায়হাকী ও তিরবাণী কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদিস দ্বারা তাদের অভিমতের সপক্ষে দলিল পেশ করে থাকেন। ওই হাদিসে বলা হয়েছে, তিনটি রোগের চিকিৎসা হয় না– চোখের অসুখ, ফোঁড়া এবং দাঁতের ব্যথা। হাদিসটি শিথিল সূত্রসম্ভূত। রসুল আকরম স. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করতেন। এই দোয়ার কারণেই কবরে ও কিয়ামতের দিন পরিত্রাণের ব্যবস্থা হয়ে যেতো। মৃত ব্যক্তির শোকগ্রস্ত পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখতেন। শোকার্তদের আহারের ব্যবস্থা

করা, কাফন দাফনের যোগাড় যন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি খোঁজ খবর নিতেন। সাহাবীগণকে নিয়ে তিনি মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়তেন এবং মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাত কামনা করতেন। তারপর সকলকে নিয়ে লাশের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যেতেন এবং কবরের শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে দোয়া করতেন। কলেমার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এবং মুনকির নকিরের প্রশ্নের জবাব দানের জন্য তালকিন দিতেন। মাটি ইত্যাদি দিয়ে কবর তৈরী করতেন। শান্তি, রহমত ও মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের এই অভ্যাস ছিলো যে, কারো মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলে তাঁরা রসুলপাক স. কে সে ব্যক্তির নিকট নিয়ে আসতেন। উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, রসুলপাক স. এর উপস্থিতিতে যেনো ওই ব্যক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। রসুল পাক স.ও এরকম সংবাদ পেলে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হতেন। কাফন দাফনের ব্যবস্থা, নামাজ পাঠ, কবরস্তান পর্যন্ত গমন– এসকল কাজে রসুল পাক স. অংশগ্রহণ করলে তাঁর কষ্ট হয়– এ কথা ভেবে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে আর এতো কষ্ট দিতেন না। কারো ইন্তেকাল হয়ে গেলে রসুল পাক স. কে সংবাদ দিতেন তাঁরা। তখন তিনি স. এসে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং জানাযার নামাজ পাঠ করতেন। সাহাবীগণ দেখলেন, এরকম করলেও রসুল পাক স. এর কষ্ট হয়- তখন তাঁরা মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন ইত্যাদি সমাধা করার পর জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য সংবাদ দিয়ে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতেন। পরিস্থিতি জটিল হলে অনেক রাতে কারো মৃত্যু হলে কিংবা অন্য কোনো রকম অসুবিধা দেখা দিলে তাঁরা রসুল পাক স. কে আর সংবাদ দিতেন না। নিজেরাই কাফন দাফন জানাযা ইত্যাদির সমাধান করে নিতেন। পরে সুবিধামত সময়ে তিনি স. কবরের কাছে গিয়ে জানাযা পড়তেন।

প্রথম দিকে জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর তিনি স. জানতে চাইতেন মৃত ব্যক্তির কোনো ঋণ আছে কিনা? থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করা যায় কিনা। যখন বলা হতো, ঋণ পরিশোধের মতো পরিত্যক্ত সম্পদ রয়েছে অথবা যখন কেউ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, তখন জানাযা পড়াতেন তিনি। অন্যথায় সাহাবীগণের কাউকে জানাযা পড়তে নির্দেশ দিতেন। নিজে জানাযা পড়তেন না। পরবর্তী সময়ে যখন বিভিন্ন শহর বিজিত হলো এবং সচ্ছলতা অর্জিত হলো, তখন তিনি স. ঋণ সম্বন্ধে আর জিজ্ঞেস করতেন না। তখন তিনি বলতেন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তার পরিবার পরিজনের। আর ঋণ থাকলে অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি থাকলে তার দায়িত্ব আমার।

রসুল আকদাস স. জানাযার নামাজে কখনও চার তকবির কখনও পাঁচ তকবির কখনও ছয় তকবির বলেছেন। সাহাবায়ে কেরামও তাই বিভিন্ন রকম আমল করতেন। যাঁরা চার তকবির বলার পক্ষপাতি ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিলো– তিনি

স. শেষের দিকে চার তকবিরই বলতেন। সুতরাং বিষয়টি সুসাব্যস্ত। চার তকবির সম্পর্কিত হাদিসগুলো মুস্তাফিজ ও মাশহুর। এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ফেরেশতারা হজরত আদমের জানাযা চার তকবিরের সঙ্গেই পড়েছিলেন। তারপর বলেছেন, হে আদম সন্তানগণ! এটাই তোমাদের জন্য সুন্নত। হাদিসটি হাকেম তার মোস্তাদরাক গ্রন্থে এবং আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি স. দুই সালামের মাধ্যমে জানাযার নামাজ সমাপ্ত করতেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী এই নিয়মটিকেই গ্রহণ করেছেন। কখনও কখনও তিনি স. এক সালাম দ্বারা জানাযার নামাজ সমাপ্ত করতেন– এই নিয়মটিকে গ্রহণ করেছেন ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ। তাঁরা দুই সালামের নিয়মকে গ্রহণ করেছেন, এরকম বর্ণনাও পাওয়া যায়। জমউল জাওয়াস গ্রন্থে রয়েছে, হজরত আলী এক সালামে জানাযার নামাজ শেষ করতেন। অন্য সাহাবীগণও এরকম করেছেন। তাঁরা প্রতিটি তকবিরের সময় হস্ত উত্তোলনও করতেন। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মাজহাব এরকম। হজরত ওমর ফারুক, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত এবং ইমাম মালেক থেকে তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে– ১. সকল তকবিরে হাত উঠানো। ২. সকল তকবিরে হাত না উঠানো। এবং ৩. প্রথম তকবিরে হাত উঠানো এবং পরের তকবিরগুলোতে না উঠানো। শেষোক্ত অভিমতটিই ইমাম আবু হানিফার মাজহাব। তিরমিজি শরীফে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এবং অন্যান্য হাদিসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, রসুল করীম স. একেক সময় একেক আমল করেছেন। সফরুস সায়াদাত রচয়িতা বলেছেন, জানাযার নামাজে তকবিরের সময় হাত উঠানো সম্পর্কে কোনো বিশদ বর্ণনা নেই। আল্লাহ্পাকই উত্তমরূপে অবহিত।

প্রথম তকবিরের পর তিনি স. সুরা ফাতেহা পাঠ করেছেন এরকম বর্ণনা রয়েছে। শায়েখ ইবনুল হেমাম শরহে হেদায়া গ্রন্থে বলেছেন, জানাযার নামাজে নবী পাক স. কোরআন পাঠ করেছেন– এরকম বর্ণনা বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত উপনীত হয়নি। তবে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং নাসাঈ শরীফে এরকম বর্ণনা রয়েছে। ওই বর্ণনাগুলোর সঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাসের আমল সম্পর্কেও উল্লেখ দেখা যায়। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. জানাযার নামাজে সুরা ফাতেহা এবং অন্য কোনো সুরা সশব্দে পাঠ করেছেন। সশব্দে পাঠ করার উদ্দেশ্য ছিলো আমলটিকে জনসমক্ষে সুন্নত সাব্যস্ত করা। এই নিয়মটিকে গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও

ইসহাক। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম সুফিয়ান সওরীর মাজহাব ভিন্ন প্রকৃতির । সাহাবীগণের মধ্যেও এ বিষয়ে মতানৈক্য ছিলো।

ইমাম তাহাবী বলেছেন, জানাযার নামাজে তিনি স. মূলতঃ ছানা এবং দোয়ার উদ্দেশ্যে সুরা ফাতেহা পাঠ করেছেন। ক্বেরাত হিসাবে তিনি সুরা ফাতেহা পাঠ করেননি। আল্লামা শম্মীর কথা থেকে বুঝা যায় নবী পাক স. সুরা ফাতেহা যদি ছানার নিয়তে পড়ে থাকেন, তবে আমাদের মতেও জানাযার নামাজে সুরা ফাতেহা পাঠ করা জায়েয। ফতহুল বারীর আলোচনা থেকে বুঝা যায়, যাঁরা সুরা ফাতেহা পাঠ করার পক্ষপাতি তাঁরাও এরকম করাকে জায়েয বলে থাকেন, ওয়াজিব বলেন না। কিন্তু কারমানী বলেছেন, সুরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে সুরা ফাতেহা পাঠকে সুন্নত বলা হয়েছে। এ সুন্নতের অর্থ ধর্মের মধ্যে প্রচলিত একটি পদ্ধতি। বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে জানাযার নামাজে সুরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়।

রসুল আকদাস স. জানাযার নামাজে পাঠ করতেন এই দোয়া–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافَهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهٗ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ اَلْاَ بْيَضَ اللهِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِه وَاَهْلًا مِنْ اَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِه وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِزْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ –

হজরত আউফ ইবনে মালেক থেকে মুসলিম, তিরমিজি এবং নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. জানাযার নামাজে উপরোক্ত দোয়া পাঠ করতেন। আমি (হজরত আউফ) তা মুখস্থ করে নিয়েছি। তিনি আরো বলেছেন, আমি যখন রসুল পাক স. কে জানাযার নামাজে এই দোয়া পাঠ করতে শুনেছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিলো যদি এই জানাযা আমার হতো। (কতইনা সৌভাগ্যের ব্যপার হতো)।

জানাযার নামাজের দোয়া হিসাবে নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا۔

এক বর্ণনায় রয়েছে

وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ –

আবার কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে অতিরিক্ত এই কথাটি–

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِه وَاِنْ كَانَ مَسْيِئًا فَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ -

মুয়াত্তা গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি স. অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জানাযায় বলতেন

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَّ ذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا -

জানাযার নামাজে উপস্থিত না থাকতে পারলে তিনি স. কবরের কাছে গিয়ে জানাযা আদায় করতেন। এক দিন এক রাত্রি, তিন দিন তিন রাত্রি, আবার কখনও একমাস পরও তিনি স. মৃত ব্যক্তির কবরে জানাযা পড়েছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মৃতদেহ ফুলে ফেঁপে গলে না যাওয়া পর্যন্ত জানাযার নামাজ পড়া জায়েয। এর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তিন দিন। কারো কারো মতে যতক্ষণ পঁচে গলে যায়নি মনে করা হবে ততক্ষণ জানাযা পড়া যাবে। এভাবে মাসাধিককাল পরেও জানাযার নামাজ পাঠ করা যায়। মাসআলাটির ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কবরের উপর জানাযা পড়ার বিধানটি কেবল রসুল পাক স.এর জন্য নির্ধারিত। যেহেতু হাদিস শরীফে এসেছে, কবর অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর নামাজ তাকে আলোকিত করে দেয়। অবশ্য এ বিষয়ে সঠিক অভিমতটি এই যে, এরকম করা কেবল রসুল পাক স. এর জন্য সুনির্দিষ্ট নয় বরং সকলের জন্যই এরকম করা জায়েয। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যাকে জানাযা না পড়ে কবরস্থ করা হয়েছে, এরকম ব্যক্তির জন্য কবরে জানাযা পাঠ করা জায়েয হবে। অন্যথায় হবে না।

তিনি স. জানাযার সঙ্গে গমন করতেন পদব্রজে। তিরমিজি ও আবু দাউদের গ্রন্থে হজরত ছাওবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা এক জানাযার সঙ্গে গমন করছিলাম। রসুল পাক স. তখন দেখলেন, কতিপয় লোক তাদের বাহনে আরোহণ করে জানাযা যাত্রীদের সঙ্গে যাচ্ছে। তিনি স. বললেন, তাদের কি লজ্জা নেই। আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা হেঁটে চলেছেন আর তারা চলেছে সওয়ারীর পিঠে। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, জানাযা গমনের নিমিত্তে রসুল পাক স. এর জন্য একটি ঘোড়া আনা হলো, কিন্তু গমনকালে তিনি স. অশ্বারোহী হলেন না। হলেন প্রত্যাবর্তনকালে। জানাযা কাঁধ থেকে না নামানো পর্যন্ত তিনি কখনও উপবেশন করতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি স. বলেছেন, তোমরা যারা জানাযায় অংশগ্রহণ

করবে তারা লাশ না নামানো পর্যন্ত উপবেশন করবে না। এক বর্ণনায় রয়েছে, লাশ কবরে না নামানো পর্যন্ত বসতে যেয়ো না।

জানাযার আগে যাওয়া মোস্তাহাব না পরে– সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মতে জানাযার পশ্চাতে গমন করা মোস্তাহাব। ইমাম আওজায়ীও এরকম বলেছেন। কেননা জানাযার খাট অগ্রে রেখে তার পশ্চাতে হাঁটাতেই অধিক উপকার নিহিত। এতে করে মৃত্যুর কথা অধিক স্মরণ হয় এবং তা হয় উপদেশ গ্রহণে সহায়ক। ইমাম নববী ও অন্যান্যরা বলেছেন, সম্মুখগমন এবং পশ্চাৎগমন– দু'টোই সমান। ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং আহমদ বলেছেন, যারা দাফন কর্ম করবেন তাঁদের জন্য জানাযার আগে আগে চলাই উত্তম। তারা আল্লাহ্পাকের কাছে মৃত ব্যক্তির সুপারিশকারী। আর সুপারিশকারীরা সাধারণতঃ অগ্রভাগেই থাকেন। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে হজরত আনাস বলেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হজরত ওমর ফারুক জানাযার আগে আগে হাঁটতেন। হজরত আলী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হাঁটতেন জানাযার পিছনে। অন্য এক হাদিসে রয়েছে, বাহনে আরোহনকারীরা থাকবে সকলের পশ্চাতে। পদব্রজে গমনকারীরা দক্ষিণ, বাম, অগ্র, পশ্চাৎ যেকোনো দিকে থাকতে পারেন।

রসুলে করীম স. গায়েবানা জানাযা পড়তেন না। তবে একথা নিশ্চিত যে, তিনি স. আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাসীর গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন। স্বরাজ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন নাজ্জাসী। তিনি স. তখন সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমাদের এক ভাইয়ের ইন্তেকাল হয়েছে। তোমরা তার জানাযা আদায় করো। এরপর তিনি স. উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে সাহাবীগণকে নিয়ে চার তকবিরের সঙ্গে জানাযার নামাজ আদায় করেছিলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি স. হজরত মুয়াবিয়া লাইছির জন্যও গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন। তবুক যুদ্ধের সময় তিনি স. সংবাদ পেলেন মদীনায় হজরত মুয়াবিয়া লাইছি মৃত্যুবরণ করেছেন। হজরত জিব্রাইল তাঁকে এই সংবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, আপনি যদি চান তবে তবুক থেকে মদীনা পর্যন্ত সকল পাহাড় পর্বত সমান করে দেই। আপনি এখানে থেকেই তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করে নিন। একথা বলে হজরত জিব্রাইল তাঁর পাখার ঝাপটায় মদিনা ও তবুকের মধ্যবর্তী সকল টিলা পাহাড় ও গাছপালা সমান করে দিলেন। দূর হয়ে গেলো সকল আড়াল। তবুক থেকেই হজরত মুয়াবিয়া লাইছির জানাযা দেখতে পেলেন তিনি স.।

এক বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর জানাযা উঠিয়ে এনে রসুল পাক স. এর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। তিনি স. তখন জানাযা সামনে উপস্থিত পেয়ে নামাজ

আদায় করেছেন। ওই জানাযার নামাজে তাঁর পশ্চাতে দুই লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ফেরেশতারা। সত্তর হাজার ফেরেশতা ছিলো প্রতিটি সারিতে। তিনি স. বললেন, হে জিব্‌রাইল! এই মর্যাদা সে (মুয়াবিয়া লাইছ) কীভাবে পেলো? হজরত জিব্‌রাইল বললেন, সুরা এখলাস ছিলো তাঁর খুব প্রিয়। চলা-ফেরা, ওঠা-বসা সকল সময় তিনি সুরা এখলাস পাঠ করতেন।

গায়েবানা জানাযা পড়ার ব্যাপারে ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে গায়েবানা জানাযা সাধারণতঃ সুন্নত। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে সাধারণতঃ নাজায়েয। কেউ কেউ বলেছেন, জানাযা পড়ার কোনো মানুষ নেই, এমন স্থানে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়তে হবে। আর যদি সেখানে জানাযা পড়ার মতো লোক থাকে, তবে তো তার জানাযার ফরজ নামাজ আদায় হয়েই গিয়েছে। সুতরাং তার আর জানাযা পড়ার প্রয়োজন নেই।

হানাফী ও মালেকী মতাবলম্বীগণ বাদশাহ্ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে বলেছেন, রসুল পাক স. এবং বাদশাহ্ নাজ্জাশীর জানাযার মধ্যে কোনো অন্তরাল ছিলো না। মধ্যবর্তী পর্দা অপসারণ করে দেয়া হয়েছিলো। অথবা দূরত্বকে অপসারণ করে তাঁর জানাযা স্থাপন করা হয়েছিলো রসুল পাক স. এর সম্মুখে। তিনি জানাযা চাক্ষুস দেখে নামাজ পড়েছিলেন। সাহাবীগণ অবশ্য এরকম দেখতে পাননি। ইমাম জানাযা দেখতে পান কিন্তু মোক্তাদীগণ পায় না– এ অবস্থায় জানাযার নামাজ পাঠ করা সর্ববাদীসম্মতরূপে জায়েয। হজরত মুয়াবিয়া লাইছির জানাযার ক্ষেত্রেও এরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, কেবল নাজ্জাশীর জন্যই গায়েবানা জানাযা পড়া হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, মুতার যুদ্ধে শহীদ হজরত জাফর ইবনে আবী তালেব, হজরত জায়েদ ইবনে হারেসা এবং হজরত আবুদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার জানাযার নামাজও উপরোক্ত নিয়মে পাঠ করা হয়েছিলো।

ইমাম আজম আবু হানিফার মতে গায়েবানা জানাযা সাধারণতঃ নাজায়েয। হানাফী মাজহাবের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত। নামাজ না জায়েয হওয়ার একটি কারণ এই যে, মৃত ব্যক্তি যদি মুসলমান দেশে মারা যায় তবে সেখানকার মুসলমানেরা তো তার জানাযার নামাজ পড়েই নিবে। এর পরেও যদি দূরের মুসলমানেরা পুনরায় জানাযার নামাজ পাঠ করে, তবে জানাযা পড়া হবে দুইবার। আর দুইবার জানাযা পড়া বৈধ নয়। তবে হাঁ ওলি বা অভিভাবক যদি জানাযার নামাজ না পায় তবে তার জন্য পুনরায় জানাযা পড়ার অধিকার রয়েছে। তার এই অধিকার কেউ খর্ব করতে পারবে না। প্রথমে জানাযা আদায়ের পর যদি ওলি পুনরায় জানাযা পড়ে, তবে তা হবে নফল। আর এ ধরনের গায়েবানা নফল

হিসাবে পড়া বৈধ নয়। হেদায়া, ইমাম নসফির কাফী, শরহে ওয়াফি, শরহে মুলতাকাল আবুহুর, মুশতাক লাসুল আকায়েদ, শরহে কানয এবং কাবীর আলাল মানীয়া ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে প্রথম নামাজে জানাযার ফরজ আদায় হয়ে যায়। নফল জানাযা পড়া শরিয়তসম্মত নয়। তাবয়ীন গ্রন্থে অতিরিক্ত এ কথাটি রয়েছে– কাজেই যে একবার জানাযা পড়েছে সে আর পড়বে না। প্রথম নামাজেই তার ফরজ আদায় হয়েছে। আর এই নামাজে তার নফল নাজায়েয। আল্লামা শারাম্বুলী তাঁর মারাকিউল ফালাহ পুস্তকে বলেছেন, নফল জানাযার নামাজ শরিয়তসিদ্ধ নয়।

জানাযার নামাজ পড়তে হলে মরদেহ সম্মুখে উপস্থিত থাকতে হবে। ফতহুল কাদের, হুলিয়া, শুনিয়া, শালবিয়া, বাহরুর রায়েক ইত্যাদি হানাফী ফেকাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, জানাযার নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হবে, পবিত্র হতে হবে তাকে এবং তাকে রাখতে হবে মুসল্লিদের সামনে। সুতরাং অনুপস্থিত কারো জন্য জানাযা পড়া জায়েয হবে না। তাই আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সাধারণতঃ গায়েবানা জানাযা জায়েয নয়।

রসুল আকদাস স. কারো কবরকে উচ্চ করতেন না এবং কবরকে ইট পাথর ইত্যাদি দিয়ে শক্তভাবে নির্মাণ করতেন না। কবরের উপর কোনো শক্ত মাটি লেপন করতে দিতেন না। কবরের উপর অট্টালিকা কিংবা গম্ভুজ নির্মাণও অনুমোদন করতেন না। এ সকল কাজ বেদাত এবং মাকরূহ। সফরুস সায়াদাত কিতাবে এরকম বলা হয়েছে। মুতালিবুল মু'মিনিন পুস্তকে রয়েছে সলফে সালেহীন ওলামা এবং মাশায়েখগণ কবরের উপর গম্বুজ প্রস্তুত করাকে মোবাহ মনে করেছেন। এতে করে মানুষ ওই কবর জিয়ারত করতে পারে, কবরের কাছে এসে শান্তি পেতে পারে এবং তার ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। মাসাবীহ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাফাতীহ্ কিতাবে এরকম রয়েছে। গ্রন্থটির রচয়িতা বলেছেন, আমি বোখারায় সুসজ্জিত ইট দ্বারা নির্মিত একটি কবর দেখেছি। প্রখ্যাত ফকিহ্ ইসমাইল জাহেদ এরকম করাকে জায়েয মনে করেছেন। হাসান বসরী সহ কোনো কোনো আলেম গোলা মাটি দ্বারা কবর প্রস্তুত করার অনুমতি দিতেন। ইমাম শাফেয়ীও এমতো অনুমতির পক্ষে। কবরের উপর দিয়ে হাঁটা চলা করা এবং কবরের উপর উপবেশন করা নিষেধ। রসুল পাক স. এক লোককে কবরের উপর দিয়ে জুতা পরিধান করে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন, জুতা খুলে ফেলো। মুসলিম, তিরমিজি ও আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবুল মিনহাজ বলেছেন, হজরত আলী আমাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ওই অনুমোদনের মাধ্যমে প্রেরণ করছি, যে অনুমোদনের মাধ্যমে রসুল আকদাস স. আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। যাও, কোনো চিত্র ধ্বংস না করে ছেড়ো না এবং উঁচুকে নিচু না করেও ছেড়ো না। কবর মাটি থেকে এতটুকু উঁচু হওয়া উচিত যাতে করে তা কবর

হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। রসুল আকদাস স. এর পবিত্র কবর এবং তাঁর প্রধান প্রতিনিধিদ্বয়ের কবর মৃত্তিকার সমান্তরাল। হাদিস শরীফে রয়েছে, রসুল আকরম স. তার প্রিয় পুত্র হজরত ইব্রাহিমের কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেখানে রেখেছিলেন কয়েকটি পাথর। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, হজরত ওসমান ইবনে মাজউনকে দাফন করার পর রসুল করীম স. তাঁর কবরের উপর একটি ভারী পাথর স্থাপন করেছিলেন। হাদিস শরীফে এসেছে, নবী পাক স. বলেছেন, ইহুদীদের উপর আল্লাহ্পাকের অভিসম্পাত পতিত হোক। তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহেকে সেজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। অভিসম্পাত পতিত হোক ওই সকল রমণীদের প্রতিও, যারা কবর জিয়ারত করতে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, এই অভিসম্পাত ও নিষিদ্ধতা ছিলো ইসলামের প্রথম দিকে। পরে বিষয়টিকে করে দেয়া হয়েছিলো সহজ (রুখসত)। রমণীদের কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, তারা সামান্যতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এবং কবরের কাছে যেয়ে বিলাপ করে কাঁদতে থাকে।

কবরের উপর বাতি জ্বালানো নিষেধ। তবে কবরস্থানে যাওয়া আসার সুবিধার জন্য বাতি জ্বালানো যেতে পারে। কবরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া মাকরূহ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কবরস্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ।

যারা গত হয়েছেন, রসুল আকদাস স. তাদের কবর জিয়ারত করতেন। তাঁদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করতেন। বিশুদ্ধ হাদিসে রয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা রসুল পাক স. কে জান্নাতুল বাকীর কবরবাসীদের কবর জিয়ারত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নির্দেশটি দেয়া হয়েছিলো শবে বরাতে। দোয়া ও এস্তেগফার ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারত করা যাবে না। বেদাত ও মাকরূহ বিবর্জিত জিয়ারত মাসনুন ও মোস্তাহাব। নবী পাক স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা অথবা তাঁদের যে কোনো একজনের কবর প্রতি শুক্রবার জিয়ারত করবে আল্লাহ্পাক তাকে মাফ করে দিবেন এবং তাকে করে দিবেন পুণ্যবান। পিতা-মাতার জন্য এস্তেগফার, দান-খয়রাত একই ধরনের আমল। নবী পাক স. আরো এরশাদ করেছেন, কবরস্থান দেখতে পেলে বলবে– আসসালামু আলাইকুম। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল পাক স. মদীনা শরীফের কবরস্থানে গমন করলে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে বলতেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলিল কুবুর।

অন্যান্য হাদিসে এসেছে তিনি স. কবর জিয়ারতের সময় আয়াতুল কুরসী, সুরা এখলাস, সুরা নাস, সুরা ফালাক্ব, সুরা ইয়াসিন এবং সুরা মুলক পাঠ করতেন। তিনি স. কবরবাসীর জন্য একত্রিত হয়ে খতম ইত্যাদি পড়তেন না। কবরস্থানে অথবা অন্য কোথাও দোয়া ও খতমের সমাবেশ করতেন না। এরকম করা বেদাত (হাসানা)। তবে শোকার্ত পরিবার-পরিজনকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে যদি

দোয়ার সমাবেশ করা হয়, তবে তা হবে সুন্নত এবং মোস্তাহাব। তাই মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে এ ধরনের সমাবেশ ঘটানো যেতে পারে। কিন্তু এসকল অনুষ্ঠানে অসিয়ত ছাড়া এতিম সন্তানদের সম্পদ ব্যয় করা বেদাত। এর মধ্যে আবার কোনো কোনোটি হারাম। শোক পালন করতে হবে তিনদিন। তিন দিনের অধিক শোকগ্রস্ত থাকা মাকরূহ। কেউ কেউ সাত দিন পর্যন্ত শোকাচ্ছন্নতাকে জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, নিকটের মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিন এবং দূরের মৃত ব্যক্তির জন্য এক দিন শোক পালন করা যায়। এভাবে একবার শোক পালন করা যাবে, বার বার নয়। ইমাম আজম এরকমই বলেছেন।

কবরের শিয়রে কোরআন পাঠ করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে মতপৃথকতা রয়েছে। তবে জিয়ারতের সময় কোরআন পাঠ করা যাবে। কবরের আশেপাশে বসে কিংবা শিয়রে বসে কোরআন পাঠ করা মাকরূহ। শায়েখ ইবনুল হেমাম হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন, কবরের পাশে কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য ক্বারীগণকে বসানো হয়– এই নিয়ম সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে পছন্দনীয় মত হচ্ছে– মাকরূহ নয়। আল্লাহ্পাকই অধিক তত্ত্ব অবহিত।

গত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে সমবেদনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে যারা আগমন করেন, তাদেরকে আহার করানোর নিয়মটি পূর্বে প্রচলিত ছিলো না। তবে কোনো কোনো ফেকাহর গ্রন্থে বলা হয়েছে পরলোকগত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে দূর-দূরান্ত থেকে আগমনকারীদের জন্য আহারের আয়োজন করা জায়েয হবে।

শোকার্ত স্বজনদের জন্য আহার্য প্রেরণের বিধান রয়েছে। কারণ তাদের প্রাত্যহিক কর্ম বিপর্যস্ত। শোক প্রাবল্যের কারণে পানাহারের প্রতি তাদের দৃকপাত থাকে না। রসুল পাক স. স্বয়ং এরকম আমল করেছেন। হজরত জাফর ইবনে আবী তালেবের শাহাদতের সময় তিনি স. তার পরিবার-পরিজনকে বলেছিলেন, জাফরের শোকাচ্ছন্ন স্বজনদের জন্য আহার্য প্রস্তুত করো। তাঁরা বিপদগ্রস্ত। তাই আহার্য প্রস্তুত করতে অক্ষম। স্বজন পরিজন ছাড়া অন্য কাউকে আহার করানোর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যারা প্রয়াত ব্যক্তির কাফন-দাফনের কাজে নিয়োজিত ছিলো, তারাও প্রেরিত আহার্য ভক্ষণ করতে পারবে।

সুন্নতে রাতেবান এবং মোয়াককাদা

রাতেবা বলে ওই সকল সুন্নত নামাজকে বুঝানো হয়েছে, যা ফরজের অতিরিক্ত। এ আমলগুলো তিনি স. দিবস ও রাত্রির বিভিন্ন সময়ে ইবাদত হিসাবে আমল করতেন। এগুলোর কিছু কিছু মোয়াক্কাদা এবং অবশিষ্টগুলি গায়ের মোয়াক্কাদা। যেমন তিনি স. আসরের নামাজের পূর্বে চার রাকাত নামাজ

পড়তেন– যা সুন্নতে মোয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত রাতেবা এবং মোয়াক্কাদা। হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দুই রাকাত পড়তেন ফরজের পূর্বে এবং দুই রাকাত ফরজের পরে। ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব এরকম। হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, জোহরের পূর্বে সুন্নতে মোয়াক্কাদা চার রাকাত এবং ফরজের পরে দুই রাকাত। অধিকাংশ বিজ্ঞ সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ এরকম আমল করেছেন। সুফিয়ান সওরী, ইবনুল মোবারক এবং ইসহাকের মাজহাবও এরকম। ইমাম আবু হানিফাও এই অভিমতের প্রবক্তা। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, রসুল পাক স. জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত নামাজ কখনই পরিত্যাগ করতেন না। ওই নামাজ ঘরে পড়লে চার রাকাত এবং মসজিদে পড়লে দুই রাকাত পড়তেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এই নামাজ চার রাকাত, কোনো কোনো বর্ণনায় দুই রাকাত বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে জননী আয়েশা এবং হজরত ইবনে ওমর দু'জনের বর্ণনাই বিশুদ্ধ। কোনো বর্ণনাকেই কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যায় না। আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি স. যাওয়ালের পর (দ্বিপ্রহরের সূর্য ঢলে পড়ার পরক্ষণে) চার রাকাত নামাজ পড়তেন এবং বলতেন, এ সময় আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হয়। আর আমি চাই এই মুহূর্তেই যেনো আমার আমল ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। কেউ কেউ এই নামাজকেই জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ মনে করে নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণিত নামাজ দু'টি পৃথক নামাজ। সূর্য ঢলে পাড়ার পরক্ষণে যে নামাজ পড়া হয় তাকে বলা হয়েছে সালাত ফিযযাওয়াল। অধিকাংশ সময় এই নামাজ তিনি স্বগৃহে পাঠ করতেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যাওয়ালের পরে নামাজ পড়তেন আট রাকাত এবং বলতেন, এই আট রাকাত নামাজ কিয়ামুল লাইলের সমপর্যায়ের। যাওয়াল এবং তাহাজ্জুদ এই দুই সময় হচ্ছে বিশেষ রহমত বর্ষণের সময়। একটির সময় অর্ধ দিবসের পর এবং অন্যটির সময় অর্ধ রাত্রির পর। এদিক থেকে সময় দু'টির সাযুজ্য রয়েছে। হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, আমি রসুল পাক স. কে বলতে শুনেছি, যাওয়ালের পরের চার রাকাত সুন্নত তাহাজ্জুদের নামাজের সমান্তরাল। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুই ওই সময় আল্লাহ্তায়ালাকে সেজদা করে। একথা বলে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন।

'ডানে বামে তার ছায়াসমূহ ঢলে পড়ে, আল্লাহ্তায়ালাকে সেজদা করার জন্য।' শায়েখ ইবনুল হেমাম সুনানে, সাঈদ ইবনে মানসুরের কিতাব থেকে হজরত বারা ইবনে আজীবের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এভাবে– রসুল পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জোহরের নামাজের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়লো, সে যেনো তাহাজ্জুদের চার রাকাত নামাজ পড়লো। আর যে ব্যক্তি এশার নামাজের পরে ওইভাবে চার রাকাত পড়লো, সে যেনো শবে কদরের নামাজ পড়লো।

তিনি স. জোহরের ফরজ নামাজের পর দুই রাকাত সুন্নত পড়তেন। মুসাফির কিংবা মুকিম কোনো অবস্থাতেই তিনি স. এই নামাজ বাদ দিতেন না। একদিন শুধু সম্পদ বণ্টনে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি স. এই দুই রাকাত নামাজ পড়ার ফুরসত পাননি। কিন্তু আসরের পর তিনি স. এর কাযা আদায় করেছিলেন। বোখারী শরীফে এরকম বর্ণনা রয়েছে। এই বর্ণনাটিকে মান্য করলে আরেকটি জটিলতা দেখা দেয়। তা হচ্ছে— হাদিস শরীফে এসেছে রসুল পাক স. সব সময় আসরের নামাজের পরে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই আমলে অভ্যস্ত ছিলেন। হাদিস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, মুসাফির ও মুকিম কোনো অবস্থাতেই তিনি স. ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত এবং আসরের নামাজের পরে দুই রাকাত পরিত্যাগ করতেন না। আল্লাহ্তায়ালার সহিত মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আসরের পরের ওই দুই রাকাত নামাজ ছিলো কেবল রসুল পাক স. এর জন্যই নির্ধারিত। অন্যদের জন্য ওই নামাজ পাঠ করা মাকরূহ। আবু দাউদের কিতাবে রয়েছে, নবীপাক স. আসরের পর দুই রাকাত নামাজ পড়তেন, কিন্তু অন্যদেরকে এই নামাজ পড়তে নিষেধ করতেন। তেমনি তিনি সওমে বেসাল (ইফতার ও সেহরী ব্যতীত ক্রমাগত রোজা) করতেন, কিন্তু অন্যদেরকে করতে নিষেধ করতেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, আসরের পরের দুই রাকাত নামাজ তিনি স. তাঁর গৃহে পাঠ করতেন। উম্মতের জন্য সহজ করাই ছিলো তাঁর এরকম করার উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য সহজসাধ্য আমল পছন্দ করতেন।

জোহরের ফরজের পর চার রাকাত সুন্নত পাঠের কথাও হাদিস শরীফে এসেছে। মসনদে ইমাম আহমদ, সুনানে নাসাঈ এবং তিরমিজি শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত এবং ফরজের পরে চার রাকাত নামাজ পাঠে যত্নবান হবে, আল্লাহ্তায়ালা তার জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দেবেন। শায়েখ ইবনুল হেমাম বলেছেন, জোহরের পরের ওই চার রাকাত দুই রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত না বহির্ভূত তা নিয়ে বর্তমান জামানার আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বান্দা মিসকিন (গ্রন্থকার) বলেন, প্রকাশ্যতঃ বুঝা যায়, ওই চার রাকাত নামাজ জোহরের পরের দুই রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত নয়। এশার নামাজের ফরজের পরে দুই রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদার নামাজ শেষে তিনি স. ওইরূপ চার রাকাত নামাজ পড়তেন। মাশায়েখগণ ওই চার রাকাত নামাজ এক সালামের মাধ্যমে আদায় করে থাকেন। আল্লাহ্পাকই উত্তমরূপে অবহিত।

আসরের সুন্নত প্রসঙ্গে হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. আসরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তেন। আবু দাউদ এরকম

বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় একথাটিও রয়েছে যে, তিনি স. আসরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তেন। উক্ত সুন্নত ও ফরজের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি স. নৈকট্যভাজন ফেরেশতা এবং অনুগত মুসলমানদের প্রতি সালাম প্রেরণ করতেন। এরকম বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্পাক ওই ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যে আসরের নামাজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়ে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মসনদে আহমদ, তিরমিজি এবং আবু দাউদ শরীফে। ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে হাব্বান তাঁদের রচিত গ্রন্থে এ সম্পর্কে বর্ণনা এনেছেন। বর্ণনাগুলোতে বৈসাদৃশ্য থাকার কারণে হানাফী মাজহাব অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আসরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত পড়া যায়, আবার ইচ্ছা করলে চার রাকাত পড়া যায়। কাজেই চার রাকাত পড়াই উত্তম।

মাগরিবের নামাজের সুন্নত দুই রাকাত। সুন্নতের পরে নামাজ পড়া হলে তা হবে নফল। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি রসুল করীম স. থেকে যা কিছু শুনেছি তা পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারিনি। তবে এতটুকু আমি বলতে পারি যে, মাগরিবের ফরজের পর এবং ফজরের আগে দুই রাকাত বিশিষ্ট সুন্নতের মধ্যে নবী করীম স. সুরা কাফেরূন এবং সুরা এখলাস পাঠ করতেন। তিরমিজি। কখনও কখনও আবার উক্ত দুই নামাজে তিনি স. দীর্ঘ ক্বেরাতও পড়েছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল করীম স. মাগরিবের ফরজের পরে দুই রাকাত সুন্নতের ক্বেরাত এতো দীর্ঘ করেছিলেন যে, মসজিদের সকল লোক চলে গিয়েছিলেন। আবু দাউদ।

এশার নামাজের ফরজের পর দুই রাকাত সুন্নত রয়েছে। উম্মত জননী আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, রসুল আকরম স. আমার প্রকোষ্ঠে এলে চার রাকাত অথবা ছয় রাকাত নামাজ না পড়ে কখনো এশার নামাজ পড়তে যেতেন না। আবু দাউদ। এশার পরের ছয় রাকাত সুন্নত জোহরের পরের সুন্নতসমূহের ন্যায় অর্থাৎ দুই রাকাত যোগ চার রাকাত– সমান সমান ছয় রাকাত। মুসলিম শরীফে রয়েছে, জননী আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, রসুল পাক স. সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এশার নামাজ পড়তেন। তারপর ঘরে এসে দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তেন। তবে ফরজের আগের চার রাকাত পড়া সম্পর্কে মুসলিম শরীফে কোনো হাদিস দেখা যায় না। তাই মক্কা ও মদীনাবাসীদেরকে এই আমল করতে দেখা যায় না। অবশ্য ফেকাহর বিভিন্ন কিতাবে এশার পূর্বের চার রাকাত নামাজকে মোস্তাহাব বলা হয়েছে। আল্লাহ্পাকই উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত।

সফরুস সায়াদাত পুস্তকে রয়েছে, রসুল আকরম স. সকল সুন্নত নামাজ ঘরে পড়তেন। আর এরকম করার ব্যাপারে তিনি সবাইকে উৎসাহ দিতেন। বলতেন, আমি পছন্দ করি যেনো মানুষ ফরজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ ঘরে গিয়ে পড়ে। বিশেষ করে মাগরিবের ফরজের পরের দুই রাকাত সুন্নত তিনি কখনও মসজিদে আদায় করেননি।

ঘরে সুন্নত নামাজ আদায় করার ব্যাপারে রসুল পাক স. এর উৎসাহ ও তাগিদের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন, মসজিদে সুন্নত নামাজ আদায়কারী মসনুন তরিকা বর্জন করার কারণে সুন্নতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। ইমাম সুরুখছি বলেছেন, সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করার কারণে সে ব্যক্তি গোনাহ্গার হবে। কেননা হুকুম অবশ্য পালনীয়। এর ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ। আর তিনি স. তো বলেই দিয়েছেন, তোমরা সুন্নতসমূহ আপন আপন গৃহে আদায় করো। আমাদের মাজহাবের আলেমের অভিমত হচ্ছে, সুন্নত নামাজ মসজিদে পড়লেও সওয়াব পাওয়া যাবে। তবে তা যে উত্তম নয় একথা নিশ্চিত। উত্তম হচ্ছে ঘরে সুন্নত পড়া। আর রসুল পাক স. ঘরে সুন্নত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন মোস্তাহাবের ভিত্তিতে। ওয়াজিব হিসেবে নয়।

রসুল আকদাস স. ফরজ নামাজের পরের সুন্নত আদায় করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি দণ্ডায়মান হতেন। বলতেন, ফরজের সঙ্গে এই সুন্নত নামাজ নিয়ে যাওয়ার জন্য ফেরেশতারা অপেক্ষা করতে থাকে। হাদিস শরীফে এসেছে রসুল পাক স. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর কথাবার্তা না বলে দুই রাকাত সুন্নত আদায় করে, তার ওই নামাজ ইল্লিয়্যিনে উঠিয়ে নেয়া হয়।

ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত নামাজের প্রতি রসুল পাক স. অত্যধিক যত্নবান ছিলেন। সফররত অবস্থাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটতো না। কোনো কোনো বর্ণনায় জোহরের পরের সুন্নত সম্পর্কে ওই রকম তাগিদ করা হয়েছে। কারো কারো মতে ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত ওয়াজিব। যেমন বিতিরের নামাজ ওয়াজিব। তাঁরা বলে থাকেন, ফজরের সুন্নত হচ্ছে দিবসের প্রথম আমল এবং বিতির হচ্ছে ওই দিবসের শেষ আমল। তাই এই দুই নামাজের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়ার ধারণাটি প্রচলিত। উপযুক্ত ওজর ছাড়া এই নামাজ উপবিষ্ট অবস্থায় আদায় করা জায়েয হবে না।

সুন্নতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সুন্নত হচ্ছে ফজরের সুন্নত। তারপর মাগরিবের সুন্নত। তারপর জোহরের পরের সুন্নত। তারপর এশার ফরজের পরের সুন্নত। তারপর জোহরের ফরজের পূর্বের সুন্নত। কেউ কেউ বলেছেন, জোহরের পূর্বের এবং পরের উভয় সুন্নত সমপর্যায়ের। উভয়টির মর্যাদা ফজরের সুন্নত অপেক্ষা কম। সর্বসাধারণের মধ্যে একটি বিষয় প্রচলিত রয়েছে। তারা জোহরের ফরজের পরবর্তী সুন্নতের পর এবং মাগরিব ও এশার দুই রাকাত সুন্নতের পর দুই

রাকাত করে নফল নামাজ পড়ে থাকে। এরকম করার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে জোহর এবং এশার ফরজ নামাজের পরবর্তী দুই রাকাত সুন্নতের পর চার রাকাত করে নফল নামাজ পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং যদি নফল পড়তে হয় তবে ওই চার রাকাত নফলই আদায় করতে হবে। অন্যথায় দুই রকাত করে নফল নামাজ আদায় করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

তৃতীয় প্রকার ঃ জাকাত

জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ নমু (বৃদ্ধি পাওয়া এবং পবিত্র করা)। আরব দেশে ক্ষেতের ফলন বেশী হলে ছেঁটে দেয়ার প্রচলন রয়েছে।

কোরআন মজীদে রয়েছে 'ইউজাক্কিহিম' অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র করবেন। শরিয়তের পরিভাষায় জাকাতের অর্থ– মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর জাকাত দানের উপযুক্ত ব্যক্তির জমানো সম্পদের এক বৎসর পূর্ণ হলে সম্পদের নির্ধারিত হক আদায় করা। জাকাত দিতে হয় সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। সম্পদকে পবিত্রকরণও জাকাত দানের উদ্দেশ্য। তাছাড়া জাকাত প্রদাতা জাকাত দানের মাধ্যমে পাপের অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, জাকাত শব্দটির উৎপত্তি তাযকিয়া থেকে যার অর্থ মুশাহাদা বা সাক্ষ্য। জাকাত তার প্রদাতাকে পবিত্র করে থাকে এবং তার ইমানের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দেয়। জাকাতের আরেক নাম সদকা। সদকা শব্দটি এসেছে সিদকুন থেকে। সিদকুন অর্থ সততা। সদকা বা জাকাত তাদের প্রদাতার ইমানের সততার দলিল। এই অর্থে জাকাতের নাম সদকা।

জাকাত ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ এসেছে ষষ্ঠ হিজরিতে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে। মতান্তরে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর। জাকাত ও অন্যান্য সদকাসমূহ– যেমন ওশর ইত্যাদির ক্ষেত্রে রসুল পাক স. দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। তিনি স. এই মর্মে নসিহত করতেন যে, ধর্মপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে আনন্দিত চিত্তে সাগ্রহে জাকাত পাওয়ার উপযোগী ব্যক্তিদেরকে জাকাতের মাল পৌঁছে দিতে হবে। আর এই দানের ব্যাপারে কোনোরকম খোঁটা দেয়া চলবে না। এরকম খোঁটা দিলে জাকাত দাতা নিজেকে তিরস্কারের যোগ্য বলে মনে করবে। জাকাত প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে নিকটাত্মীয় দরিদ্র মহিলাদেরকে। কেননা পুরুষের তুলনায় রমণীরাই অধিক অসহায়। জাকাত আদায়কারীদেরকেও তিনি স. এই মর্মে নসিহত করতেন যে, তারা যেনো বিত্তবানদেরকে সীমাতিরিক্ত চাপ না দেয়। জুলুম ও অতিরিক্ততা না করে। মূলধন নির্ণয়ে যেনো বাড়াবাড়ি না করে এবং যা প্রাপ্য তার অধিক আদায়ের জন্য জবরদস্তি না করে। তারা যেনো তাদের দায়িত্ব পালনের সময় কারো নিকট থেকে হাদিয়া না নেয় এবং দাওয়াত প্রত্যাখ্যান না করে।

সম্পদের হিসাব করতে হবে এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর। এটাও রসুল পাক স. এর নম্রতা ও সহনশীলতার প্রমাণ।

চার প্রকার মালের উপর জাকাত ওয়াজিব করা হয়েছে। এই চার প্রকার মাল সহজে হিসাব করে জাকাত দেয়া সম্ভব। প্রথম প্রকার হচ্ছে ফসল ও ফল। যেমন খেজুর, আঙ্গুর, মোনাক্কা ইত্যাদি। তরি তরকারী সবজী– এসবের উপর জাকাত নেই। কেননা এসকল জিনিস অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকারের মাল হচ্ছে– গৃহপালিত পশু। যেমন উট, গরু, মহিষ, বকরি ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারের মাল হচ্ছে সোনা ও রূপা। চতুর্থ প্রকারের মাল হচ্ছে বাণিজ্য সামগ্রী তা যে ধরনেরই হোক না কেনো। যেমন কাপড়, বাসন কোসন, বিছানা, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এ সকল সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে এবং এক বৎসর জমা থাকলে বছরান্তে হিসাব করে জাকাত দিতে হবে।

ফল ও ফসলের জাকাত দিতে হবে ফসল কর্তনের সময় অর্থাৎ যখন ফসল ঘরে ওঠানোর সময় হবে তখন। এর মধ্যে আবার স্তর নির্ধারণ ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বৎসরের কোনো কোনো সময় মূল্যের ওঠানামা হয়। কখনও আবার মাল কম বেশী হয়ে যায়। সকল অবস্থায় যে লাভ হয় এবং মাল যখন নেসাব পরিমাণ হয়, তখনই জাকাত ওয়াজিব করা হয়েছে। শস্য কর্তন, মাড়াই এবং ফসল সংগ্রহের সময় জাকাত আদায় করা সহজসাধ্য। এ সময় জাকাত গ্রহিতাদের প্রতি লক্ষ্য করা সহজ। পরিপক্ক ফল ও ফসল কর্তন ও মাড়াই বিলম্বিত হলে জাকাত বিলম্বিত করারও সুযোগ রাখা হয়েছে। মালদারদের প্রতি সুবিবেচনার বিষয়টিকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাল ঘরে ওঠাতে যে কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে জাকাতের পরিমাণের মধ্যেও তারতম্য করা হয়েছে। যেমন খনিজ সম্পদ আপনাআপনি মৌজুদ থাকে। তাই খনিজ সম্পদের জাকাত ধার্য করা হয়েছে এক পঞ্চমাংশ। এক্ষেত্রে বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্তটি নেই। যে সকল ফসল উৎপন্ন করতে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ যে সকল শস্য ও ফল ফলাদি বৃষ্টির পানিতে সহজে উৎপন্ন হয়, সে সকল ফল ও ফসলের জাকাত বা ওশর দিতে হবে এক দশমাংশ। আর যে সকল ফল ফসলাদি উৎপন্ন করতে খুব বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, যেমন– উট ইত্যাদি দ্বারা পানি উঠিয়ে জমিতে দিতে হয়, সেগুলোতে ওশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত ওয়াজিব করা হয়েছে। যে সকল সম্পদ অর্জন করতে এর চেয়েও বেশী পরিশ্রম করতে হয় সেগুলোর জাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ এই ধরনের সম্পদ অর্জন করতে দেশ বিদেশে সফর করতে হয়। আবার কখনও নদী সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়। এ সমস্ত সম্পদ হচ্ছে বাণিজ্য লব্ধ সম্পদ। জাকাতের নেসাবের এই পরিমাণ, প্রকৃতি নির্ধরণ ও প্রদানের অনুপাতের

তারতম্যের মধ্যে কী রহস্য রয়েছে, তা কেবল শরিয়ত প্রবর্তক রসুল করীম স. সম্যক অবগত। অন্য কেউ এই জ্ঞানের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না।

নেসাবের শাব্দিক অর্থ প্রতিটি বস্তুর মূল এবং তার প্রত্যাবর্তন স্থল। সম্পদ যখন পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে যায় এবং তার মধ্যে দেখা দেয় পূর্ণতার প্রতিক্রিয়া, তখনই কেবল সেই মাল নেসাবের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। এভাবে স্বর্ণের নেসাব হবে তার ওজন সাড়ে সাত তোলায় পৌঁছে গেলে। আর রৌপ্যের নেসাব হবে তার ওজন সাড়ে বায়ান্ন তোলা হলে। সোনা ও রূপার এই নেসাব পূর্ণ হলে তার জাকাত দিতে হবে।

শস্য ও ফল ফলাদির নেসাব হচ্ছে পাঁচ ওসাক। পাঁচ ওসাকের সমপরিমাণ ওজন হচ্ছে শরয়ী ওজনের আটশ মন। এক ওসাকের ওজন আট সা। আর এক সা হচ্ছে আমাদের দেশের ওজন অনুসারে তিনশ একান্ন তোলা।

গরু ও মহিষের নেসাব তিরিশটি। উটের নেসাব পাঁচটি। বকরির নেসাব চল্লিশটি। রসুলপাক স. এর নির্ধারণের ভিত্তিতেই এই নেসাব নির্ণয় করা হয়েছে। তাঁর মহাতিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীনও এই নির্ধারণকে মান্য করেছেন। আর এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উম্মতের ঐকমত্য।

রসুল আকদাস স. এর নিকটে জাকাতের মাল নিয়ে আসা হলে তিনি কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক জাকাত প্রদাতার জন্য দোয়া করতেন। কোরআন মজীদে এরশাদ করা হয়েছে, "আপনি তাদের জাকাতের মাল গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দিন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন।" এই আয়াতে সালাত শব্দটির মাধ্যমে দোয়া বুঝানো হয়েছে।

তিনি স. জাকাতের উটের শরীরে নিজ হাতে চিহ্ন করে দিতেন। অধিকাংশ সময়ে কানের পাতায় দাগ করে দিতেন। পশুর শরীরে দাগ লাগানো সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, নেহায়েত প্রয়োজন হলে দাগ দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ জাকাতের পশু যদি অন্য পশুর সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে পশুর গায়ে দাগ দেয়া বৈধ হবে। এরকম আশংকা না থাকলে দাগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। রসুল পাক স. পশুর গায়ে দাগ লাগানো বৈধ– একথা বুঝাতে গিয়েই নিজ হাতে দাগ দিয়েছেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে পশুর মুখমণ্ডলে যেনো দাগ লাগানো না হয়। এরকম করতে নিষেধ করা হয়েছে। চিকিৎসা হিসাবে মানুষের শরীরে দাগ লাগানো মাকরূহ ও হারাম। কিন্তু কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক যদি এই মর্মে পরামর্শ দেয় যে, এছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই, তবে দাগ দেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করা বৈধ হবে।

সদকায়ে ফিতর প্রতিটি মুসলমান নারী পুরুষ, আজাদ গোলাম, ছোট বড়, সকলের উপর ওয়াজিব। গোলাম এবং শিশুদের উপর ওয়াজিব অর্থ– তাদের প্রভু ও পিতার উপর ওয়াজিব। ইমাম মালেকের মাজহাবে ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে এবং মৌলিক প্রয়োজনাদির

(হাজতে আসলির) অতিরিক্ত সম্পদ থাকতে হবে। ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে অর্ধ সা গম অথবা এক সা যব। কিংবা এর সমপরিমাণ মূল্য। ঈদের নামাজে যাওয়ার পূর্বেই ফিতরা আদায় করা উত্তম। রসুল পাক স. এরকমই করতেন। আবার ঈদের দিনের পূর্বেও ফিতরা দেয়া যেতে পারে। এরকম অগ্রিম ফিতরা প্রদান জায়েয।

সদকায়ে নাফেলী (দান খয়রাত)

জাকাতের বিবরণের প্রথম অংশে সদকায়ে ওয়াজেবার (জাকাত ও ফিতরার) বিবরণ দেয়া হয়েছে। শেষাংশে দেয়া হচ্ছে সদকায়ে নাফেলার (সাধারণ দান খয়রাতের) বিবরণ। এরকম সাধারণ দান খয়রাত অপরিহার্য করা হয়নি। কেউ না দিলে তার প্রতি কোনো সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়নি। এতদ্বসত্ত্বেও রসুল আকদাস স. দান খয়রাত করতে পছন্দ করতেন। তাঁর নিকট থেকে দান গ্রহণ করে গ্রহিতা যেমন খুশী হতো, তিনিও দান করে খুশী হতেন তদ্রূপ। আল্লাহ্‌র পথে প্রচুর ব্যয়কেও তিনি স. প্রচুর মনে করতেন না। তিনি যাচ্‌ঞাকারীকে কখনও বিমুখ করতেন না। অস্বীকার করতেন না কারো প্রার্থনাকে। কবি ফরযদক তাই বলেছেন, রসুলাল্লাহ স. তাশাহহুদ ছাড়া অন্য সময়ে কখনও লা (না) বলতেন না। নামাজে যদি তাশাহহুদ পাঠ করতে না হতো তাহলে তাঁর জীবনের সব 'না' হয়ে যেতো 'হা'।

তাঁর দান দক্ষিণা ছিলো বিভিন্ন প্রকারের। তিনি কাউকে করেছেন পুরস্কৃত, কাউকে অনুগৃহীত। কাউকে করেছেন দান, কাউকে দিয়েছেন অনুদান (হেবা)। কখনও কারো প্রতি নিজের হক উঠিয়ে নিয়েছেন। আবার কখনও কারো ঋণ মাফ করে দিয়েছেন। কখনও আবার কারো নিকট থেকে কোনো কিছু খরিদ করে মূল্য প্রদানের পর সেই মাল বণ্টন করে দিয়েছেন। কখনও পরিশোধ করেছেন যথামূল্য অপেক্ষা অধিক। কখনও কারো নিকট থেকে কর্জ গ্রহণ করে পরিশোধের বেলায় দিয়েছেন কর্জের চেয়ে বেশী। কখনও কারো নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাকে দিয়েছেন এর চেয়ে বেশী উপহার। মোট কথা, যে সকল উপায়ে মানুষের উপকার করা যায়, তিনি তার সকল উপায় অবলম্বন করেছেন।

রসুল আকদাস স. এর পবিত্র সংসর্গে যিনি অবস্থান করতেন, তিনিও হয়ে যেতেন তাঁর মতো দাতা ও অনুকম্পাপরবশ। কৃপণ ব্যক্তির অন্তরেও তাঁর পবিত্র অবস্থা দানশীলতার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। তিনি দান করতেন পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই। মানুষের প্রতি তাঁর বদান্যতা, উদরতা ও মমতাবোধ ছিলো সীমাহীন। তাঁর গুণবত্তা নজীরবিহীন। তাই তিনি ছিলেন সকল পরিস্থিতিতে সমুচ্চ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত, আনন্দচিত্ত ও প্রফুল্ল স্বভাবসম্পন্ন। সকল প্রকার সংকীর্ণতা কুপমণ্ডুকতা, অসদাচরণ, কলুষতা এবং নিকৃষ্ট স্বভাব সৃষ্টি হয় কার্পণ্য থেকে। কৃপণতার সম্পর্ক পার্থিবতার সঙ্গে। আর প্রশস্ত হৃদয়ের সম্পর্ক রসুল আকরম স.

এর মহিমান্বিত স্বভাব ও মহান চরিত্রের সঙ্গে। ওই সুমহান ও পরিপূর্ণ গুণাবলী অধিকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে ওই সকল আউলিয়া কেরাম তাঁর পবিত্র গুণাবলীর অংশ পেয়ে সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়েছেন যারা তাঁর আনুগত্যে উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাঁদের জীবন।

মাদারেজুন নবুওয়াত

ISBN 984-70240-0015-6